ভারতবর্ষের ইতিহাস

ব্রিটিশ যুগ

শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

ইষ্ট এণ্ড কোং

মূল্য পাঁচ টাকা

ভারতবর্ষের ইতিহাস

(বৃটিশ যুগ)

শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্, এ, (ট্রিপল); ইতিহাস, বাংলা ও সংস্কৃত; অধ্যাপক, রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া; ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশান্, কলিকাতা; বগুড়া কলেজ; গ্রন্থকার, "বিশ্বের ইতিহাস" (১৮১৫—১৯৩৯), "ইউরোপের ইতিহাস" (১৪৫৩—১৮১৫), "ভারতবর্ষের ইতিহাস" (হিন্দু ও মুসলমান যুগ), "গ্রীসের ইতিহাস", "রোমের ইতিহাস", ইত্যাদি।

ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী
৫২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্রকাশক :—
শ্রীজ্যোতিভূষণ বিশ্বাস
ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী
৫২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :—
শ্রীজ্যোতিভূষণ বিশ্বাস
জ্যোতি প্রেস
২৮এ, চক্রবর্ত্তী লেন,
চাতরা, শ্রীরামপুর।
মূল্য :—পাঁচ টাকা মাত্র

মুখবন্ধ

নানা কারণে ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসনের ইতিহাস যথাযথভাবে লিখিত হয় নাই। প্রথমতঃ, বিদেশী ঐতিহাসিকগণ স্বভাবতঃ স্বজাতীয়দের শাসন সম্বন্ধে সত্যকথনে কার্পণ্য করিয়াছেন, কলঙ্কিত চরিত্র এবং ঘটনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয়গণের দ্বারা যে সকল ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, শাসন-সংযত কণ্ঠে তাহা বর্ণনা করার জন্য অনেক স্থলে ঐতিহাসিক সত্য বর্ণিত হইতে পারে নাই, অথবা অত্যধিক ভাবাবেগ-দুষ্ট বলিয়া ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয় নাই।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তী যুগে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে বৃটিশ-শাসনের ইতিহাস রচনা প্রয়োজন মনে করিয়া 'বৃটিশ-যুগ' প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য পুস্তকখানি প্রধানতঃ বি, এ, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা-সহায়ক পুস্তক হিসাবেই সংক্ষিপ্ত আয়তনে লিখিত। তথাপি আমার মনে হয় ছাত্র মহল ব্যতীত সাধারণ পাঠকও এই পুস্তক পাঠের পর সময়ের অপচয়জনিত গ্লানি বোধ করিবেন না। নূতন ধরণে এবং নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য আলোচনা কবিয়াছি এবং পরীক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত বহু বিষয়বস্তু যাহাতে চিত্তাকর্ষক হইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত ঘটনা এই পুস্তকে সন্নিবেশ করিয়াছি। সাধারণ পাঠকের উপযোগিতার জন্যই স্বাধীনতা প্রাপ্তির শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পাইয়াছি। পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতামত যাহা সত্যানুগ তাহা এই পুস্তকে অকুণ্ঠিত-ভাবে গ্রহণ করিয়াছি এবং যেখানে পূর্ব্বগামীদের রচনায় ভাবাবেগের আতিশয্য রহিয়াছে পুস্তকের যত্র তত্র এই দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় বি, এ, ইতিহাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয়-পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম। ছাত্র-ছাত্রীগণের নিকট উক্ত পুস্তকদ্বয় আদৃত হইয়াছে উপলব্ধি করিয়া প্রথম-পত্র 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রকাশ উৎসাহী হইয়াছি।

প্রথম-পত্রের অন্তর্ভুক্ত বৃটিশ যুগ অপেক্ষাকৃত কঠিন মনে করিয়া প্রথমে এই অংশটুকু প্রকাশ করিলাম—পূর্ব্বেই অপর এক খণ্ডেই হিন্দু ও মুসলিম যুগ প্রকাশিত হইয়াছে।

পরীক্ষার্থিগণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য প্রশ্নের উপযোগী করিয়া গ্রন্থখানি রচনার ত্রুটি করি নাই। কয়েক বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ও বর্ণানুক্রম সূচী পুস্তকের শেষে সন্নিবেশিত হইল। ইহাতে পরীক্ষার্থীরা উপকৃত হইবে।

এই পুস্তক যে রীতিতে লিখিত হইয়াছে সেই রীতি অনুসারেই বর্ত্তমানে বি, এ, পরীক্ষার প্রশ্নাবলী রচিত হয়। ভারতে বৃটিশ শক্তির সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্রমবিবর্ত্তন ও তাহার বিভিন্ন পর্য্যায়কে কেন্দ্র করিয়াই পুস্তকের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে তৎসংশ্লিষ্ট গভর্ণর-জেনারেল বা ভাইসরয়দের কার্য্যক্রম বর্ণনা করিয়াছি। যাঁহারা প্রসিদ্ধনামা তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিতে ত্রুটি করি নাই। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য সময়ের সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, দেশীয় বা পররাষ্ট্রনীতি, কংগ্রেস ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম সমস্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়া ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্যে লিখিত তাহা সার্থক হইলে কৃতার্থ হইব।

এই পুস্তক প্রণয়নে অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর অলক্ষ্য প্রেরণা ব্যতীত অনুজ শ্রীসুরতোষ ভট্টাচার্য্য, সুহৃদ্বর শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় ও সোদরোপমা শ্রীমায়া ভট্টাচার্য্য, বি, এ, ও আমার বহু প্রাক্তন ও বর্ত্তমান সহকর্ম্মীদের উৎসাহ ও পরামর্শদানের জন্য তাঁহাদের নিকট ঋণী।

'ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী'-র সুযোগ্য পরিচালক শ্রীজ্যোতিভূষণ বিশ্বাসের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যতীত পুস্তকখানি প্রকাশিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

উত্তরপাড়া,
হুগলী।

বিনীত—
শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ বহু দিন পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। নানা কারণে নূতন সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব হইয়া গেল।

এই সংস্করণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং কয়েকটি অধ্যায় নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় এই খানা আদৃত হইলে শ্রম সফল মনে করিব। ছাত্রগণের সুবিধার জন্য এই সংস্করণে কয়েকখানা পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র সংযোজিত হইল। ইতি—

উত্তরপাড়া
১৫।১০।৫৫

শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় ভাগ

আধুনিক ভারত (১৮৫৮—১৯৩৭)

তৃতীয় ভাগ

বিংশ শতাব্দীর ভারত ও ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

ভারতবর্ষের ইতিহাস

বৃটিশ যুগ

সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন

ইউরোপীয় অপরাপর জাতির ন্যায় ইংরেজ জাতিও বাণিজ্যলুব্ধ হইয়া ভারতবর্ষের ভূমিতে পদার্পণ করে। কিন্তু কালচক্রে বণিকের মানদণ্ড একদা রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৃটিশ শাসনের যুগ প্রধানতঃ আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী বৃটিশ শক্তির ক্রমপ্রসার ও সার্ব্বভৌম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত।

ঐতিহাসিকদের মতে মোগল সম্রাট ঔরংজেবের ভ্রান্ত শাসননীতির ফলেই মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়। ঔরংজেবের মৃত্যুর পরে যে কয়জন মোগল বাদশাহ দিল্লীর মসনদে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহারা নামাবশেষ বাদশাহ ছিলেন। মোগল শক্তির এই দুরবস্থার সময়ে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশ কেন্দ্রীয় আধিপত্য হইতে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। ভারতবর্ষের এই রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার যুগে বাণিজ্যকামী ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাকামী অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীজাতি ফরাসী শক্তির সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয় এবং দীর্ঘবিরোধের পর ফরাসীগণকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হয়। ইত্যবসরে বঙ্গদেশের সিংহাসন লইয়া যে দরবার-ষড়যন্ত্র হয় তাহাতে ইংরেজগণ একপক্ষে যোগদান করে এবং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর রণাঙ্গণে জয়লাভ করিয়া ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ ভারতে বৃটিশের রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তির সূচনা করেন। পলাশীর বিজয় ও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলেও সমগ্র ভারতবর্ষের আধিপত্যলাভের কথা তখনও বৃটিশের কল্পনাতীত ছিল।

কেননা মোগল মহিমা একেবারে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইলেও তখন পর্যান্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন ও শক্তিমান রাষ্ট্রশক্তির অভাব ছিল না ; এই সকল শক্তির সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া না করা পর্য্যন্ত ভারতে স্থায়ীভাবে বৃটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মোগল শক্তির অন্তর্দ্ধানের পর ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্রমে মারাঠা ও শিখদের হাতে চলিয়া যায়। বৃটিশ শক্তিকে ইহাদের সঙ্গেই শেষ বোঝাপড়া করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য মুসলিম-শক্তি ইংরেজের ভারত অধিকারে বাধা জন্মায় নাই।

মোগল শক্তির অধঃপতনের যুগে মারাঠারাই ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। শক্তিমান পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠারা সমগ্র ভারতব্যাপী 'হিন্দুপাদ পাদশাহী' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিল এবং মোগলদের পরিত্যক্ত মসনদে বসিবার উদ্যোগ করিল। মারাঠা ব্যতীত মহীশূর, কর্ণাট, হায়দ্রাবাদ, অযোধ্যা, রাজপুত রাজ্যসমূহ, পাঞ্জাবের শিখজাতি প্রভৃতি তখনও একেবারে উপেক্ষণীয় ছিল না। সমগ্র ভারতে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকামী কোন শক্তির পক্ষেই ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু ইংরেজদের সৌভাগ্যবশতঃ এই সকল ভারতীয় শক্তির মধ্যে কোন রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা সম-স্বার্থের বন্ধন ছিল না। কাজেই বহিরাগত কোন প্রবল শক্তির পক্ষে এককভাবে ইহাদিগকে পরাজিত করা একবারে অসম্ভব ছিল না। মোগলদের ক্ষমতার অবসানে একমাত্র মারাঠাদের শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠনের যথেষ্ট অবকাশ ও সুযোগ ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল পেশোয়াদের সময়ে মারাঠাশক্তি সামান্য কিছুকালের জন্য ভারতের রাষ্ট্রগগনে জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠালিপ্সু মারাঠারা উৎপীড়নমূলক আচরণের জন্য তাহাদের অনুকূলে সাম্রাজ্যভুক্ত জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। জন-সাধারণকে এক রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করার জন্য যে স্বতস্ফূর্ত্ত বন্ধনের

প্রয়োজন মারাঠাদের মধ্যে তাহার অভাব ছিল। মারাঠা নায়কগণ রাষ্ট্রের শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক উন্নতি, স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা—কোন কিছুর জন্যই চেষ্টা করেন নাই। সাম্রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনের যে সুব্যবস্থা করা দরকার—তাহারা এই সত্য উপলব্ধি করেন নাই না তদনুরূপ কোন কার্য্যক্রম অনুসরণ করেন নাই। শুদ্ধ চৌথ ও সরদেশমুখী প্রভৃতি বার্ষিক কর আদায় অন্যথায় প্রজাশক্তির উপর উৎপীড়নের দ্বারাই তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই সকল অন্যায় আচরণের ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহ মারাঠাদের উপর বিরক্ত হইয়াছে এবং মারাঠা শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য সুযোগমত মারাঠাদের বিরুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ক্ষমতা লইয়া মারাঠারা আত্মকলহে লিপ্ত হয় এবং পরস্পর বিবদমান রাষ্ট্রপক্ষে বিভক্ত হয়। আত্মকলহের রন্ধ্রপথ দিয়া ইংরেজরা মারাঠাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর পঞ্চধাবিভক্ত মারাঠা শক্তিকে পরাজিত করিতে ইংরেজদের কোন অসুবিধা হইল না। অনুরূপ দুর্দ্ধর্ষ শিখজাতি ও শিখরাষ্ট্র কালক্রমে পরস্পর কলহে লিপ্ত হইয়া ইংরেজদের হস্তক্ষেপের সুবিধা করিয়া দেয় এবং পরিণামে শিখরাষ্ট্র পাঞ্জাব বৃটিশের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ভারতে বৃটিশ আধিপত্য স্থাপনের বিভিন্ন স্তর প্রণিধান করিয়া অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষস্থ বিভিন্ন শক্তি যখন পারস্পরিক ঈর্ষ্যাদ্বন্দ্বে লিপ্ত তখন ইংরেজরা ক্রমশঃ তাহাদের অধিকার প্রসারিত করিয়া যাইতে লাগিল। ভারতবর্ষের নানাস্থানের বিবদমান পক্ষদ্বয়ের অন্যতম পক্ষ অবলম্বন করিয়া করিয়া ইংরেজরা সমর্থিত পক্ষকে বিজয়লাভে সাহায্য করিল এবং উক্ত সাহায্যের বিনিময়ে ভৌমিক অঞ্চল লাভ বা অন্য কোন সুবিধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইল। ক্রমশঃ ইংরেজ ভারতের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিপতি হইয়া বসিল এবং কালক্রমে সার্ব্বভৌম বৃটিশ শক্তির নিকট ভারতীয় অপরাপর সকল শক্তিকেই মস্তক অবনত করিতে হইল।

সমগ্র ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্যলাভের জন্য ইংরেজকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গণে জয়ের গৌরব অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। মহীশূরের আধিপত্য নষ্ট করার জন্য হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজদের চারিটি মহীশূর যুদ্ধ, মারাঠা শক্তিকে হীনবল করার জন্য তিনটি মারাঠা যুদ্ধ ও শিখ শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া পাঞ্জাবে আধিপত্য স্থাপনের জন্য দুইটি শিখ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইংরেজকে আরও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অপ্রধান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে নেপাল যুদ্ধ, ব্রহ্মযুদ্ধ, সম্ভাব্য রুশ আক্রমণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য চারিটি আফগান যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

উক্ত সকল যুদ্ধেই পরিণামে ইংরেজ পক্ষই জয়লাভের অধিকারী হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে বিজয় গৌরব অর্জ্জনের মূলে ইংরেজের উচ্চতর সমরকৌশল ও কূটনীতিক বুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল সত্য কিন্তু শুদ্ধ সমরনীতি বা কূটনীতির সাহায্য তাহারা এতখানি কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। অপরপক্ষের বহু ত্রুটি ইংরেজদের সাফল্য অর্জ্জনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে। প্রতিপক্ষ ভারতীয় শক্তিসমূহের রাষ্ট্রনৈতিক অদূরদর্শিতা, রণাঙ্গণে সেনানায়কদের বিশ্বাসঘাতকতা, শত্রুর বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে অবতীর্ণ না হওয়া প্রভৃতি শোচনীয় ত্রুটির জন্যই ভারতে বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। বহু রণক্ষেত্রে দেশীয় সৈন্যদল অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শত্রুপক্ষেরও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে, কিন্তু সমর-পরিচালনার ত্রুটি বা অন্য কোন বে-সামরিক কারণে বহু ক্ষেত্রে তাহারা জয়লাভ করিয়াও জয়ের ফল অর্জ্জন করিতে পারে নাই। এই সময়ের মধ্যে দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ হায়দার আলি, টিপু সুলতান, নানা ফাড়নবিশ ও রণজিৎ সিংহ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কেহ ছিলেন না। ফলে কূটনীতির যুদ্ধেও ভারতীয় শক্তিবর্গ তাদৃশ ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ক্রমশঃ ভারতের অধিকাংশ প্রধান রাষ্ট্রীয় শক্তি ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্র সমূহও সন্ধি বা করদানের স্বীকৃতি দ্বারা বৃটিশের সার্ব্বভৌমতা মানিয়া লইল।

শুদ্ধ কয়েকটি রণক্ষেত্রে বিজয়লাভ ও কয়েকটি সন্ধির জোরে বৃটিশ শক্তি পৌনে দুইশত বৎসর ভারতবর্ষের উপর শাসনাধিকার চালাইয়া যাইতে সক্ষম হইত কিনা সন্দেহ। যুদ্ধজয়ের সমান্তরালেই ইংরেজরা নিজেদের অধিকারের স্থায়িত্বের জন্য ভারতবর্ষের জন্য সময়োপযোগী শাসনব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে ত্রুটি করে নাই। শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই নব নব সংস্কৃত ব্যবস্থার বন্দোবস্ত হয়। শাসকজাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বজায় রাখিয়া এই সকল সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সত্য কিন্তু ইহাতে পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের লাভও যথেষ্ট হইয়াছিল। ১৭৫৭ খৃঃ-এ পলাশীতে জয়লাভের পর ১৮৫৭ খৃঃ এ সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী এক শতাব্দীকাল ভারতের শাসনদায়িত্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া বণিক কোম্পানীর হস্তেই ন্যস্ত ছিল। এই সমিতি তরবারির সাহায্যে লব্ধ ভারতবর্ষকে তরবারির সাহায্যে রক্ষা করার নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতের পর ইংরেজ জাতি উপলব্ধি করিল যে ভারত শাসনের ব্যাপারে এযাবৎ অনুসৃতনীতির মৌলিক পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। শাসিত দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে শুভসংযোগ না রাখিলে বিদেশীশাসন অচিরেই ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা। সিপাহীবিদ্রোহের পর পার্লামেণ্ট এই বিরাট দেশের শাসনভার সামান্য বণিক কোম্পানীর হস্তে না রাখিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিল এবং শাসনব্যবস্থায় ভারতবাসীর অধিকারের কথাও স্বীকার করিল। এই স্বীকৃতিকে সূত্র করিয়া ভারতবাসীর স্ব-শাসনের সূচনা হইল।

ইংরেজ শাসনের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে ইংরেজী ভাষার পঠন ও পাঠন ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইল। ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া ভারতবাসী পাশ্চাত্য-জগতের আধুনিক চিন্তাধারা ও প্রগতিমূলক কার্য্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাইল। অতঃপর ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতের সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষানায়কগণ প্রাচীনপন্থী সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন করিতে লাগিল। ভারতবাসীর এই সমস্ত দাবি

বৃটিশ শাসকজাতি সম্পূর্ণ স্বীকার করে নাই সত্য কিন্তু বিভিন্ন সময়ে জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহারা যথেষ্ট পরিবর্ত্তন মূলক আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছিল এবং স্বল্পমাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকারও প্রদান করিয়াছিল। ভারতবর্ষের শিক্ষাসংস্কার, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি আশানুরূপ না হইলেও মোটামুটি অগ্রগতির পথেই চলিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে জাতীর আশা আকাঙ্ক্ষার দাবি জানাইবার মুখপাত্ররূপে জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের জন্ম হইল। কংগ্রেসকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশঃ দানা বাধিতে লাগিল; বহু পতন-অভ্যুদয়, ত্যাগ-সহিষ্ণুতা, বিরোধ আপোষের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় জয়লাভ করিতে সমর্থ হইল। ভারতবাসীর আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের সঙ্গে বহির্বিশ্বের রাষ্ট্র-নৈতিক ঘটনা-বিপর্য্যয় যুক্ত হওয়ায় ইংরেজকে ভারতবর্ষের অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৯৪৭ খৃঃ-এ ভারতের রাজদণ্ড বৃটিশের হস্ত হইতে চিরতরে স্খলিত হইয়া গেল—ভারতবর্ষ মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

বৃটিশ যুগের বিভিন্ন পর্ব্ব

(ক) সার্ব্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার যুগ ১৭৪০-১৮৫৭।

(১) বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয় ১৭৪০-’৬৫।

(২) বৃটিগ শক্তির ক্রমাগ্রগতি ১৭৬৫-’৯৮।

(৩) বৃটিশ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ১৭৯৮-১৮২৩।

(৪) বৃটিশ ভারতের বিস্তার ১৮২৩-’৫৬।

(খ) সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৬-’৫৭।

(গ) নির্ব্বিঘ্ন শাসন ও স্বায়ত্তাধিকার প্রদানের ক্রমবিকাশ ১৮৫৭-১৯৪৭।

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপীয় জাতিসমূহের আগমন

বিদেশীর পক্ষে ভারতবর্ষে প্রবেশের জন্য জলপথ ও স্থলপথ দুইই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু আলেকজাণ্ডার হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান সমর-নায়কগণ সকলেই স্থলপথেই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। মুসলমান যুগের সম্রাটগণ কখনও নৌ-শক্তির উপযোগিতা বোধ করেন নাই এবং প্রয়োজনও হয় নাই—ভারতীয় শক্তিগণের মধ্যে একমাত্র মারাঠারাই নৌ-শক্তির অধিকারী ছিল। তৈমুর বংশায় রাজগণের বিশাল সেনাবাহিনী ছিল, তাহারা সকলেই স্থলপথে যুদ্ধ করিতেন, কিন্তু ভারত মহাসাগরে মোগল বাদশাহদের আধিপত্য কোনদিনই বিস্তৃত হয় নাই। যে ইউরোপীয় জাতি কালক্রমে ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তা হইলেন তাহারা জলপথে ভারত আগমন করিলেন।

ভারতের নৌ-শক্তির অপ্রাচুর্য্য থাকিলেও বাহিরের বহু জাতির সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ দীর্ঘকাল যাবৎ বর্ত্তমান ছিল। ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আগমনের জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বপর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য আরব বণিকদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। আরব বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া আরব সাগর ও লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া দ্রব্যাদি ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ইটালীয় বণিকদের নিকট চালান দিত। জেনোয়া, ভেনিস ইত্যাদি সহরের ইটাল বণিক সম্প্রদায় সেই সব পণ্য উচ্চ মূল্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইত। এই লাভজনক বাণিজ্য আরব ও ইটালীয় বণিকদের একচেটিয়া থাকায় ইউরোপের অন্যান্য দেশের বণিকগণ ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করার জন্য আগ্রহান্বিত হইল এবং ভারতবর্ষে জলপথে আগমনের পথ আবিষ্কারের জন্য উন্মুখ হইল। প্রধানতঃ স্পেন ও পর্টুগাল জলপথে ভারতে

আগমনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কলম্বাস ভারতে আগমনের পথ অনুসন্ধান করিতে বহির্গত হইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বার্থোলোমিউ দিয়াজ নামক এক ব্যক্তি আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল অতিক্রম করিয়া ভারতে আগমনের প্রচেষ্টা করিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার 'উত্তমাশা' বা 'বাত্যাবিক্ষুব্ধ' অন্তরীপ অতিক্রম করিলেন। জলপথে প্রত্যক্ষ-ভাবে ভারতবর্ষে প্রথম আগমনের কৃতিত্ব ভাস্কো-ডি-গামা নামক এক পর্টুগীজ নাবিকের। ভাস্কো-ডি-গামা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে জামোরিণ উপাধিধারী হিন্দু রাজার দরবারে উপনীত হন। জলপথে ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কার মধ্যযুগীয় সভ্য জগতের পক্ষে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা।

পর্টুগীজ

পর্টুগীজগণ ভারতে আগমন করিলে কালিকটের হিন্দু নরপতি জামোরিণ পর্টুগীজগণকে ব্যবসা করিবার জন্য সুবিধা প্রদান করিলেন। কিন্তু পর্টুগীজরা শুদ্ধ বাণিজ্যিক সুবিধা লইয়া সন্তুষ্ট রহিল না তাহারা অন্যান্য ব্যবসায়ী জাতিতে বঞ্চিত করিয়া ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইহাতে সুদীর্ঘকালের ব্যবসায়ী জাতি আরব বণিকদের সঙ্গে তাহাদের সংঘর্ষ বাঁধিল। অধিকন্তু পর্টুগীজরা দক্ষিণ ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া কালিকটের জামোরিণের শত্রু পক্ষের সঙ্গে যোগদান করিল। ইহাতে জামোরিণও পর্টুগীজদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন।

আলবুকার্ক (১৫০৯-'১৫)

পর্টুগীজ শাসনকর্ত্তা আলফান্সো ডি আলবুকার্কের সময়েই (১৫০৯-'১৫) ভারতে পর্টুগীজদের ক্ষমতা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আলবুকার্ক বিজাপুরের সুলতানের অধিকারভুক্ত গোয়া বন্দর বলপূর্ব্বক দখল করেন (১৫১০ খৃঃ) এবং দুর্গ ইত্যাদি নির্ম্মাণের দ্বারা গোয়াকে সুরক্ষিত করেন। ভারতে পর্টুগীজদের

সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য আলবুকার্ক ভারতস্থিত পর্টুগীজদিগকে ভারতীয় নারী বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করেন। মুসলমানের উপর অত্যাচার করিয়া আলবুকার্ক কুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৫১৫ খৃঃ আলবুকার্কের মৃত্যু-কালে পর্টুগীজদের ন্যায় নৌ-শক্তি ভারতে আর ছিল না। পর্টুগীজরা ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সমুদ্র উপকূলস্থিত বহু স্থান অধিকার করে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত চৌল, বোম্বাই, সালসেট, বেসিন, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি বন্দরে, সিংহলের নানাস্থানে এবং বাঙ্গালার অন্তর্গত হুগলী বন্দরে তাহাদের কুঠি স্থাপিত হয়। কিন্তু কালক্রমে গোয়া, দমন, দিউ ব্যতীত অন্য সকল স্থান পর্টুগীজদের অধিকারচ্যুত হইয়া যায়। শাহজাহানের রাজত্বকালে সেনাপতি কাশিম খান হুগলী দখল করে এবং ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মারাঠারা সালসেট ও বেসিন পর্টুগীজদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অধিকার করে।

পর্টুগীজ অধিকৃত স্থান

পাশ্চাত্য জাতি সমূহের মধ্যে পর্টুগীজরা সর্ব্ব প্রথম ভারতে আগমন করিলেও বিভিন্ন কারণে তাহারা এইস্থানে তাহাদের স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের অত্যুৎকট অসহিষ্ণুতা তাহাদিগকে অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারা সুযোগ পাইলেই অখৃষ্টানদের উপর নির্য্যাতন করিত এবং দেশীয় লোককে অপহরণ করিয়া হয় বিক্রয় করিত নতুবা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিত। তাহাদের উগ্র ধর্ম্মান্ধতায় বিরক্ত হইয়া মোগল সম্রাটগণ পর্টুগীজগণের বিরুদ্ধে প্রতিকূল নীতি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, পর্টুগীজগণ তাহাদের বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে ন্যায়নীতির বিশেষ ধার ধারিতেন না—ইহার ফলে তাহাদের বাণিজ্য তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ, সেই সময়ে ব্রেজিল আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য পর্টুগালের কর্ম্মকৃতি ভারত হইতে সেই দিকে অধিকতর নিবদ্ধ হয়। চতুর্থতঃ, পর্টুগীজদের পরে যে সমস্ত পাশ্চাত্য জাতি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে

পর্টুগীজদের ক্ষমতা হ্রাসের কারণ

আগমন করে তাহাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্টুগীজরা আঁটিয়া উঠিতে সক্ষম হইল না।

ওলন্দাজ (The Dutch)

ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (The United East India Company of the Netherlands) প্রাচ্য দেশে বাণিজ্যের জন্য উদ্যোগী হইয়া প্রথমে পর্টুগীজদের হস্ত হইতে এ্যামবয়না অধিকার করিয়া 'মসলাদ্বীপপুঞ্জে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে। ক্রমশঃ তাহারা বাটাভিয়ায় (১৬১৯) মলাক্কায় (১৬৪১) এবং পর্টুগীজদের নিকট হইতে সিংহল (১৬৫৮) অধিকার করিয়া এই সব স্থানে ওলন্দাজদের আধিপত্য বিস্তার করে। পরিশেষে ওলন্দাজগণ মরিচ ও মশলাদির ব্যবসা অধিকতর লাভজনক মনে করিয়া সুমাত্রা, জাভা এবং মলাক্কাস প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাহাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ নিবদ্ধ করে। ওলন্দাজগণ বাণিজ্য ব্যপদেশ ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করে এবং পর্টুগীজদের সঙ্গে কৃতকার্য্যতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে তাহাদিগকে অপসৃত করিতে সক্ষম হয়। ওলন্দাজগণ পুলিকট, সুরাট, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, বরাহনগর, পাটনা, বালেশ্বর, নেগাপটম, কোচিন প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ ও পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ব্যবসার আদান প্রদানে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা ভারতবর্ষ হইতে প্রধানতঃ নীল, সিল্ক, কার্পাস-বস্ত্রাদি, গন্ধক, আফিম, চাউল ইত্যাদি রপ্তানি করিত এবং বিনিময়ে ভারতবর্ষে পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন প্রকারের মসলাদ্রব্য আমদানী করিত।

পর্টুগীজগণকে ডাচরা ভারত হইতে বিতাড়িত করে

ওলন্দাজগণের সঙ্গে পর্টুগীজ ও ইংরাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং ইহারা পর্টুগীজগণকে সহজেই ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইংরাজদের সঙ্গে তাহাদের প্রতিযোগিতা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। বিশেষতঃ সেই সময়ে ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের ও ক্রমওয়েলের

শাসনাধীন ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা ছিল বলিয়া ভারতবর্ষেও এই দুই জাতির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। ইংরেজ ও ওলন্দাজ ১৬১৯ খৃঃ-এ পরস্পর একটা আপোষ মীমাংসায় উপনীত হয় কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিরোধিতার সমাপ্তি হয় নাই। ১৭৫৯ খৃঃ-এ ডাচগণ বিদেরার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরাজের বিরোধিতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং বাণিজ্য ব্যাপারে ভারতবর্ষ অপেক্ষা মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি প্রাচ্যাঞ্চলে তাহাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে।

ইংরাজের সঙ্গে সংঘর্ষ

পরিণামে পশ্চাৎপদ ও অন্যত্র বাণিজ্য প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত

ইংরাজ

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রাচ্যদেশে ব্যবসার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় এবং রাজ্ঞী এলিজাবেথ কর্তৃক এই কোম্পানী প্রাচ্যদেশে বাণিজ্যের জন্য পনেরো বৎসরের একচেটিয়া সনন্দ প্রাপ্ত হয়। প্রথম দিকে ইংরাজ কোম্পানী সুমাত্রা, জাভা, মলাক্কাস প্রভৃতি দ্বীপে লাভজনক মসলার ব্যবসার জন্য প্রবৃত্ত হয় এবং ১৬০৮ খৃঃ-এ ভারতবর্ষে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হয়। ভারতে ব্যবসার অনুমতি লাভের জন্য কোম্পানী কাপ্তেন হকিন্স-কে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করে এবং হকিন্স সুরাটে কুঠি স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সুরাটের ব্যবসায়ীবৃন্দ ও পর্টুগীজদের বিরোধিতার জন্য এই অনুমতি লাভ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। পরিশেষে ১৬১৬ খৃঃ-এ জাহাঙ্গীর সুরাটে কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমস প্রেরিত দূত স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে উপনীত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থলে ইংরাজদের বাণিজ্য করার অনুমতি আদায় করেন। ১৬১৯ খৃঃ-এর মধ্যে ইংরাজগণ সুরাট, আগ্রা,

সুরাট

আগ্রা, ব্রোচ, আমেদাবাদ

আমেদাবাদ ও বরোচ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-কুঠি প্রতিষ্ঠা করে। ১৬৬৮ খৃঃ ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্টুগালের নিকট হইতে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত বোম্বাই সহর বাৎসরিক দশ পাউণ্ডে কোম্পানীর নিকট ইজারা দেন। প্রথমে বোম্বাই অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল ক্রমশঃ ইহা এতই জনসমৃদ্ধ ও উন্নত সহরে পরিণত হয় যে ১৬৮৭ খৃঃ বোম্বাই ইংরাজদের পশ্চিম উপকূলের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়া পড়ে।

বোম্বাই

ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে ইংরাজগণ প্রথমতঃ ১৬২১ খৃঃ-এ গোলকুণ্ডার সুলতানের নিকট হইতে মসলীপত্তম-এ কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু পর্টুগীজদের বিরোধিতা ও স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারের ফলে তাহারা মসলীপত্তমে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ১৬৩৯ খৃঃ-এ ফ্রান্সিস ডে নামক জনৈক ব্যক্তি চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে মান্দ্রাজের ইজারা গ্রহণ করে এবং দক্ষিণ ভারতের উপকূলে এই স্থানটি ইংরাজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। নূতন কেন্দ্র রক্ষার জন্য মান্দ্রাজে সেণ্ট জর্জ্জ নামে এক দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

মসলীপত্তম

মান্দ্রাজ

এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে উড়িষ্যার বালেশ্বরে, হুগলীতে পাটনায় ও কাশিমবাজারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কুঠি স্থাপন করিয়া বাণিজ্য প্রসারের জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু নানা কারণে বঙ্গদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে কোম্পানীর বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। সমুদ্রোপকুল হইতে বহু দূরে অবস্থিত অভ্যন্তর অঞ্চল হইতে মালপত্র স্থানান্তরে আমদানী বা রপ্তানীর জন্য বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীকে শুল্ক প্রদান করিতে হইত। অধিকন্তু নবাবের স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ কারণে অকারণে কোম্পানীর ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিত। কোম্পানী সুলতান সুজার নিকট হইতে বাৎসরিক ৩০০০ টাকা প্রদানের বিনিময়ে শুল্ক দান হইতে নিষ্কৃতির ফর্ম্মাণ আদায় করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে সম্রাট আরংজেব ও সুবাদার সায়েস্তা খাঁর নিকট হইতেও কোম্পানী অনুরূপ নিঃশুল্কের সুবিধা আদায় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল 'ফর্ম্মাণ' সত্ত্বেও স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যাপারে অযথা নানাবিধ বিধি নিষেধ আরোপ করিয়া অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলিতেছিল। মারাঠারা মোগল সাম্রাজ্যের নানা স্থান আক্রমণ করিয়া অধিবাসিগণের ধন-প্রাণ বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মারাঠারা ১৬৬৪ ও ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে সুরাট আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করে। বাংলার দুর্ব্বল সুবাদারগণের মারাঠার আক্রমণ প্রতিহত করার মত শক্তি ছিল না। ইত্যবস্থায় ইংরাজ কোম্পানী বাণিজ্য রক্ষার জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় পরিত্যাগ করিয়া সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠা ও ভারতবর্ষে নিজস্ব অঞ্চল অধিকার করার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং তদনুসারে তাহাদের নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মোগল শক্তির সঙ্গে ইংরাজের বিরোধ উপস্থিত হইলে মোগল সৈন্যের নিকট পরাস্ত হইয়া ইংরাজ হুগলী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় উভয় পক্ষে সম্প্রীতি স্থাপিত হইল। জব চার্ণক সুতানুটির জমিদারী ক্রয় করিয়া কুঠি স্থাপন করেন। গঙ্গার

কলিকাতার পত্তন

উপকূলে অবস্থিত এই সুতানুটিকে কেন্দ্র করিয়া ভবিষ্যৎ বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। মোগল সম্রাটের আদেশে বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ বাৎসরিক ৩০০০ টাকার বিনিময়ে ইংরাজ কোম্পানীকে বাংলায় নিঃশুল্ক ব্যবসার অনুমতি প্রদান করে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে বর্দ্ধমানের জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ইংরাজগণ তাহাদের সুতানুটি কুঠি দুর্গপ্রকারাদি নির্ম্মাণ দ্বারা সংরক্ষিত করার সুযোগ প্রাপ্ত হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বৎসর ইংরাজগণ নির্ব্বিবাদে ভারতে

বাণিজ্য করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর তরফ হইতে বাণিজ্যের সুবিধা লাভের জন্য মোগল দরবারে দূত প্রেরিত হয়। হ্যামিল্টন নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার এই দৌত্যমণ্ডলীর সহযাত্রী হন এবং সম্রাট ফেরোখসিয়ারের ব্যাধি আরোগ্য করিয়া সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ইংরাজের জন্য ব্যবসার সুবিধা আদায় করিতে সক্ষম হন। নানাবিধ বাণিজ্য সুবিধা ব্যতীত বোম্বাইর টাকশালে প্রস্তুত মুদ্রা সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচলিত করিবার অনুমতি প্রদত্ত হয়। বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে ১৭১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ এক ফর্ম্মাণের বলে বহু বাণিজ্যিক সুবিধা প্রাপ্ত হয় এবং বাংলাদেশে কোম্পানীর ব্যবসা ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। কলিকাতা নগরীর গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার জন সংখ্যা এক লক্ষ হয়।

সুরাট ও বোম্বাই-এর বাণিজ্য

বাংলাদেশে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হইলেও পশ্চিম উপকূলে কোম্পানীর ব্যবসার ক্ষতি হইতেছিল। প্রথমতঃ মারাঠা ও পর্টুগীজের বিরোধে ইংরাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। উপরন্তু মারাঠা নৌ-সেনাপতি কাহ্নোজী আংগ্রিয়া কর্ত্তৃক পশ্চিম উপকূল বারংবার আক্রান্ত হওয়ার ফলে কোম্পানী বোম্বাই ও সুরাটে নির্ব্বিবাদে ব্যবসা করিতে পারিতেছিল না। অবশেষে কোম্পানী বোম্বাইর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া এবং কয়েকটি রণপোত বৃদ্ধি করিয়া বোম্বাইকে মারাঠা জল-দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করে। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার সঙ্গে এক সন্ধির বলে ইংরাজ আংগ্রিয়ার উপদ্রব বন্ধ করিতে সক্ষম হয়।

মান্দ্রাজে ইংরাজের বাণিজ্য ভালভাবেই চলিয়াছিল। ইংরাজগণ প্রতিবেশী শক্তি কর্ণাটের নবাব ও দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলিল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ মান্দ্রাজের সন্নিহিত পাঁচটি সহরের অধিকার প্রাপ্ত হয়।

ফরাসী

পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে ফরাসীরা সর্ব্বশেষে বাণিজ্যের জন্য ভারতে আগমন করে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী কোলবার্টের উৎসাহে ও উদ্যোগে প্রাচ্যদেশে বাণিজ্যের জন্য ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফরাসী রাষ্ট্রের উদ্যোগে ও অর্থে পুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ফরাসী কোম্পানী প্রথমং দিকে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। ইহার প্রথম উদ্যম মাদাগাস্কার-কে উপনিবেশে পরিণত করার ব্যর্থ চেষ্টায় নষ্ট হওয়া যায়। পুনরায় ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স হইতে অন্য একটি বাণিজ্য অভিযান প্রেরিত হয়। ভারতের প্রথম ফরাসী কুঠি সুরাটে স্থাপিত হয়, (১৬৬৮ খৃঃ)—অতঃপর মসলীপত্তমে ফরাসীরা কুঠি নির্ম্মাণ করে (১৬৬৯ খৃঃ)। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে বলিকোন্দাপুরমের নবাবের নিকট হইতে ফরাসীরা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হয় এবং এই গ্রামেই ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীর সূত্রপাত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঃ মার্টিনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও আগ্রহাতিশয্যে এই ক্ষুদ্র গ্রাম খানি একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যের অনুকূল স্থানে পরিণত হয়। বঙ্গদেশে শায়েস্তা খাঁর আনুকূল্যে ফরাসীরা যে স্থান প্রাপ্ত হয় তাহার উপরে তাহারা চন্দননগরের প্রসিদ্ধ কুঠি গড়িয়া তোলে (১৬৯০-৯২)।

যে সকল ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষে ব্যবসা সূত্রে আগমন করিয়াছিল তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না। ফরাসীদের বাণিজ্য নষ্ট করিবার জন্য ওলন্দাজ ও ইংরাজগণ যথেষ্ট শত্রুতা করিতে লাগিল। ১৬৯৩ খৃঃ-এ ডাচগণ পণ্ডিচেরী দখল করিয়া লইয়াছিল, রাইসুইকের সন্ধিতে পণ্ডিচেরী প্রত্যর্পিত হয়। মার্টিন পুনরায় পণ্ডিচেরীর ভারপ্রাপ্ত হইয়া ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনেন। নানা কারণে ফরাসীদের বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই; সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসীরা সুরাটের ও মসলীপত্তমের বাণিজ্য-কুঠি বন্ধ করিয়া দিল। ১৭২০ খৃঃ-এ ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুনর্গঠিত হইলে পুনরায় ফরাসীদের বাণিজ্যে অগ্রগতি দেখা

যায়। ফরাসীরা ১৭২৫ খৃঃ-এ মাহে এবং ১৭৩৯ খৃঃ-এ কারিকল অধিকার করে। ১৭৪২ খৃঃ-র পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফরাসীরা ভারতবর্ষে শুদ্ধ ব্যবসা বাণিজ্যেই লিপ্ত ছিল এবং কোন প্রকার রাজনৈতিক অভিসন্ধি তাহাদের ছিল না। ডুপ্লের আগমনের পর হইতেই ফরাসীরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাশা পোষণ করিতে থাকে। ইংরাজ তাহাদের এই উচ্চাশার প্রতিবন্ধক হওয়ায় উভয় শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

[পর্টুগীজ, ডাচ, ইংরাজ ও ফরাসী ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য জাতি প্রাচ্যে ব্যবসার জন্য আগমন করিয়াছিল। ১৬১৬ খৃঃ-এ ডেন বা দিনেমারগণ, ১৭৩১ খৃঃ সুইডিসগণ ও ১৭২২ খৃঃ ফ্ল্যাণ্ডার্স সহরের বণিক সম্প্রদায় প্রেরিত অষ্টেণ্ড কোম্পানী এশিয়াখণ্ডে ব্যবসার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিল এবং ভারতেও ব্যবসার জন্য পদার্পণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত চারিটি জাতি ব্যতীত অন্য কাহারও বাণিজ্য দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। এই সব পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে ব্যবসার জন্য বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়াই থাকিত। প্রথম দিকে পর্টুগীজ-ডাচ, পর্টুগীজ-ইংরাজ ও ডাচ-ইংরাজ এই ত্রিকোণ সংঘাত উপস্থিত হয় এবং এই সংঘর্ষে ইংরাজগণ বিজয়ী হয়। শেষ পর্য্যায়ে সর্ব্বশেষ আগত ফরাসীদের সঙ্গে ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয় এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া চলে]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়, ১৭৪০-'৬৫

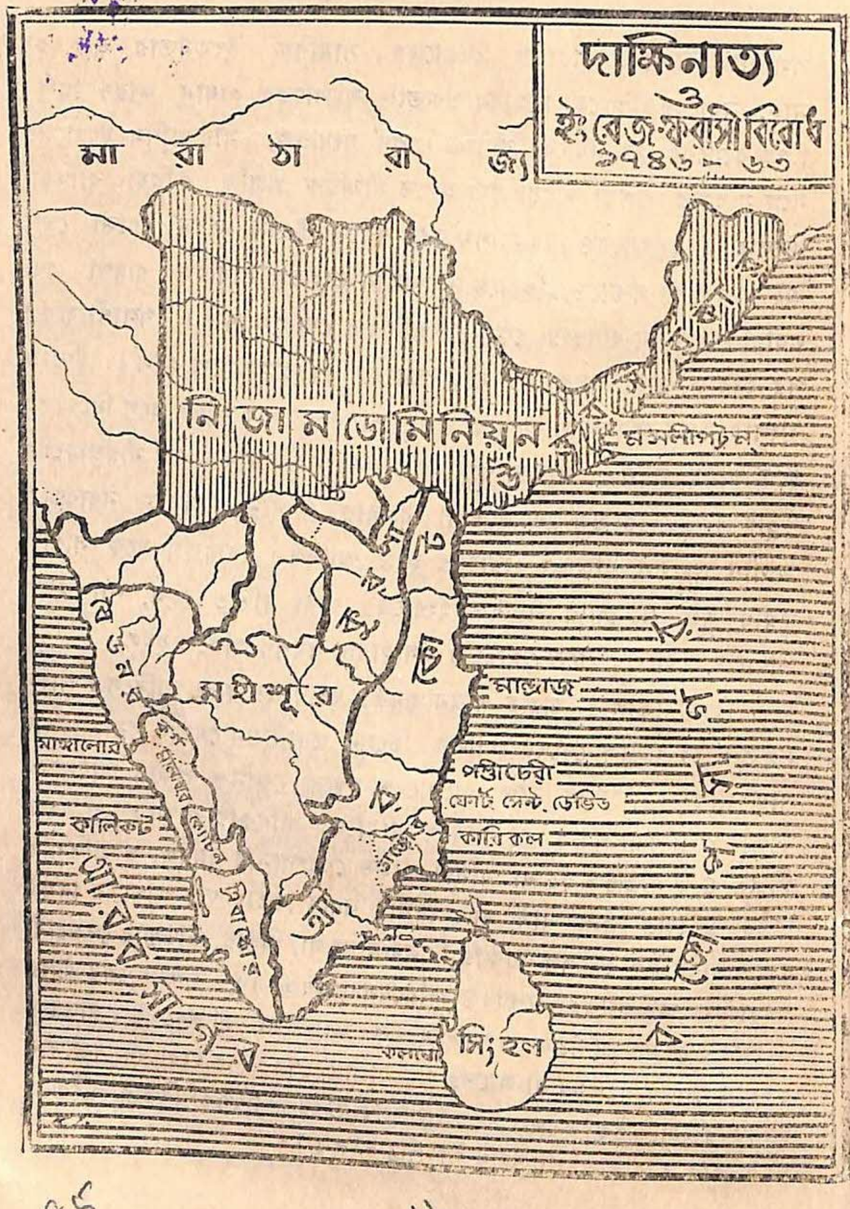
সঙ্কলন ঃ—[১৭৪০-১৭৬৫ এই পঞ্চবিংশতি বৎসরের কাহিনী ঘটনা বহুলতা ও গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এই সময়েই ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড অলক্ষিত-ভাবে রাষ্ট্রদণ্ডে রূপান্তরিত হইবার সূচনা হয়। ইংরাজ শক্তির প্রাধান্যের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ইতিপূর্ব্বেই অন্যান্য বাণিজ্যকামী ইউরোপীয় শক্তি ভারতের দৃশ্যপট হইতে অপসৃত হইয়া যায় কিন্তু ফরাসীরা তখনও সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজের প্রতিস্পর্দ্ধা করিতে থাকে এবং ডুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসীরা ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করে। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ ভারত এই দুই অঞ্চলেই ফরাসীরা তাহাদের অধিকৃত স্থান হইতে নানাবিধ উপায়ে তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। ডুপ্লে ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে এক পক্ষ সমর্থন করিয়া ফরাসীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও স্থানবিশেষ অধিকার করার চেষ্টা করেন। ইংরাজ ফরাসীদের অভিসন্ধি উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বত্র ফরাসীদের প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হয় এবং দক্ষিণ ভারত ও বাংলাদেশ হইতে ফরাসী আধিপত্য চিরতরে বিদূরিত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই ইংরাজ-ফরাসী বিরোধের সূত্রপাত ভারতবর্ষে হয় নাই—পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ইউরোপে, আমেরিকায় এবং অন্যত্র উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ চলিয়াছিল ; ভারতের ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ সেই বৃহত্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্যতম চূড়ান্ত অধ্যায় মাত্র। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট ও হায়দ্রাবাদের এবং বঙ্গদেশের নবাব দরবারের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের মধ্যে উভয় পক্ষই জড়িত হয়। দাক্ষিণাত্যের শক্তিদ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা তিনটি কর্ণাট যুদ্ধে

হইয়া যায়। ১৭৬০ খৃঃ-এ বন্দিবাসের যুদ্ধে (Battle of Wandiwash) ফরাসীরা পরাস্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ প্রাধান্য স্বীকার করে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে উভয় জাতির ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। বাংলাদেশে ফরাসী শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করার প্রচেষ্টা তদানীন্তন নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলে ইংরাজ সেনানায়ক ক্লাইভ, ওয়াটসন প্রভৃতি স্বাধীনচেতা নবাবকে অপসৃত করিয়া একজন বংশবদ নবাবকে সিংহাসনে বসাইবার উদ্দেশ্যে নবাবের গৃহ-ষড়যন্ত্রে নবাবের বিপক্ষদলে যোগদান করে এবং পলাশী রণক্ষেত্রে নবাবের শত্রুপক্ষ পুষ্ট করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে অপসৃত করে। তখন পর্য্যন্ত ফরাসী শক্তিকে সম্পূর্ণ হীনবল করাই ইংরাজের উদ্দেশ্য ছিল। বাংলাদেশে ফরাসী আধিপত্য এইরূপে বিনষ্ট করায় দাক্ষিণাত্যে ফরাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। পলাশীযুদ্ধের পর তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ হয় সুতরাং বাংলার সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বাংলার অর্থবল তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধে ফরাসীশক্তিকে পরাজয়ের কাজে ইংরাজকে যথেষ্ট সাহায্য করে। এইরূপে দুইটি অঞ্চলে পরাজয় বরণ করার পর ভারতে ফরাসী আধিপত্য ও সাম্রাজ্য স্থাপনের দুরাশা চিরতরে ধূলিস্যাৎ হয় এবং সামরিক, বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিরূপে ইংরাজের, একক প্রাধান্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতঃপর মীরজাফর বাংলার মসনদে আসীন হইলে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইংরাজের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। শুদ্ধ কলিকাতার উপরে অধিকার, পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি এবং সামরিক শক্তিরূপে যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মানলাভ ইংরাজের অদৃষ্টে ঘটে। ইতিমধ্যে বাংলার মসনদে নবাব পরিবর্ত্তন হয় ও মীরকাশিম নবাব হইয়া ইংরাজের কর্ম্মচারিগণের নিঃশুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্য করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। ইংরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হয় এবং নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সামরিক বা রাজনৈতিক সুবিধা নবাবের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও নবাব পরাস্ত হন (১৭৬৪ খৃঃ-এ বক্সারের যুদ্ধে)।

পলাশীতে নবাবের পরাজয় ইংরাজের সামরিক উৎকর্ষতার জন্য হয় নাই, নবাবের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাই জয়লাভের প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে নবাবের পরাজয় সম্পূর্ণ সামরিক, মীরকাশিম ইংরাজের সঙ্গে সংঘর্ষের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতে সামরিক প্রস্তুতি করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতৎসত্ত্বেও মীরকাশিম যখন পরাস্ত হইলেন তখন বোঝা গেল এই পরাজয়ের পশ্চাতে রহিয়াছে তৎকালীন ভারতীয় সামরিক ব্যবস্থা এবং নবাবী রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার কোন অন্তর্নিহিত মৌলিক ত্রুটি। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরাজ যাহা প্রাপ্ত হয় নাই বক্সারের পর তাহা প্রাপ্ত হইল। ইংরাজ বাংলার নবাব-স্রষ্টা হইয়া বাংলার প্রকৃত শাসনভার এক সন্ধির বলে নিজেদের হস্তে তুলিয়া লইল। মীরকাশিমের পর পুনরায় মীরজাফর এবং মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নজমদ্দৌলা বাংলার মসনদে নামমাত্র নবাবরূপে আসীন রহিলেন, রাজদণ্ড ইংরাজের হস্তে আসিল। মীরকাশিমকে সাহায্য করার জন্য অযোধ্যার নবাবও ইংরাজের দ্বারা দণ্ডিত হইল, শাস্তিস্বরূপ তাহাকে ইংরাজের হাতে কোরা ও এলাহাবাদ সমর্পণ করিতে হইল।

কিন্তু বাঙ্গালার প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা ইংরেজের হস্তে আসিলেও আইন সঙ্গত ভাবে বাঙ্গালা দেশের মালিক ছিলেন তদানীন্তন মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম। তাহার সঙ্গে বাংলাদেশ সম্বন্ধে কোনও প্রকার আইনানুগ বন্দোবস্ত না করা পর্য্যন্ত বাংলাদেশে ইংরাজের অধিকার ও আধিপত্য সর্ব্বত্র স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না বলিয়া ক্লাইভ কোম্পানীর বাণিজ্য ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সুবিধার জন্য নাম মাত্র দিল্লীর নবাব দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী আদায়ের অধিকারের বন্দোবস্ত করিলেন (১৭৬৫)। বাংলাদেশের উপর ইংরাজের প্রকৃত সামরিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য ইতিপূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দেওয়ানী লাভের পর বাংলাদেশের উপর ইংরাজের সর্ব্বাঙ্গীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পাদপীঠ হইল।]


দাক্ষিনাত্য
ও
ইংরেজ-ফরাসী বিরোধ
১৭৪৬—৬৩
মা রা ঠা রা জ্য
নি জা ম ডো মি নি য় ন
মসলীপট্টম
মহীশূর
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী
ফোর্ট সেন্ট ডেভিড
কারিকল
মাঙ্গালোর
কলিকট
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
কলম্বো

(১) ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে সংঘর্ষ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানীর মধ্যে বাণিজ্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে ইংরেজগণই ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থসম্পদে প্রবল ছিল। কলিকাতা ও মাদ্রাজের তুলনায় চন্দননগর ও পণ্ডিচেরী অত্যন্ত নগণ্য ছিল। অধিকন্তু ফরাসী কোম্পানী ফ্রান্সের সরকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিভিন্ন সময়ে সরকারী হস্তক্ষেপের জন্য বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইত। কিন্তু ইংরাজ কোম্পানী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ইহাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অধিকাংশ কর্ম্মপদ্ধতি ও সিদ্ধান্তকে ইংলণ্ডের পরিচালক সমিতি (Board of Directors) স্বীকার করিয়া লইত। ফরাসী পক্ষে এই ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের প্রথম পর্য্যায়ের নেতা ছিলেন ডুপ্লে (Dupleix)। ডুপ্লে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি যেমন অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন, তেমনই তাহার উচ্চাভিলাষও ছিল অপরিসীম।

তখন ইউরোপ হইতে বেশী ফরাসী সৈন্য ভারতবর্ষে আনার পক্ষে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা ছিল। সেই জন্য ডুপ্লে স্থির করিলেন যে সুদক্ষ ফরাসী সেনা-নায়কগণের সাহায্যে একদল ভারতীয় সিপাহীকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিবেন এবং এইরূপ ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত সিপাহীর সাহায্যে ফরাসীরা ভারতবর্ষে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন। ডুপ্লে কেবলমাত্র ফরাসীদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—ভারতীয় রাজগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পক্ষ সমর্থন করিয়া ফরাসীদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্কল্প করিলেন।

প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ :—১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ (War of Austrian Succession) আরম্ভ হইলে এই

যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বিভিন্ন পক্ষে যোগদান করে। ইউরোপের যুদ্ধের ঢেউ ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিলে ইংরাজ ও ফরাসী পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ফরাসী কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে শান্তিনীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু ইংরাজগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। বার্ণেটের নেতৃত্বে বৃটিশ নৌ-বহর ফরাসী জাহাজ অধিকার করায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ডুপ্লের অনুরোধে আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী মরিসিয়াস দ্বীপের শাসনকর্ত্তা মা হেডি-লা-বুরদনে (La Bourdonnais) এক ফরাসী নৌ-বহর লইয়া ভারতের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। ফরাসী রণপোতের উপস্থিতিতে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। ইংরাজ নৌ-বহর মান্দ্রাজ রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা না করিয়া হুগলীর দিকে প্রস্থান করিল। লা বুরদনে মান্দ্রাজ অবরোধ করিলে প্রায় বিনা যুদ্ধে মান্দ্রাজ ফরাসীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। লা-বুরদনে ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ইংরাজদের হস্তে মান্দ্রাজ প্রত্যর্পণের জন্য আলোচনা চালাইতে লাগিলেন কিন্তু ডুপ্লে লা বুরদনের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। যাহা হউক মান্দ্রাজ শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজের হস্তে প্রত্যর্পিত হইল না।

ইতিমধ্যে এক অঘটন ঘটিল। ইংরাজ ও ফরাসী উভয়েই কর্ণাটের নবাব আনোয়ারউদ্দীনের রাজ্য সীমানায় পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিল। আনোয়ারউদ্দীন প্রথমে ইংরাজকে তাহার এলাকায় যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা কর্ণপাত করে নাই। অতঃপর ফরাসী কর্ত্তৃক মান্দ্রাজ আক্রমণের প্রাক্কালে আনোয়ারউদ্দীন ফরাসীদিগকে অনুরূপ যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিলেন। ডুপ্লে আনোয়ারউদ্দীনকে প্রলোভন দেখাইলেন যে মান্দ্রাজ ইংরাজদের নিকট হইতে অধিকারের পর তাহা আনোয়ারউদ্দীনের হস্তে অর্পিত হইবে। সুতরাং মান্দ্রাজ অবরোধের সময় আনোয়ারউদ্দীন বিশেষ উচ্যবাচ্য করিলেন না। কিন্তু অচিরেই তিনি ফরাসীদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ফরাসীদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু

নবাবের দশ হাজার সৈন্য ফরাসীদের পাঁচ শত সৈন্যের একটি দলের হস্তে পরাজিত হইল। এই কৃতকার্য্যতায় ডুপ্লে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন মান্দ্রাজে তাহার সূত্রপাত দেখিয়া উৎফুল্ল হইলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইংলণ্ড হইতে এক নৌ-বহর ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। এই নৌ-বহর মান্দ্রাজ পুনরুদ্ধারে অসমর্থ হইয়া পাল্টা পণ্ডিচেরী অবরোধ করিল কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া অবরোধ উত্তোলন করিতে বাধ্য হইল। এই সকল ঘটনায় ডুপ্লের খ্যাতি ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া গেল। কিন্তু ডুপ্লের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সূত্রপাত হইতে না হইতেই ইউরোপে অষ্ট্রীয়া উত্তরাধিকারের যুদ্ধ আয়-লা স্যাপেলের সন্ধিতে সমাপ্ত হইল (১৭৪৮ খৃঃ) এবং ভারতবর্ষেও ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণের মধ্যে সন্ধি হইল। ফরাসীরা ইংরেজের হস্তে মান্দ্রাজ প্রত্যর্পণ করিল।

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধঃ—আয়-লা-স্যাপেলের সন্ধির ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে বাহ্যতঃ শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উভয় পক্ষই পরস্পরকে চূড়ান্ত আঘাত করিবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রহিল। উভয় পক্ষের মধ্যে ইংরাজগণ সকল দিক হইতে অধিকতর শক্তিশালী ছিল, কেননা সমুদ্রের উপর তাহাদের আধিপত্য ফরাসী অপেক্ষা বেশী ছিল। এতদ্ব্যতীত ফরাসীদের শক্তি সামর্থ্য মাত্র কর্ণাট অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু ইংরাজদের বঙ্গদেশ ও বোম্বাই-র লাভজনক ব্যবসা ছিল এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহারা এই শেষোক্ত অঞ্চলের অর্থ ও জনবলের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিত। সুতরাং ক্ষমতাদ্বন্দ্বে ইংরাজদের পরিণামে জয়লাভের সম্ভাবনা অধিকতর ছিল।

কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও ডুপ্লে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। স্বল্প সংখ্যক ফরাসী সৈন্যের হস্তে আনোয়ারউদ্দীনের পরাজয়ের মধ্যে তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা

দেখিলেন। তিনি স্থির করিলেন ভবিষ্যতে দেশীয় রাজগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন সেই পক্ষই বিজয়ী হইবে এবং ফরাসীদের প্রতিপত্তি এইভাবে বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। এই উপায়ে ভারতীয় রাজদরবারে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলে এই সম্মান ও প্রতিপত্তির বলে ইংরাজদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইতে অপসৃত করা বিশেষ শক্ত হইবে না। এই নীতি কার্য্যে পরিণত করার সুযোগ শীঘ্রই উপস্থিত হইল।

ডুপ্লে

দক্ষিণাপথে নিজাম উল-মুলুক আসফ জা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেও আপনাকে মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট এবং অন্যান্য জনপদের উপর আধিপত্য দাবি করিতেন। বর্ত্তমান মান্দ্রাজের অন্তর্গত কর্ণাট জনপদ নামে নিজামের অধীন ছিল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাদাতুল্লার বংশধরগণই বংশানুক্রমে এই প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৭৪৪ খৃঃ কর্ণাটের নবাব পরিবারে বিবাদ উপস্থিত হইলে নিজাম হস্তক্ষেপ করিলেন এবং আনোয়ারউদ্দীন নামে এক অনুগত ব্যক্তিকে নাবালক নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন। অত্যল্পকাল পরে নাবালক নবাবকে নিহত করিয়া আনোয়ারউদ্দীন কর্ণাটের নবাব হইয়া বসিলেন। প্রাক্তন নবাব দোস্ত আলীর জামাতা চাঁদা সাহেব মারাঠাদের হস্তে বন্দী ছিলেন; সাত বৎসর পরে ১৭৪৮ সালে বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি কর্ণাটের সিংহাসন দাবী করিলেন।

আর্কটের সিংহাসন সম্বন্ধে বিরোধ

এই সময়ে হায়দ্রাবাদেও সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। ১৭৪৮ খৃঃ-এ বৃদ্ধ নিজাম আসফ-জার মৃত্যু হইলে তাহার দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ ও দৌহিত্র মুজাফ্‌ফর জঙ্গের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। নাসির জঙ্গ সিংহাসনে বসিলে মুজাফ্‌ফর জঙ্গ এই বলিয়া সিংহাসন দাবি

হায়দ্রাবাদের সিংহাসন সম্বন্ধে বিরোধ

করিলেন যে মোগল সম্রাট তাহাকেই দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছেন।

ডুপ্লে দেখিলেন এই কলহই ফরাসী-প্রভাব বিস্তারের সর্ব্বোত্তম সুযোগ। তিনি চাঁদা সাহেব ও মুজাফ্ফর জঙ্গের সঙ্গে এই মর্ম্মে গোপন চুক্তি করিলেন যে ফরাসী শক্তি উভয়কে স্ব স্ব রাষ্ট্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিবে। ডুপ্লে বুঝিলেন, যদি নিজামের গদিতে তাহার পক্ষের কাহাকেও বসাইতে পারেন এবং কর্ণাটের নবাবীপদে তাহার মনোনীত ব্যক্তি নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে দক্ষিণাপথে ফরাসীদের নিষ্কণ্টকে প্রভুত্ব করিবার আর বাধা থাকে না; এই সকল মিত্র রাজ্যের নিকট হইতে তিনি সহজেই ফরাসী কোম্পানীর জন্য নানারূপ সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেন।

ডুপ্লের কর্ম্মনীতি

উপরোক্ত চুক্তি অনুযায়ী ত্রি-শক্তি মিলিত হইয়া আনোয়ারউদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করিল (১৭৪৯)। আনোয়ারউদ্দীনের পুত্র মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লীতে পলায়ন করেন। চাঁদা সাহেব কর্ণাটের নবাব হইলেন। একদল ফরাসী সৈন্য ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিবার জন্য প্রেরিত হইল। মহম্মদ আলি নাসির জঙ্গের সহিত ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজেরা ডুপ্লের মত উদ্যমশীল ছিল না বলিয়া প্রথমতঃ এই সব ব্যাপারে অতটা গুরুত্ব আরোপ করে নাই এবং মহম্মদ আলির জন্য ত্রিচিনপল্লীতে সামান্য সাহায্য পাঠাইয়া নিবৃত্ত রহিল। নাসির জঙ্গ স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভাগিনেয় মুজাফ্ফর জঙ্গকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন; কিন্তু অচিরেই আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন (১৭৫০ খৃঃ)। বন্দীদশা হইতে মুক্ত মুজাফ্ফর জঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার বলিয়া ঘোষিত হইলেন এবং হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কৃতজ্ঞ নিজাম সাহায্যকারী ফরাসীগণকে পর্য্যাপ্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন। তিনি ডুপ্লেকে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ সমগ্র মোগল অধিকারভুক্ত অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন

এবং পণ্ডিচেরীর সন্নিকটস্থ ও উড়িষ্যার উপকূলস্থ জনপদ এবং মসলীপত্তম ফরাসীদিগকে প্রদান করিলেন। মুজাফ্‌ফর জঙ্গের অনুরোধে ফরাসী সেনাপতি বুসি একদল সৈন্য সহ হায়দ্রাবাদ দরবারে অবস্থান করিতে লাগিল। অল্প দিন পরে মুজাফ্‌ফর জঙ্গের মৃত্যু হইলেও ফরাসীদের কোন অসুবিধা হইল না, বুসি সলাবৎ নামক নিজামের এক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া হায়দ্রাবাদের দরবারে দীর্ঘকাল ফরাসী প্রতিপত্তি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ডুপ্লের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল, ফরাসীর সাহায্যে কর্ণাটের সিংহাসনে চাঁদা সাহেব এবং হায়দ্রাবাদে মুজাফ্‌ফর জঙ্গের পুত্র সলাবৎ জঙ্গ আসীন হওয়ায় ফরাসীরা দাক্ষিণাত্যে এবং কর্ণাটে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে ফরাসীদের সৌভাগ্য-সূর্য্য গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিল।

হায়দ্রাবাদে ফরাসী প্রতিপত্তি

কিন্তু তখন পর্য্যন্ত মহম্মদ আলি সম্বন্ধে কোন স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। ত্রিচিনপল্লীতে অবরুদ্ধ মহম্মদ আলি ইংরাজ সৈন্যের সাহায্যে ফরাসীর অবরোধ সত্ত্বেও কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ফরাসী সৈন্য তাঞ্জোর অধিকার করিতে যাইয়া অযথা শক্তি ক্ষয় করায় ত্রিচিনপল্লী অধিকার করিতে বিলম্ব হইতেছিল। এ যাবৎ কাল ইংরাজ কতকটা কর্ম্মশৈথিল্য ও উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা উপলব্ধি করিল যে ক্রমবর্দ্ধমান ফরাসী শক্তির বিরুদ্ধে কোন উপায় অবলম্বন না করিলে দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবে। এই সময়ে সণ্ডার্স নামক এক ব্যক্তি মান্দ্রাজের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব ও পরিণতি উপলব্ধি করিয়া ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরাজের সর্ব্বশক্তি নিয়োগের সঙ্কল্প করিলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে উভয় পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষণা না হইলেও এবং ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পূর্ণ শান্তি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে উভয় দেশের বণিক সম্প্রদায় পরস্পর জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইল।

ইংরেজগণ ফরাসীর বিরুদ্ধে মহম্মদ আলির পক্ষ সমর্থনের সিদ্ধান্ত করিয়া একদল ইংরাজ সৈন্য ত্রিচিনপল্লীতে প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে সেনাপতি লা-কে ইংরাজের বিপক্ষে প্রেরণ করিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে সক্ষম হইলেন না। ইতিমধ্যে মারাঠা নেতা মোরারী রাও এবং মহীশূর ও তাঞ্জোরের অধিপতিদ্বয় মহম্মদ আলি ও ইংরাজের পক্ষে যোগদান করিল। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও মহম্মদ আলি অবরুদ্ধ অবস্থায়ই রহিল।

ইতিমধ্যে নূতন এক ঘটনার জন্য যুদ্ধের গতি একেবারে পরিবর্ত্তিত লইয়া গেল। রবার্ট ক্লাইভ নামক একজন অসমসাহসিক ইংরাজ সেনানী যুদ্ধের অবস্থা ইংরাজদের অনুকূলে আনার জন্য এক প্রস্তাব করিলেন। তিনি মান্দ্রাজ কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইলেন যে চাঁদা সাহেব যখন ফরাসীদের সহায়তার ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিয়া আছেন সেই অবস্থায় তাহার রাজধানী আর্কট আক্রমণ করিতে পারিলে অবরুদ্ধ মহম্মদ আলির সুবিধা হইবে। ক্লাইভ কেবলমাত্র পাঁচশত ভারতীয় এবং ইংরাজ সৈন্য লইয়া অতর্কিতে আর্কট অভিযান করিলেন। আর্কট ক্লাইভ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল চাঁদা সাহেব সংবাদ পইয়া পুত্র রাজা সাহেবকে আর্কট পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিলেন, তিপ্পান্ন দিন ক্লাইভ আর্কট অধিকার করিয়া রহিলেন, রাজা সাহেব পরাস্ত হইয়া ইংরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। ইংরাজের সাহায্যে মহম্মদ আলি আর্কটের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন ; চাঁদা সাহেব নিহত হইলেন।

ডুপ্লে এই পরাজয়ের পরেও অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষ ডুপ্লের এই অগ্রসর নীতির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিল না। এই যুদ্ধে পরাজয় ও অর্থব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া তাহারা ডুপ্লের নীতিকে অপছন্দ করিল এবং গডেহু নামক এক ব্যক্তিকে ডুপ্লের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিল। ১৭৫৪ খৃঃ-এ গডেহু ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ডুপ্লের অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করিলেন এবং ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিতে উভয় পক্ষ যুদ্ধের সময়ে

বিজিত পরস্পরের অঞ্চল সমূহ প্রত্যর্পণ করিল এবং ভবিষ্যতে উভয় পক্ষ দেশীয় রাজাদের কোন আভ্যন্তরীণ বিবাদে কোন পক্ষ আশ্রয় করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। এইভাবে ইঙ্গ-ফরাসী ক্ষমতাদ্বন্দ্বের দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।

ডুপ্লের পতনের কারণ

(১) ডুপ্লের অবলম্বিত নীতি ব্যর্থ হইবার প্রধান কারণ এই যে তিনি তাহার নীতিকে সার্থক ও কার্য্যকরী করার জন্য ফ্রান্স হইতে সমর্থন ও পর্য্যাপ্ত সাহায্য পান নাই। সেই সময়ে ফ্রান্স আমেরিকার ব্যাপার লইয়া যথেষ্ট বিব্রত ছিল বলিয়া ভারতবর্ষের ব্যাপারে জড়িত হইতে চায় নাই; অধিকন্তু ভারতবর্ষের ব্যাপারেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে নাই। সুতরাং ডুপ্লে স্বদেশের রাষ্ট্রের যথোচিত সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। অবশ্য ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সপক্ষে ইহাও বলা চলে যে ডুপ্লে তাহার নীতি ও কার্য্যক্রম সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সুস্পষ্ট করিয়া স্বদেশীয় রাষ্ট্রের গোচরীভূত করেন নাই। স্বদেশস্থিত উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ সংবাদ অন্য সূত্রে অথবা ডুপ্লের নিকট হইতে অত্যন্ত বিলম্বে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্বদেশ হইতে সমর্থনের অভাব

(২) ডুপ্লের নীতি সফল না হইবার দ্বিতীয় কারণ এই ডুপ্লে ভারতীয় রাজগণের আভ্যন্তরীণ বিবাদে পক্ষাবলম্বন করিয়া ফরাসীদের যে সুবিধা প্রাপ্তির নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন সেই নীতি যে তাহার প্রতিপক্ষ ইংরেজও গ্রহণ করিয়া অনুরূপ সুবিধার প্রত্যাশা করিতে পারে তাহা তিনি অনুধাবন করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ ডুপ্লে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে ইংরাজের সাহায্য প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তিনি মহম্মদ আলির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইতে পারিতেন।

ইংরাজগণও তাহার নীতি অবলম্বন করিয়াছিল

(৩) তৃতীয়তঃ, ফরাসী সেনানায়কদের সামরিক অপদার্থতা তাহার অসাফল্যের অন্যতম কারণ। সেই যুগে সামরিক সাফল্য সেনাপতিদের ব্যক্তিত্বের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিত। ক্লাইভের মত অসমসাহসিক ও নির্ভীক সেনাপতির সমকক্ষ কোন ব্যক্তি ফরাসীদের পক্ষে ছিল না। ফরাসী সেনাপতি লা-র কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইতস্ততঃ-মনোভাব ও উদ্যমশৈথিল্যের জন্যই ফরাসীদিগকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। যদি ডুপ্লে যথোচিত দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধারম্ভের প্রারম্ভে অন্ততঃ ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগেও যুদ্ধ সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইতেন তাহা হইলে ফরাসীদিগকে পরিণামে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হইত না, ডুপ্লেও ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার গৌরব অর্জ্জন করিতে পারিতেন এবং স্বদেশ হইতেও অকুণ্ঠ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন।

ফরাসী সমর নায়কদের অপদার্থতা

ডুপ্লের চরিত্র ঃ—ডুপ্লের চরিত্রে উচ্চাভিলাষ ও আত্মম্ভরিতা প্রবল ছিল। তিনি আত্মশক্তি ও স্বয়ং-অবলম্বিত নীতির সার্থকতায় অত্যধিক বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া তাহার ভারতবর্ষস্থিত কার্য্যক্রম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংবাদ স্বদেশের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিজ্ঞাপিত করিতে যথেষ্ট বিলম্ব করিতেন এবং পরাজয়ের সংবাদ গোপন করিয়া মাত্র বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিতেন। ফলে ফরাসী কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ ডাচ বা ইংরাজদের চিঠিপত্র বা বার্ত্তালিপির মারফতে প্রকৃত সংবাদ অবগত হইয়া ডুপ্লের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পরে যে লা-র ত্রিচিনপল্লীতে আত্মসমর্পণের সংবাদের পর ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ প্রায় এক বৎসর ডুপ্লের নিকট হইতে কোন সংবাদ পান নাই ; ফলে ডুপ্লের স্থানে গডেহু-কে বসাইবার অভিলাষ করিয়া কোম্পানী গডেহু-কে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গডেহু-কে প্রেরণের ছয় মাস পরে কোম্পানী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পূর্ণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ডুপ্লেকে পুনরায় পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ডুপ্লে স্বদেশাভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। ডুপ্লের এই তুষ্ণীভাব তাহার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

ডুপ্লের নীতি ব্যর্থ হইলেও তিনি যে একজন দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। "In spite of his failure, Dupleix is a striking and brilliant figure in Indian history." (Roberts) তাহার চরিত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচকের বিতর্কের অবকাশ থাকিলেও এই কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে তিনি সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাহার রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে বাস্তবিকই কল্পনা-কুশলতা ও অসম-সাহসিকতার সুস্পষ্ট আভাস ছিল। তিনি ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে ফ্রান্স পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইতে পারিত। তাহার কর্ম্মকৃতির জন্য ফ্রান্স দীর্ঘকালের জন্য প্রাচ্য দেশে মর্য্যাদার সর্ব্বোচশিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তিনি ভারতীয় রাজন্যবর্গের নিকট যে উচ্চ সম্মান ও যশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তী যুগের অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা অতিক্রান্ত হয় নাই। সর্ব্বোপর ডুপ্লে সমসাময়িক ইংরাজদের মনে যে ভীতির সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহাই তাহার অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার যথেষ্ট পরিচায়ক।/

(২) বঙ্গদেশে ইংরেজের সাফল্য

[বঙ্গদেশে ইংরাজের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টার মূলে ছিল বঙ্গদেশ হইতে ফরাসী শক্তি সম্পূর্ণ বিলোপ করার ইচ্ছা। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসী পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়াছিল এবং ডুপ্লের কূটনীতিকুশলতায় ইংরাজ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ণাটে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইলেও বঙ্গদেশে ইংরাজ ও ফরাসী শান্তিতে বসবাস করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ইংরাজগণ উপলব্ধি করিল যে, বঙ্গদেশে কোন প্রকার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার না করিতে পারিলে ফরাসী শক্তি বঙ্গদেশের নবাবের আশ্রয়ে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর নূতন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার ইংরাজবিরোধী আচরণ ও ফরাসী প্রীতির পরিচয় পাইয়া ইংরাজগণ

শঙ্কিত হইলেন। নবাব বিরোধী দলের কৃতষড়যন্ত্রের রন্ধ্রপথে ইংরেজগণ বঙ্গদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারে সক্ষম হইলেন। বঙ্গদেশ হইতে ফরাসীর প্রতিপত্তির সম্ভাবনা চিরতরে লুপ্ত হইল। বঙ্গদেশে সাফল্যের বলে ইংরাজগণ পরিণামে দাক্ষিণাত্যে হইতে ফরাসীদিগকে উৎপাটিত করিতে সক্ষম হইল। সুতরাং বঙ্গদেশে ইংরেজের ক্ষমতালাভকে ভারতবর্ষের ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অন্যতম পর্ব্ব বলা যাইতে পারে।]

মুর্শিদকুলি খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণঃ—বাংলাদেশ দিল্লীর সম্রাটের অধীন অন্যতম প্রদেশ হইলেও মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির সময়ে ইহা কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়াছিল। ১৭০৩-৪ খৃঃ-এ মুর্শিদকুলি খাঁ ঔরঙ্গজীব কর্ত্তৃক বাংলাদেশের সুবাদার নিযুক্ত হন এবং তিনি ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় স্বাধীন ভাবেই বঙ্গদেশ শাসন করেন। ১৭২৭ খৃঃ-এ তাহার মৃত্যুর পর তাহার জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলার নবাব হইলেন। পূর্ব্ব-প্রথানুযায়ী বাংলার নবাব বাদশাহের অধীন থাকিলেও বাদশাহ কোন সময়েই বাংলার নবাবের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন নাই। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তাহার রাজত্বের অল্প সময়ের মধ্যেই বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ ইতিপূর্ব্বেই বাদশাহের নিকট হইতে বঙ্গদেশের নবাবী মঞ্জুর করাইয়া ফর্ম্মাণ আনাইয়াছিলেন। সুতরাং আইনতঃ তিনিই নবাব হইলেন। আলিবর্দ্দী শাসনকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন কিন্তু মারাঠা বা বর্গীর আক্রমণে তিনি ভয়ানক বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভে অসমর্থ হইয়া তিনি বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা ও উড়িষ্যা প্রদেশের এক অংশ ছাড়িয়া দিবার সর্ত্তে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ

সুজাউদ্দীন

সরফরাজ খাঁ

আলিবর্দ্দী খাঁ

সিরাজদ্দৌলা ও ইংরেজ ঃ—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল আলিবর্দ্দী খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাহার কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র সিরাজদ্দৌলাকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব মনোনীত করিয়া যান। আলিবর্দ্দী খাঁ তাহার অপর দুই জামাতাকে যথাক্রমে পূর্ণিয়া ও ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। এই দুই পক্ষ সিরাজের নবাব হওয়াকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে নাই এবং ইহারা সিরাজের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। তিন জামাতার কেহই জীবিত ছিল না। পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তার পুত্র শওকৎ জঙ্গ ও ঢাকার শাসনকর্ত্তার বিধবা স্ত্রী ঘসেটি বেগম উভয়েই সিরাজদ্দৌলাকে নবাবী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য উদ্যোগী হইল। বিশেষতঃ দেওয়ান রাজবল্লভের পরামর্শে পরিচালিত ঘসেটি বেগম সিরাজের বিপক্ষতায় সাহায্য করায় উদ্দেশ্যে ইংরাজগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে লাগিল। ইংরাজগণ বাংলার মসনদে আলিবর্দ্দী খাঁ বা সিরাজ কাহাকেও ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আলিবর্দ্দী খাঁ তাহার রাজ্যমধ্যে ইউরোপীয় বণিকদিগকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর জীবিতকালে তাহার আদেশ অমান্য হয় নাই। ইংরেজ ও ফরাসীরা যখন কর্ণাটে যুদ্ধ বিগ্রহ লিপ্ত, তখনও নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে শান্তিভঙ্গ করিতে তাহারা সাহসী হয় নাই। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর ফরাসীরা চন্দননগরে এবং ইংরেজরা কলিকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। সিরাজদ্দৌলা উভয় পক্ষকেই দুর্গ নির্ম্মাণ স্থগিত রাখিতে আদেশ দিলেন। ফরাসীরা আদেশ পালন করিল, কিন্তু ইংরেজরা ইহাতে কর্ণপাত করিল না। অধিকন্তু ইংরেজরা বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সকল সুবিধা পাইয়াছিলেন তাহার অপব্যবহার করিতেন। ইত্যবস্থায় নবাব হইয়া সিরাজদ্দৌলাকে তিনটি শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইল। প্রথমতঃ, পূর্ণিয়ার শওকতজঙ্গের বাংলার নবাবীর উপর দাবি,

ইংরাজের সহিত বিরোধ —কারণ

(১) বিনা আদেশে দুর্গ নির্ম্মাণ

দ্বিতীয়তঃ, ঘসেটি বেগম ও তাহার দেওয়ান রাজবল্লভের শত্রুতা এবং তৃতীয়তঃ, ইংরাজগণের অবাধ্য আচরণ। সিরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সুকৌশলে মাতৃস্বসা ঘসেটি বেগমকে স্বীয় অন্তঃপুরে আনিয়া রাখিয়া নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিলেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস নবাবের ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কলিকাতায় পলায়ন করিলেন। ইংরেজগণ সিরাজের পলাতক প্রজা কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় প্রদান করিয়া নবাবের অধিকতর বিরাগ ভাজন হইলেন। এতদ্ব্যতীত সিরাজ ইংরাজকে কলিকাতায় দুর্গপ্রাকারাদি নির্ম্মাণে বিরত হইবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজগণ সিরাজের আদেশ মান্য না করিয়া মিথ্যা অজুহাতের দ্বারা নবাবের বিরক্তি উৎপাদন করিল। সিরাজ উদ্ধত ইংরাজকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিলেন। নবাবের শক্তির প্রতি স্পর্দ্ধাকারী ইংরেজকে শায়েস্তা করা তাহার প্রধান কর্ত্তব্য হইল। অতঃপর ইংরাজদিগকে দমন করিবার জন্য সিরাজ স্বয়ং সসৈন্যে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন (১৬ই জুন, ১৭৫৬)। কলিকাতার ইংরেজ গভর্ণর ড্রেক এই আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া অধিকাংশ কর্ম্মচারীর সহিত জলপথে পলায়ন করিয়া কলিকাতার ২০ মাইল দূরে ফলতায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহারা কলিকাতায় রহিল তাহারা কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নবাবের সৈন্যগণের নিকট আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য হইল। কথিত আছে ফোর্ট উইলিয়মস্থিত ইংরাজগণের আত্মসমর্পণের পর ১৪৬ জন ইংরাজকে একটি অতি ক্ষুদ্রপরিসর কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখার ফলে তাহাদিগের অধিকাংশের শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হয়, মাত্র ২৩ জন ব্যক্তিকে জীবিত অবস্থায় পরদিন দেখা যায়। এই বহুল প্রচারিত ঘটনা

(২) বাণিজ্য সুবিধার অপব্যবহার

(৩) পলাতক প্রজা কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় প্রদান

নবাবের কলিকাতায় উপস্থিতি

ইংরাজ সৈন্যের আত্মসমর্পণ

ইতিহাসে 'অন্ধকূপ-হত্যা' নামে খ্যাত। এই তথাকথিত 'অন্ধকূপ' হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত ইংরেজ হলওয়েল এই দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং তিনি এই কাহিনী প্রচারের নায়ক। বর্ত্তমানে এই অন্ধকূপ হত্যার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে এবং নানা প্রকার বিচার ও আলোচনার পর ইহা যে একেবারে অলীক তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যে শোচনীয় বিবরণ ইহার সম্বন্ধে আমরা প্রাপ্ত হই তাহা হলওয়েলের মস্তিষ্ক প্রসূত বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। আর যাহারা এই ঘটনাকে সত্য বলিয়া মনে করেন তাহাদের অধিকাংশই ইহা স্বীকার করেন যে এই ব্যাপারে নবাবের নিজের কোন দোষ ছিল না।

অন্ধকূপহত্যা-সংক্রান্ত জনশ্রুতি

কলিকাতা অধিকারের পর সিরাজ সেনাপতি মানিকচাঁদের উপর কলিকাতার ভার অর্পণ করিয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পূর্ণিয়ার নবাব শওকতজঙ্গ ইতিমধ্যে দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহের নিকট হইতে বঙ্গদেশের সুবাদারের সনদ কোন প্রকারে সংগ্রহ করিলেন। অতঃপর শওকত সিরাজের বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইংরাজকে দমন করিয়া সিরাজ অতি তৎপরতার সঙ্গে শওকতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং যুদ্ধে শওকতকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া সাময়িকভাবে নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতা পতনের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে মাদ্রাজ কাউন্সিল ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে সেনাপতি করিয়া একদল সৈন্য ও কয়েকটি রণপোত কলিকাতা প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা অনায়াসে কলিকাতা অধিকার করিলেন; মানিক-চাঁদ নামমাত্র বাধা প্রদান করিয়া মুর্শিদাবাদে পলায়ন করিলেন। নবাব কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিলেন কিন্তু জয় পরাজয় সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিলেন (আলিনগরের সন্ধি, ৯ই

আলিনগরের সন্ধি

ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭)। স্থির হইল ইংরেজরা তাহাদের কেল্লা ও কোম্পানীর পূর্ব্ব প্রচলিত অধিকার ফিরিয়া পাইবেন। উপরন্তু তাহাদের ক্ষতিপূরণ করা হইবে এবং কলিকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া হইবে। ইংরেজরা সাময়িক শান্তি কামনা করিয়াছিল, এই সন্ধিতে তাহাদের কামনা পূর্ণ হইল। আলিনগরের সন্ধির ব্যাপার হইতে সিরাজের আচরণে ইতস্ততা ও কর্ম্মোদ্যমের শৈথিল্য দেখা যাইতে লাগিল। ইংরেজরা তাহার সঙ্গে এযাবৎ-কাল যেইরূপ বিপক্ষাচরণ করিয়া আসিতেছে তাহার পর ইহাদের সঙ্গে উপরোক্ত সুবিধাজনক সর্ত্তে সন্ধি করা অযৌক্তিক হইয়াছে। শত্রু হিসাবে ইংরেজদের উপর কঠোর আচরণ করা তাহার পক্ষে সঙ্গত ছিল—কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি শত্রুর বলবৃদ্ধিতে সাহায্য করিলেন। হয়তো সিরাজ তাঁহার কর্ম্মচারীদের মধ্যে আনুগত্য-হীনতার আভাস পাইয়াছিলেন; ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল নাদির সাহেব উত্তরাপথ আক্রমণের সংবাদ। পাছে নাদিরের অভিযান বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ও তাহার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীবৃন্দ তাহার বিপক্ষের দলপুষ্টি করে এই আশঙ্কায় তিনি দ্রুত ইংরাজের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন।

ইত্যবসরে ইউরোপের সপ্তবর্ষ যুদ্ধের সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছিতেই ইংরেজ ও ফরাসী পুনরায় যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইল। ইংরেজগণ ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর দখল করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। আলিনগরের সন্ধির সর্ত্ত উল্লেখ করিয়া সিরাজ ইংরাজদিগকে চন্দননগর আক্রমণ করিতে নিষেধ করিলেন। ক্লাইভ ও ওয়াটসন নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া চন্দননগর আক্রমণ করিয়া ইহা সহজে অধিকার করিল। হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার একটু সচেষ্ট হইলে চন্দননগর রক্ষা পাইতে পারিত। কিন্তু নবাব এ সম্বন্ধে নন্দকুমারকে কোন বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায় না, উৎকোচের বশীভূত হইয়া নন্দকুমার নিশ্চেষ্ট ছিলেন।

পলাতক ফরাসীরা মুর্শিদাবাদের দরবারে সমাদরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে

ইংরেজ প্রমাদ গণিল। সিরাজ হায়দ্রাবাদের নিজামের দরবারে অবস্থিত ফরাসী প্রতিনিধি বুসীর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ক্লাইভ বুঝিতে পারিলেন নবাব যদি ফরাসীর সাহায্য প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তিনি পণ্ডিচেরী হইতে আগত একদল ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে বাংলাদেশ হইতে ইংরাজদিগকে বিতাড়ন করার নীতি গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। এইরূপ পরিস্থিতিতে সিরাজ যতদিন নবাব থাকিবেন ততদিন বাঙ্গালায় ইংরেজদের স্বার্থ নিরাপদ হইবে না। ইংরেজদের মনোনীত কোন ব্যক্তিকে বাংলার নবাব করিতে পারিলে বাঙ্গালাদেশে ইংরেজদের স্বার্থ ভালভাবে রক্ষিত হইতে পারিবে।

এদিকে সিরাজদ্দৌলার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া বাঙ্গালার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ বণিক জগৎশেঠ, সিরাজের আত্মীয় ও সেনাপতি মীরজাফর, নবাবের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী রাজা রাজবল্লভের নাম উল্লেখযোগ্য। ক্লাইভ ইহাদের সহিত ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ রীতিমত সন্ধিপত্র রচনা করিলেন। স্থির হইল ইংরেজগণ সামরিক সাহায্য প্রদান করিয়া সিরাজের পরিবর্ত্তে মীরজাফরকে সিংহাসনে স্থাপন করিবেন। এই সাহায্যের প্রত্যুপকার স্বরূপ মীরজাফর নবাব হওয়ার পর ইংরাজদিগকে সিরাজদ্দৌলা প্রদত্ত সমস্ত সুবিধা মঞ্জুর করিবেন, বৃটিশের সঙ্গে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ হইবেন, ফরাসীদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিবেন, কলিকাতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দরুণ যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন এবং কলিকাতাস্থ ইউরোপীয়ানদিগকে পর্য্যাপ্ত অর্থপ্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিবেন। এতদ্ব্যতীত বিলাতস্থিত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের অগোচরে ব্যক্তিগতভাবে ইংরাজ সৈন্য ও বঙ্গদেশের কাউন্সিলের সভ্যগণকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করা হইবে। উমিচাঁদ নামে একজন শিখ বণিক এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতেন। তাহাকে তাহার প্রার্থিত অর্থ হইতে বঞ্চিত

করার জন্য ক্লাইভ ওয়াটসনের নাম একখানি সন্ধিপত্রে জাল করিয়াছিলেন। এই সঙ্কটজনক সময়ে সিরাজদ্দৌলা মোটেই বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। যে পলাতক ফরাসীদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া তিনি ইংরাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এই দুঃসময়ে তিনি তাহার বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীদের পরামর্শে তাহাদিগকে তাহার আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিতে দ্বিধা করিলেন না। বিদায় লইবার পূর্ব্বে ফরাসীরা আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে নবাবকে সতর্ক করিয়া গেল, কিন্তু গোপন চুক্তির কথা অবগত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নবাব কিছুই বুঝিতে চেষ্টা করিলেন না। ষড়যন্ত্রের কথা জ্ঞাত হইয়াও তিনি ষড়যন্ত্রকারিগণের নেতা মীরজাফরকে কারারুদ্ধ করিবার বন্দোবস্ত করেন নাই। পরিবর্ত্তে তিনি তাহার 'মহান প্রতিশ্রুতিতে' বিশ্বাস করিয়া তাহাকেই সেনাপতিত্বের দায়িত্ব প্রদান করিলেন।

উদ্যোগ আয়োজন শেষ হইলে ক্লাইভ একদিন নবাবের প্রতি সন্ধিভঙ্গের অভিযোগ আরোপ করিয়া প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। নবাবও সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মুর্শিদাবাদের

পলাশীর যুদ্ধ, ২৩শে জুন, ১৭৫৭

প্রায় তেইশ মাইল দূরে পলাশীর আম্রকাননে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইল (২৩শে জুন, ১৭৫৭)। নবাব পক্ষের সেনাপতিদ্বয় মীরজাফর ও রায় দুর্লভ সসৈন্যে যুদ্ধে যোগদান না করিয়া নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় একপার্শ্বে অবস্থান করিয়া রহিল। কেবলমাত্র মীরমদন ও মোহনলাল এবং একজন ফরাসী সেনানায়ক স্বল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক গোলার আঘাতে মীরমদন নিহত হইলে নবাব অত্যন্ত ভীত

নবাবের পরাজয়

হইয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে যুদ্ধের ভার গ্রহণ করার জন্য কাতর অনুনয় করিলেন। মীরজাফর যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আদেশ দিলেন। তাহার এই আদেশের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, যে স্বল্প সংখ্যক সৈন্যদল মোহনলালের নেতৃত্বে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিল তাহাদের মনোবল

ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। অতঃপর যুদ্ধের মীমাংসা হইয়া গেল, ইংরাজ পক্ষ জয়লাভ করিল। নবাব শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিলেন এবং ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সিরাজ মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়নের পথে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন এবং মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে নিহত হইলেন। ক্লাইভ পুরস্কার স্বরূপ নগদ প্রায় ২,৩৪০০০ পাউণ্ড এবং বাৎসরিক ত্রিশ হাজার পাউণ্ড আয়ের একটি জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। যাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারা সকলেই প্রতিশ্রুতি মত টাকা আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু একসঙ্গে সকলের দাবি মিটাইবার মত অর্থ মুর্শিদাবাদের রাজকোষে ছিল না। সুতরাং স্থির হইল কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করা হইবে।

মীরজাফর নবাব

পলাশী যুদ্ধের তাৎপর্য্য

যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা বিবেচনা করিলে পলাশীর যুদ্ধকে সামান্য খণ্ড-যুদ্ধের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। ইংরেজ পক্ষে তেইশ জন নিহত ও উনপঞ্চাশ জন আহত এবং নবাব পক্ষে পাঁচশত জন নিহত ও ইংরেজের অনুরূপ সংখ্যা আহত হয়। কিন্তু ফলাফলের গুরুত্ব বিচারে পলাশীর যুদ্ধ পৃথিবীর চূড়ান্ত মীমাংসক যুদ্ধগুলির অন্যতম। পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভের দ্বারা বাঙ্গালার সম্পদ হস্তগত করিয়া ইংরেজগণ দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চূড়ান্ত জয়লাভ করিল। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় না ঘটিলে হয়তো বন্দিবাসে ও পণ্ডিচেরীতে লালীর পরাজয় ঘটিত না। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পলাশী যুদ্ধের পরোক্ষ দল।

পলাশী যুদ্ধের সময়ে ক্লাইভের আচরণঃ— ক্লাইভের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বহু অনুকূল আলোচনা হইয়াছে। অতিরঞ্জন বাহুল্যে কখনও তাহার

সামান্য ত্রুটিকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে অথবা অতি সাধারণ যুদ্ধাভিযানকে অসাধারণ বীরত্বের কার্য্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উমিচাঁদ সম্পর্কিত জালিয়াতি ব্যাপার দোষাবহ হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু স্থানকাল এবং যুগধর্ম্মের কথা স্মরণ করিলে· ক্লাইভের এই অপকার্য্যের গুরুত্ব অনেকটা লঘু হইয়া যায়। পক্ষান্তরে তিনি কোন বিশিষ্ট সামরিক বা রাজনৈতিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তিনি ফরাসীদের সঙ্গে বিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন না কেবল ওয়াট্‌সনের দৃঢ়তায় ফরাসীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অথচ এই ফরাসী বিরোধ উপলক্ষ করিয়াই সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন কি যুদ্ধারম্ভ হওয়ার পরও তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। পলাশী যুদ্ধের দুইদিন আগে কাটোয়ার সমর-সভায় ক্লাইভ যুদ্ধ করার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি পলাশী রণক্ষেত্রেও তিনি সৈন্যগণকে আক্রমণ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য মেজর কিলপ্যাট্রিককে তিরস্কার করিয়াছিলেন। সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ক্লাইভের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব কিছুই ছিল না। কিন্তু ক্রমান্বিত ত্রুটি সত্ত্বেও ক্লাইভ যে অসাধারণ নায়কোচিত গুণ ও বিপজ্জনক অভিযানে ঝাপাইয়া পড়ার মত উদ্যমের অধিকারী ছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না।

সিরাজদ্দৌলার চরিত্র

বঙ্গদেশের রাষ্ট্র বিপ্লবের সমালোচনা

সিরাজের বিরুদ্ধে মীরজাফর প্রভৃতির ষড়যন্ত্রকে অনেকে দেশদ্রোহিতার পর্য্যায়ে ফেলেন। কিন্তু এই জাতীয় ষড়যন্ত্র ঐ যুগের সাধারণ রীতি ছিল এবং আলিবর্দ্দীও স্বয়ং ষড়যন্ত্রের সাহায্যেই নবাব হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলাও আদর্শ দেশপ্রেমিকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন এবং দেশ রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। উভয়পক্ষই ব্যক্তিগত

স্বার্থ রক্ষার জন্য স্ব-স্ব কার্য্যক্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা কেহই মনে স্থান দেন নাই। পলাশী যুদ্ধের সময়ে ষড়যন্ত্রকারিগণ একথা মনেও স্থান দিতে পারেন নাই যে তাহারা দেশের শাসনভার বিদেশীর হস্তে সমর্পণ করিতে যাইতেছেন, ইংরাজগণও ভাবিতে পারে নাই যে পলাশীর জয়লাভে তাহারা বঙ্গদেশের প্রভুত্ব হস্তগত করিতে পারিবে। পরবর্ত্তী কালে যে ক্রমশঃ ইংরেজের প্রভুত্ব বঙ্গদেশের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা অংশতঃ মীরজাফরের চরিত্রের ত্রুটির জন্য, অংশতঃ তদানীন্তন ভারতীয় বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্যই হইয়াছে। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের পশ্চাতে মনুষ্য ও জাতির ভাগ্য নিয়ামক নিয়তির যে অলক্ষ্য হস্ত নাই তাহাও বলা চলে না।

তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ ঃ—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সংবাদ ভারতবর্ষে পৌছিতেই পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ডুপ্লে ইতিপূর্ব্বেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ যুদ্ধ চালাইবার জন্য কাউন্ট লালিকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। লালির আগমনের পূর্ব্বেই ক্লাইভ ও ওয়াটসন চন্দননগর অধিকার করিয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ইংরেজদের প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং বঙ্গদেশ হইতে পোককের নেতৃত্বে এক নৌ-বহর ফরাসীর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইল।

কাউন্ট লালি সেনানায়ক হিসাবে অনুপযুক্ত ছিলেন না কিন্তু উদ্ধত ব্যবহারের জন্য অনুগামীদের পর্য্যাপ্ত সহযোগিতা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। লালি প্রথমতঃ সেণ্ট ডেভিড দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন এবং মান্দ্রাজ অবরোধের জন্য সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু অর্থাভাবে অসুবিধা হওয়ায় অর্থ আদায়ের জন্য তাঞ্জোর অবরোধ করেন। উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণের অভাবে তিনি তাঞ্জোর অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন না। অতঃপর লালি মান্দ্রাজ অবরোধ করিলেন; দুই মাস অবরোধের পর ইংরাজ

নৌ-বাহিনীর আগমনে মাদ্রাজ অবরোধ পরিত্যাগ করিতে হয়। উপর্য্যুপরি ব্যর্থতার ফলে ফরাসীদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। উপায়ান্তর না দেখিয়া লালি নিজামের দরবারে অবস্থিত বুসীকে সসৈন্যে চলিয়া আসিতে নির্দ্দেশ দিলেন। বুসী হায়দ্রাবাদে অবস্থান করায় ইংরাজদের অসুবিধা হইতেছিল। অনুপযুক্ত সেনানায়কের হস্তে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর ভার অর্পণ করিয়া বুসীর চলিয়া আসা অত্যন্ত অদূরদর্শিতার কার্য্য হইল। ক্লাইভ কর্তৃক বাংলা দেশ হইতে প্রেরিত সৈন্যদল কর্ণেল ফোর্ডের নেতৃত্বে ফরাসী অধিকৃত উত্তর সরকার প্রদেশ, রাজমহেন্দ্রী ও মসলীপত্তম অধিকার করিল এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম সালাবৎজঙ্গের সঙ্গে সুবিধাজনক সর্ত্তে সন্ধি স্থাপন করিল। এই ঘটনায় দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গেল। ক্রমাগত পরাজয়ে ফরাসী সৈন্যদল নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িল, তদুপরি অর্থাভাবের জন্য ফরাসী সৈন্যদলে বিদ্রোহ দেখা দিলে কর্ণাটে লালির আর কোন নূতন অভিযান সফল হইল না। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংরাজ সেনাপতি কূট মাদ্রাজে উপস্থিত হইলে ইংরেজগণ নূতন উদ্যমে আক্রমণ আরম্ভ করিল। কয়েকটি ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর বন্দিবাস-এ (Wandiwash) কূটের সঙ্গে লালির যুদ্ধ হইল (১৭৬০)। এই যুদ্ধে ফরাসীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং এই যুদ্ধের ফলাফলে ফরাসীদের অদৃষ্ট চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হইল।

বন্দিবাসের, যুদ্ধ ১৭৬০

অতঃপর কূট পণ্ডিচেরী অবরোধ করিলেন। ইংরেজের বিপক্ষে মহীশূরের সুলতান হায়দর আলির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াও লালি পণ্ডিচেরী রক্ষা করিতে পারিলেন না। পর্য্যাপ্ত অর্থের অভাব ও সেনাদলের মধ্যে গোলযোগের জন্য পণ্ডিচেরী আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইল এবং ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী আত্মসমর্পণ করিল। ইংরেজগণ পণ্ডিচেরী অধিকার করিয়া দুর্গপ্রাকারাদি ধ্বংস করিয়া ফেলিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তবর্ষব্যাপী

পণ্ডিচেরীর অবরোধ ও আত্মসমর্পণ

যুদ্ধের অবসান হয়। প্যারিসের সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে উভয় পক্ষে শান্তি সংস্থাপিত হয়। ভারতবর্ষে ফরাসীদের অধিকৃত স্থানগুলি তাহাদের হস্তে প্রত্যর্পণ করা হইল; কিন্তু তাহারা ইংরেজদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি ও সুযোগ হারাইল। ফরাসী জাতির জন্য ডুপ্লে প্রাচ্য দেশে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা স্বপ্নে বিলীন হইয়া গেল।

ভারতে ফরাসী-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বিনষ্ট

ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ

(১) দীর্ঘস্থায়ী ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসীদের পরাজয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। ফরাসী নায়ক ডুপ্লে অথবা লালি যে ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাইভ এবং কূট অপেক্ষা বুদ্ধিতে বা কর্ম্ম-ক্ষমতায় নিকৃষ্ট ছিলেন তাহা নহে। তাহাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য। ফরাসী কোম্পানী গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকায় স্বাধীনভাবে কোন কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারে নাই। উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষের হস্তপক্ষের ফলে তাহাদের কর্ম্মনীতি বারংবার ব্যাহত হইয়াছে। ফ্রান্সের রাজা ও মন্ত্রিগণ ইউরোপে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্যই ব্যগ্র ছিল; সুদূর ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা, তাহাদের আগ্রহ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই। তজ্জন্য তাহারা ভারতবর্ষের যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা রণসম্ভার প্রেরণ করেন নাই। অর্থাভাবে লালির সামরিক প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। অপর পক্ষে ইংরেজ কোম্পানী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হওয়াতে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন এবং স্বদেশ হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, নৌবলে ফরাসীরা ইংরেজ অপেক্ষা হীনতর থাকায় বহু ক্ষেত্রে ফরাসীদের অসুবিধা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, পলাশী যুদ্ধের পর ইংরাজগণ বঙ্গদেশ হইতে পর্য্যাপ্ত সামরিক ও আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের নিরাপদ ঘাঁটি হইতে ইংরেজগণ মান্দ্রাজে অর্থ ও

সৈন্যাদি প্রেরণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া উত্তর সরকার সহজেই ফরাসীদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। বন্দিবাসের জয় একরূপ পলাশীরই পরিণাম এবং বাংলাদেশ হইতেই সমগ্র ভারতে ইংরাজদের প্রভুত্ব বিস্তার হইয়াছিল ("The battle of Plassey may be truly said to have decided the fate of the French in India")। পরিশেষে, লালির চরিত্র ও আচরণ কিয়ৎ পরিমাণে ফরাসীদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী। সমর কুশলতা ও সাহস থাকিলেও লালির চরিত্রে নেতৃত্ব-সুলভ বিচক্ষণতা ও রাজনীতিকের উপযুক্ত বিজ্ঞতার অভাব ছিল।

বঙ্গদেশে বৃটিশ আধিপত্য

মীরজাফর (১৭৫৭-'৬০) :—পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর তিন বৎসর বঙ্গদেশের নবাব হইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার কোন স্বাতন্ত্র্য বা ক্ষমতা রহিল না। বাহ্যতঃ ইংরাজদের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। নবাব কলিকাতার উপর ইংরেজদের অধিকার স্বীকার করিলেন, এবং ইংরেজগণ নবাবের দরবারে একজন রেসিডেণ্ট রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। কিন্তু মীরজাফরের সামরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রাজ্য রক্ষার জন্য তাহাকে ক্লাইভের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইত। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের পুত্র আলিগহর যখন (পরে দ্বিতীয় শাহ আলম নামে দিল্লীর সম্রাট) বিহার আক্রমণ করেন, তখন ক্লাইভকেই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইয়াছিল।

মীরজাফর নিতান্ত অপদার্থ হইলেও তিনি তাহার পরমুখাপেক্ষী হীনাবস্থার প্রতি একেবারে অচেতন ছিলেন না। সর্ব্ববিষয়ে ইংরেজদের কর্তৃত্বে বিরক্ত হইয়া মীরজাফর ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করার জন্য ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিলেন। ওলন্দাজগণও মীরজাফরের পরামর্শে সম্মত হইয়া তাহাদের অধিকৃত জাভা হইতে সামরিক সাহায্য

আনয়নের জন্য উদ্যোগী হইল। ক্লাইভ এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পূর্ব্বাহ্নে অবগত হইয়া ভাগীরথীর মুখে ডাচদের রণতরী সমূহ আটক করিলেন এবং বিদেরার যুদ্ধে (১৭৫৯ খৃঃ-এ) ডাচদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিলেন। এইরূপে বঙ্গদেশে ইংরাজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্লাইভ ১৭৬০ খৃঃএ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন।

ইংরেজ ও ওলন্দাজ সংঘর্ষ, ১৭৫৯

ক্লাইভের পরে ভ্যানসিটার্ট কলিকাতার গভর্ণর নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণকে পুনঃ পুনঃ প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া নবাবের রাজকোষ একেবারে অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তথাপি ইংরেজদের অর্থের দাবি মিটিল না। সেকালে বাংলার অর্থে বোম্বাই ও মান্দ্রাজে কোম্পানীর ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইত। কিন্তু মীরজাফরকে দোহন করিয়া যখন আর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা গেল না তখন ভ্যানসিটার্ট এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। ভ্যানসিটার্ট মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমের নিকট বাংলার নবাবী বিক্রয় করিলেন এবং উহার বিনিময়ে কোম্পানী বৰ্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত গভর্ণর ও তাহার পরিষদবর্গকে এককালীন দুই লক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হইল। যাহারা মীরজাফরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাহায্য করিয়াছিলেন তাহারাই তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে দ্বিধা করিলেন না।

মীরকাশিম, (১৭৬০-'৬৪) ঃ—মীরকাশিম তাহার অপদার্থ শ্বশুর মীরজাফর অপেক্ষা অনেক অংশ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও প্রজাহিতৈষী শাসনকৰ্ত্তা ছিলেন এবং সুযোগ পাইলে তিনি সুশাসক হিসাবে খ্যাতি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি ইংরাজদের কথামত চলিতে প্রস্তুত ছিলেন না সুতরাং তাহার সহিত ইংরাজদের অনিবার্য্য সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। মুর্শিদাবাদে ইংরাজের প্রভাব প্রবল দেখিয়া তিনি কলিকাতা হইতে বহুদূরে অবস্থিত মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। তিনি সেখানে সৈন্য ও শাসন বিভাগের নানাবিধ সংস্কার সাধন করিয়া আগামী সজ্ঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

বাণিজ্য-শুল্ক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ইংরাজের সহিত মীরকাশিমের বিরোধ উপস্থিত হইল। কোম্পানী নবাবের রাজ্যমধ্যে নিঃশুল্ক বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণকে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। পলাশী যুদ্ধের পর বাঙ্গলায় তাহাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হওয়ায় কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য নবাব সরকারের নির্দ্দিষ্ট শুল্কতো দিতেনই না, উপরন্তু কোম্পানীর ছাড়পত্র দিয়া নিজেদের বন্ধু ও অনেক অনুগৃহীত ভারতীয় বণিককে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার সুবিধা করিয়া দিতেন। ইহাতে একদিকে যেমন নবাবের অর্থক্ষতি হইত অন্যদিকে দেশীয় বণিকদের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। কারণ কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ ও তাহাদের আশ্রিত ব্যবসায়িগণ শুল্ক দিতেন না বলিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিতেন। মীরকাশিম প্রথমে কোম্পানীর সহযোগিতায় এই অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহারা কোন মতেই বাণিজ্য-শুল্ক দিতে সম্মত হইল না। অবশেষে মীরকাশিম বাধ্য হইয়া তাহার রাজ্য হইতে বাণিজ্য-শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে নবাবের আয় কমিল বটে কিন্তু দেশীয় বণিকগণ কোম্পানীর কর্ম্মচারীবর্গ ও তাহাদের অনুগৃহীত ব্যক্তিগণের অবৈধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে মুক্তি পাইল এবং ইহার ফলে দেশীয় এবং ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীবৃন্দ সকলেই বাণিজ্য সম্বন্ধে সমান সুবিধা পাইতে লাগিল। কিন্তু মীরকাশিম বাণিজ্য-শুল্ক রহিত করিয়া ইংরাজদের বিরাগভাজন হইলেন। পাটনায় কোম্পানীর কুঠির অধ্যক্ষ এলিস্ সাহেব ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া পাটনা সহর অধিকার করিলেন। এলিসের এই উদ্ধত আচরণে মীরকাশিম ইংরাজদের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর দেখিলেন না। মীরকাশিম পাটনা পুনরধিকার করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

বাণিজ্য শুল্ক লইয়া ইংরাজদের সঙ্গে বিবাদ

মীরকাশিম-ইংরাজ সজ্বর্ষ

দুর্ভাগ্যবশতঃ মীরকাশিম ক্রমান্বয়ে কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, সুতি, উদয়নালা এবং মুঙ্গেরে ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। বারংবার ইংরাজদের নিকট পরাজিত হওয়ায় মীরকাশিমের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি পাটনায় আগমন করিয়া সমস্ত ইংরেজ বন্দীকে হত্যার আদেশ দিলেন এবং অযোধ্যায় পলায়ন করিয়া নবাব সুজাদ্দৌলার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। দিল্লীর বাদসাহ দ্বিতীর শাহ আলম তখন সুজাদ্দৌলার আশ্রিত ছিলেন। অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর সম্রাট সম্মিলিত ভাবে মীরকাশিমের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সম্মিলিত বাহিনী বক্সারের যুদ্ধে (২২ অক্টোবর, ১৭৬৪) ইংরেজ সেনাপতি মেজর হেক্টর মন্‌রো-র নিকট পরাজিত হইল। সম্রাট অবিলম্বে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। মীরকাশিম পলায়ন করিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে পলাতক জীবন যাপনের পর প্রায় ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর উপকণ্ঠস্থিত কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করিলেন।

বক্সারের যুদ্ধের সমালোচনা ঃ—বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলের তাৎপর্য্য পলাশী যুদ্ধ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। পলাশী যুদ্ধের বিজয় লাভের পশ্চাতে ইংরেজের উন্নততর সমরকৌশল অপেক্ষা নবাবের কর্ম্মচারি-বর্গের ষড়যন্ত্রই অধিক কার্য্যকরী হইয়াছিল। যদি ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য শুধু পলাশী যুদ্ধের উপর নির্ভর করিত তাহা হইলে ইহাকে ন্যায় যুদ্ধে প্রাপ্ত অপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতা লব্ধ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারিত। কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইংরেজগণ রীতিমত যুদ্ধ করিয়া মীরকাসিমকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে সিরাজদ্দৌলার সময়ের মত কোন অপ্রত্যাশিত ষড়যন্ত্র বা বিশ্বাসঘাতকতা ইংরাজ পক্ষকে সহায়তা করে নাই। মীরকাশিম আসন্ন সজ্ঘর্ষ সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নেই সচেতন ছিলেন এবং সজ্ঘর্ষের পরিণাম বিবেচনা করিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। মীরকাশিম বুঝিয়াছিলেন যে, তাহাকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেই হইবে। এই জন্যই তিনি মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ, সমরোপকরণ প্রস্তুতি বা

সৈন্যবাহিনীকে সুশিক্ষিত করার কাজে হাত দিয়াছিলেন। এই সব সত্ত্বেও মীরকাসিম যখন পর পর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে হয় মীরকাসিমের সৈন্যব্যবস্থায় না হয় বঙ্গদেশের শাসনযন্ত্রে কোন মৌলিক ত্রুটি ছিল। কূটনীতি ক্ষেত্রে মীরকাসিম যে পশ্চাৎপদ ছিলেন না তাহা তাহার অযোধ্যার নবাব ও বাদসাহের সাহায্য প্রাপ্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। সমস্ত ব্যবস্থা মীরকাশিমের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও তাহার পরাজয় ইংরেজের সামরিক বলেরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচনা করে। কোন আকস্মিকতার বলে ইংরেজরা বাংলাদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হয় নাই।

বঙ্গদেশের উপর ইংরাজের প্রকৃত আধিপত্য

ক্লাইভের পুনরাগমন—বঙ্গদেশের দেওয়ানী লাভঃ—মীরকাশিমের সহিত সঙ্ঘর্ষের সূত্রপাতেই কলিকাতার কাউন্সিল অপদার্থ মীরজাফরকেই পুনরায় বাংলায় নবাবী প্রদান করেন। ইহার বিনিময়ে ইংরেজগণের যুদ্ধে যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল এবং ইংরেজরা বাণিজ্যসম্পর্কে যে সকল সুবিধা দাবি করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তাহাকে স্বীকার করিতে হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নজম্‌উদ্দৌলা ইংরেজের অনুমোদনক্রমে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করেন। বাংলার গভর্ণর ও তাহার সহযোগিগণ তাহার নিকট হইতে ১,৩৬,৩৫৭ পাউণ্ড আদায় করিলেন। ইংরেজদের সহিত তাহার সন্ধি অনুসারে নবাব আত্মরক্ষার জন্য কোম্পানীর সৈন্যদলের উপর নির্ভর করিতে স্বীকৃত হন। শাসনকার্য্যের ভার 'নায়েব সুবা' উপাধিধারী এক কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত হয়। ইংরেজের অনুমোদনক্রমে মহম্মদ রেজা খাঁ এই পদে নিযুক্ত হন এবং নবাব প্রতিশ্রুতি দেন যে ইংরেজের বিনা অনুমতিতে তিনি তাহাকে পদচ্যুত করিবেন না। এই বন্দোবস্তের ফলে সামরিক এবং শাসন সম্বন্ধীয় সমুদয় ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে কোম্পানীর হস্তগত হইল। এতদ্ব্যতীত নবাবকে ইংরেজের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সুবিধাগুলিও বহাল রাখিতে হইল। কোম্পানীর

কর্ম্মচারীবৃন্দ অবাধে উৎকোচ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছিল কিন্তু নবাবের প্রতিকার করিবার ক্ষমতা ছিল না। এইভাবে বঙ্গদেশে যখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, তখন ডিরেক্টারগণ লর্ড ক্লাইভকে পুনরায় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন।

এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ক্লাইভ স্বভাবসিদ্ধ তৎপরতা ও উদ্যমের সহিত কোম্পানীর কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ অযোধ্যায় নবাব সুজাদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধির সর্ত্ত স্থির করিলেন। সুজাদ্দৌলা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং এলাহাবাদ ও কোরা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সহিত সন্ধি করিলেন।

অযোধ্যার নবাবের ও সম্রাটের সহিত সন্ধি

সম্রাটের কোন ক্ষমতা না থাকিলেও সম্মান ছিল। সকলেই মনে করিত আকবর ও ঔরঙ্গজীবের বংশধরই সমগ্র ভারতের ন্যায়সঙ্গত অধীশ্বর, তাহার অনুমোদন ব্যতীত কাহারও ভারতের কোন অংশে শাসনদণ্ড পরিচালনার অধিকার নাই। এই ধারণা অনুসারে বাঙ্গালায় কোম্পানীর অধিকার কোন আইনসঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, কারণ সম্রাট কোম্পানীকে কোন ক্ষমতা প্রদান করেন নাই। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট শাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করিলেন। নিজামৎ বা শাসন বিভাগের ভার পূর্ব্ববৎ বাঙ্গালার নবাবের উপর ন্যস্ত রহিল। এই অনুগ্রহের ফলে কোম্পানী অযোধ্যায় নবাবের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোরা ও এলাহাবাদ সম্রাটকে প্রস্থান করিল এবং বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ, ১৭৬৫

বাংলাদেশে দ্বৈত-শাসন (Double Government) :—এই ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশে দ্বৈত শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। বাদশাহের সনদ

ব্যবস্থায় কোম্পানী দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহ ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দ এই কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁ-কে বাংলায় এবং সিতাব রায়-কে বিহারের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করিলেন। নবাবের শাসন ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল, তিনি কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইলেন। তাহার প্রতিনিধিরূপে নিজামের কার্য্যভারও রেজা খাঁ ও সিতাব রায় পরিচালনা করিতে লাগিলেন। নবাব ইহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে অক্ষম, কোম্পানী ইহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক সুতরাং ইহারা দায়িত্ব-হীনভাবে দেশের লোকের সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে লাগিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদেশের মন্বন্তর (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে খ্যাত) ইহাদের কুশাসনের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল।

ক্লাইভের অন্যান্য সংস্কার ঃ—ক্লাইভ কেবলমাত্র বঙ্গদেশে ইংরেজের আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি কোম্পানীর বহুবিধ সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন এবং উৎকোচ গ্রহণের রীতি রহিত করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর সৈন্যগণ পলাশী যুদ্ধের পর হইতে যুদ্ধকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট অতিরিক্ত ভাতা শান্তির সময়েও ভোগ করিয়া আসিতেছিল। ক্লাইভ নির্দ্দেশ দিলেন যে যুদ্ধের সময় ব্যতীত আর অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হইবে না।

ক্লাইভের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ—ক্লাইভকে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত সংস্থাপয়িতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ক্লাইভ সৈন্য চালনায় দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাহাকে অসামান্য প্রতিভাশালী সমর-নায়করূপে গণ্য করা যাইতে পারে না। ক্লাইভের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি সঙ্কট-কালে অসামান্য সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন।

গুণাবলী

তাহার উদ্যম, সাহস ও বাহুবলেই কর্ণাটে ও বঙ্গদেশে বৃটিশের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। আর্কট অধিকার, পলাশীর যুদ্ধ, উত্তর সরকার অধিকার, সম্রাটের নিকট হইতে দেওয়ানী লাভ প্রভৃতি ক্লাইভের অক্ষয় কীর্তি।

ক্রটি সমূহ

ক্লাইভ অত্যন্ত ধনলোভী ছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি অবৈধ উপায়ে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এই অর্থগৃধ্নুতার জন্য স্বদেশেও নিন্দিত হইয়াছিলেন। কোম্পানীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি ওয়াটসনের সহি জাল করিয়া উমিচাঁদকে প্রতারণা করিয়াছিলেন। তিনি যে যুগে এদেশে আসিয়াছিলেন তখন জনসাধারণের নৈতিক মানদণ্ড তত উন্নত ছিল না, তথাপি তাহার উৎকোচ গ্রহণ বা জালিয়াতি কার্য্য সমর্থন করা চলে না। তাহার প্রবর্ত্তিত দ্বৈত-শাসন নীতি বাঙ্গালাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল এবং ইহা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ হইয়াছিল। তবে ইহাও স্মরণযোগ্য যে সেকালের ইংরেজরা দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল এবং কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ শাসনকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তদুপরি প্রজার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নূতন শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা সহজ সাধ্য ছিল না।

বিভিন্ন দোষ ক্রটি সত্ত্বেও তিনি যে একজন অসামান্য কৃতী ব্যক্তি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ক্লাইভের দুর্ব্বলতা ও দোষ ক্রটির কথা এখন প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি যে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাই সকলে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। এই প্রসঙ্গে লর্ড মেকলের উক্তি স্মরণীয়—"Our island has scarcely ever produced a man more truly great, either in arms or in council."

তৃতীয়·অধ্যায়

ব্রটিশ শক্তির ক্রমাগ্রগতি ১৭৬৫-'৯৮

ক্লাইভ, ১৭৬৭।
ভেরেলেষ্ট, ১৭৬৭-১৭৬৯।
কার্টিয়ার, ১৭৬৯-১৭৭২।
ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ১৭৭২-১৭৮৫।
লর্ড কর্ণওয়ালিস, ১৭৮৬-১৭৯৩।
স্যার জন শোর, ১৭৯৩-১৭৯৮।

(১) ইংরেজ ও মারাঠা Last quarter of the 18th century.

(ক) **প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধঃ**—ক্লাইভের প্রস্থানের পরে ভেরেলেষ্ট (১৭৬৭-'৬৯) ও কার্টিয়ার (১৭৬৯—১৭৭২) বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা হন। অতঃপর ওয়ারেণ হেষ্টিংস (১৭৭২-'৮৫) বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন। হেষ্টিংস-এর সময়ে মারাঠাগণই ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত শক্তি ছিল। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তি কঠোর আঘাত প্রাপ্ত হইলেও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। তৃতীয় পেশোয়া বালাজী বাজিরাও-এর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মাধবরাও-এর নেতৃত্বে শীঘ্রই মারাঠারা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং মহীশূর হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নূতন পেশোয়া বয়সে নবীন হইলেও তাহার কর্ম্মোত্তম ও উচ্চাশা যথেষ্ট ছিল। তাহার পিতৃব্য রঘুনাথ বা রাঘোবা প্রতি পদে তাহার প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মাধবরাও খুল্লতাতের সকল চক্রান্ত পণ্ড করিয়া বিরোধী দলের উপর স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন। তিনি মহীশূরের অধিপতি হায়দার আলিকে দুইবার যুদ্ধে পরাজিত করিলেন এবং নাগপুরের উদ্ধত

রাজার দর্পচূর্ণ করিয়া উত্তর ভারতে মারাঠা প্রভুত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য একদল পরাক্রান্ত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। পেশোয়ার সেনাপতিগণ রাজপুত ও জাঠদের নিকট চৌথ আদায় করিল এবং দিল্লী মারাঠাদের হস্তগত হইল। মারাঠারা রোহিলাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন এবং রোহিলা রাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু রোহিলা রাজ্য আক্রমণের পূর্ব্বেই মাধবরাও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

মাধব রাওয়ের পরে তাহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হইলেন। নারায়ণ রাও পিতৃব্যের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। রঘুনাথ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; তাহার ষড়যন্ত্রে নারায়ণ রাও নিহত হইলেন (১৭৭৩ খৃঃ) এবং রঘুনাথ পেশোয়া হইলেন। নানা ফাড়নবীশ নামে একজন প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে রঘুনাথের বিরোধী দলের সৃষ্টি হইল। ভূতপূর্ব্ব পেশোয়া নারায়ণ রাওয়ের বিধবা স্ত্রী গঙ্গাবাঈ স্বামীর মৃত্যু সময়ে অন্তঃসত্বা ছিলেন এবং অত্যল্পকাল পরে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। নবজাত বালক মাধব রাওকে বিপক্ষদল পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাহার নাবালক কাল পর্য্যন্ত অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা হইল। রঘুনাথ গদিচ্যুত হইলেন।

রঘুনাথের চক্রান্তে নারায়ণ রাও নিহত

রাজ্য হইতে বিতাড়িত রঘুনাথ অবশেষে বোম্বাই-এ ইংরাজদের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরাজদের সহিত মারাঠাদের কোন শত্রুতা ছিল না সুতরাং বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে রঘুনাথকে আশ্রয় প্রদান করিয়া মারাঠাদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টির কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু কর্ণাট অঞ্চলের মতই দেশীয় রাজাদের আভ্যন্তরীণ বিবাদে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করার সুযোগ ইংরেজগণ খুঁজিতেছিল। সুতরাং বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট রাজ্যলোভে রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে সুরাটের সন্ধি

সুরাটের সন্ধি, ১৭৭৫

হইল, ইংরেজগণ ২৫০০ সৈন্য প্রেরণ করিয়া রঘুনাথকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। এই সৈন্যদলের ব্যয় রঘুনাথকে বহন করিতে হইবে। বিনিময়ে রঘুনাথ ইংরেজদিগকে সালসেট, বেসিন এবং বরোচ ও সুরাটস্থ কতিপয় জেলার আংশিক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইলেন। অধিকন্তু রঘুনাথ ইংরেজের শত্রুপক্ষের সহিত কোন মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিল। অতঃপর বোম্বাই সরকার প্রেরিত একদল সৈন্য কর্ণেল কিটিং-এর নেতৃত্বে পুনা সরকারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া গুজরাটে প্রবেশ করিল এবং এক যুদ্ধে পুনার সৈন্যদলকে পরাস্ত করিল।

ইতিমধ্যে কলিকাতার কর্তৃপক্ষ বোম্বাই সরকারের সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করিল না। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই সন্ধির পক্ষপাতী হইলেও তাহাকে কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে কাজ করিতে হইল। তিনি বোম্বাই সরকারের অঙ্গীকৃত সন্ধি উপেক্ষা করিয়া কর্ণেল আপটনকে নূতন সন্ধি করার জন্য পুনায় প্রেরণ করিলেন। আপটন পুনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সুরাটের সন্ধি বাতিল করিয়া পুরন্দরের সন্ধি করিলেন (১৭৭৬)। এই নূতন সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরেজগণ সালসেট ও বরোচের রাজস্ব প্রাপ্ত হইলেন; যুদ্ধের ব্যয় হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা ইংরাজদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল। ইংরেজরা রঘুনাথের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল; রঘুনাথ পুনা কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত মাসিক পঁচিশ হাজার টাকা বৃত্তি লইয়া গুজরাটের অন্তর্গত কোপার গাঁও-এ বাস করিবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

পুরন্দরের সন্ধি, ১৭৭৬

কিন্তু বোম্বাই-এর ইংরেজগণ পুরন্দরের সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া রঘুনাথকে আশ্রয় প্রদান করিল। এই সময়ে কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ বোম্বাই সরকারের কার্য্য সমর্থন করিল এবং সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করিয়া পুরন্দরের সন্ধি বাতিল করিয়া দিল। তখন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্মিলিতভাবে মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

যুদ্ধের প্রথমভাগে তেলেগাঁও-র যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য মারাঠাদের নিকট পরাস্ত হইল এবং অত্যন্ত অপমানজনক সর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ওয়াড় গাঁও-র সন্ধি দ্বারা স্থির হইল যে ইংরেজরা বিজিত স্থান সমূহ প্রত্যর্পণ করিবে এবং আশ্রিত রঘুনাথকে মারাঠাদের হস্তে সমর্পণ করিবে। হেষ্টিংস এই সকল সর্ত্ত মানিতে অস্বীকৃত হইলেন; ইংরেজরা ওয়াড় গাঁও-এর সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাপতি গডার্ডের অধীনে একদল সৈন্য বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত হইল, গডার্ড আহম্মদাবাদ ও বেসিন অধিকার করিলেন বটে কিন্তু পুনার পথে মারাঠাদের হস্তে পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে' বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে হেষ্টিংস প্রেরিত সেনাপতি পপ্‌হাম সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিলেন (১৭৮০)। ইহার পর মারাঠা রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে প্রতিষ্ঠাকামী গোয়ালিয়রের মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের জন্য মধ্যস্থতা করিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। সিন্ধিয়ার চেষ্টায় ইংরেজ ও মারাঠার মধ্যে সলবাই-এর সন্ধি হয়। সলবাই-এর সন্ধি অনুযায়ী ইংরেজরা মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিলেন; ইংরেজরা সালসেটি প্রাপ্ত হইল, সিন্ধিয়া যমুনা নদীর পশ্চিম তীরের সমগ্র ভূখণ্ড ফিরিয়া পাইলেন, রঘুনাথকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হইল।

সলবাই-এর সন্ধি, ১৭৮২

সলবাই-এর সন্ধির ফলাফল

সলবাই-এর সন্ধির ফলে ইংরেজদের আপাততঃ কোন লাভ হয় নাই। বরঞ্চ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য ইংরেজদের যথেষ্ট অর্থব্যয় হইল। এই অর্থ-ক্লেশ দূর করিবার জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে বহু অবৈধ ও আপত্তিজনক উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই সন্ধি পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। সলবাই-এর সন্ধির ফলে মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজদের আগামী কুড়ি বৎসরের জন্য শান্তি

সংস্থাপিত হইল এবং এই কুড়িবৎসর কাল ইংরেজরা টিপু, ফরাসী, নিজাম, অযোধ্যার নবাব প্রভৃতি শত্রুগণের সহিত চূড়ান্তভাবে বোঝাপড়া করার যথেষ্ট অবকাশ প্রাপ্ত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মারাঠারাই ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত শক্তি ছিল। সলবাই-এর সন্ধির ফলে ইহাদের সঙ্গে সাময়িক শান্তি সংস্থাপিত হওয়ায় ইংরেজগণ শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পাইল।

(খ) **সলবাই-এর সন্ধির পরবর্ত্তী যুগে মারাঠা শক্তি**:— সলবাই-এর সন্ধিতে প্রথম মারাঠা যুদ্ধের অবসান হইলে পর মারাঠাগণ পুনরায় রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করে। মারাঠা শক্তি-সঙ্ঘের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাবের একান্ত অভাব ছিল এবং পেশোয়া বিশাল মারাঠা সাম্রাজ্যের নায়করূপে স্বীকৃত হইলেও মারাঠা সামন্তগণ ক্রমশঃ স্বতন্ত্র ও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বেরারের ভোঁসলা এবং বরোদার গাইকোয়াড় পুনা দরবারের নির্দ্দেশ অনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন না। এই সময়ে মারাঠাদের মধ্যে নানা ফাড়নবীশ, অহল্যাবাঈ ও মহাদজী সিন্ধিয়ার মত কয়েকজন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়কের উপস্থিতিতে মারাঠাশক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

ইন্দোর

ইন্দোর রাজ্য মলহর রাও হোলকারের বিধবা পুত্রবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাঈ-এর শাসনাধীনে ছিল। তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ২৮ বৎসর কাল (১৭৬৭-১৭৯৫) ইন্দোর রাজ্য শাসন করেন। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রজার মঙ্গল সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার আদর্শ শাসন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ম্যাল্‌কল্‌ম পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

অহল্যাবাঈ

অহল্যাবাঈ-র মৃত্যুর পর তুকোজী হোলকার ইন্দোরের অধিপতি হন। তুকোজীর মৃত্যুর পর (১৭৯৭) ইন্দোর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

মারাঠা সামন্তগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ছিলেন মহাদজী সিন্ধিয়া। মহাদ্‌জী নানা ফাড়নবীশের ন্যায় তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে যোগদান করিয়া অতিকষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। পেশোয়া প্রথম মাধব রাও এর সময়ে তিনি উত্তর ভারতে মারাঠা বাহিনীর অন্যতম নায়ক ছিলেন। প্রথম মারাঠা যুদ্ধে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; পরে তাহার মধ্যস্থতায় সলবাই-এর সন্ধি অনুষ্ঠিত হয়। এই সন্ধিতে ইংরেজরা তাহাকে স্বাধীন নরপতির মর্য্যাদা প্রদান করে। কিন্তু মহাদ্‌জী সুকৌশলী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং তিনি পুনা গভর্ণমেণ্টের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলিলেন এবং নবপ্রতিষ্ঠিত মর্য্যাদার সুযোগ গ্রহণ করিয়া উত্তর ভারতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হইলেন। মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া মারাঠাদের পুরাতন যুদ্ধ পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে আগত বহু ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের সাহায্যে শক্তিশালী সেনাবিভাগ গঠন করিলেন। সৈন্যদলকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষাদানের নিমিত্ত বয়েন নামক একজন ইটালীয় সেনা-নায়ককে নিযুক্ত করিলেন। পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি বহুবার রাজপুত, মুসলমান ও মারাঠা প্রতিদ্বন্দ্বী-কে পরাজিত করিয়াছিলেন। মহাদ্‌জী উচ্চাশা পরিতৃপ্তির জন্য দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে হস্ত ক্রীড়নক করিয়া তাহার নিকট হইতে পেশোয়ার জন্য ওয়াকিল-ই-মুত্‌লুক্ পদবী আদায় করিলেন এবং স্বয়ং পেশোয়ার নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। উপরন্তু তিনি স্বয়ং সম্রাটের বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মহাদ্‌জী শাহ আলমকে হস্তগত করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহাদ্‌জী রাজপুত ও জাঠদিগকে পদানত করিয়া উত্তর ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ নানা ফাড়নবীশ পুনায় পেশোয়ার উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। মহাদ্‌জী তাহার প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য এক

মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া

বিরাট বাহিনী লইয়া দক্ষিণে অগ্রসর হইলেন ; প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন নবীন পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাওকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তিনি পুনায় যাইতেছেন। মহাদ্‌জীর অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী তুকোজী হোলকার সিন্ধিয়ার আধিপত্য খর্ব্ব করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন কিন্তু তিনি বয়েনের নেতৃত্বে পরিচালিত সিন্ধিয়ার সুশিক্ষিত সেনাদলের হস্তে লাখেরীর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। কিন্তু মহাদজীর উদ্দেশ্য সফল হইবার পূর্ব্বেই জ্বরাক্রান্ত হইয়া তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৯৪)। তাহার মৃত্যুর পর ত্রয়োদশ বর্ষীয় দত্তক পুত্র দৌলত রাও সিন্ধিয়া তাহার বিশাল রাজ্যের অধিপতি হন।

মাহাদজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব

মহাদজীর মৃত্যুতে মারাঠা সাম্রাজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাহার মত কৌশলী রাজনীতিজ্ঞ ও সুদক্ষ সেনানায়ক মারাঠা সমাজে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে ইংরেজগণ একরূপ বিনা প্রতিবন্ধকতায় রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল। মহাদজী যে ভাবে উত্তর ভারতে ক্ষমতা বিস্তার করিয়া আসিতেছিলেন যদি তাহার অকস্মাৎ মৃত্যু না ঘটিত তাহা হইলে ইংরেজকে এক দুর্দ্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সজ্ঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইত।

মারাঠা শক্তির কেন্দ্রস্থল পুনায় দ্বিতীয় মাধবরাও (১৭৭৪-৯৬) পেশোয়া থাকিলেও নানা ফাড়নবীশই তথায় সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। নানা ফাড়নবীশের ইচ্ছা ছিল নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণস্থ হস্তচ্যুত মারাঠা অঞ্চল সমূহ পুনরুদ্ধার করা ; ইহাতে মহীশূরের টিপু সুলতানের সঙ্গে তাহাব অনিবার্য্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। নানা নিজামের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া টিপুর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। টিপু যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিতে অক্ষম হইয়া নগদ ৪৫ লক্ষ মুদ্রা ও তিনটি জেলা মারাঠাদিগকে অর্পণ করিয়া শত্রুর সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু মারাঠাদের সহিত টিপুর সন্ধি অধিকদিন স্থায়ী হইল না। অচিরেই টিপুর

সঙ্গে ইংরাজের বিরোধ আরম্ভ হইলে (১৭৮৯-'৯২) মারাঠা ও নিজাম টিপুর বিরুদ্ধে ইংরাজের সঙ্গে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক সন্ধিতে আবদ্ধ হইল।

কিন্তু এই মিলন ক্ষণস্থায়ী হইল। টিপুর ভয়েই ইহারা মিলিত হইয়াছিল, কোনরূপ স্থায়ী ঐক্যসূত্র ইহাদিগকে বাঁধিতে পারে নাই। নিজামের সঙ্গে মারাঠাদের সম্প্রীতি কোন দিন ছিলনা, সুতরাং টিপুর ভয় কতকটা বিদূরিত হইতেই পেশোয়া, দৌলতরাও সিন্ধিয়া, তুকোজী হোলকার এবং বেরারের রাজা সম্মিলিত ভাবে নিজামের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। চৌথ ও সরদেশ-মুখীর দাবীকে ভিত্তি করিয়া নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিজামের সৈন্যদল রেমণ্ড নামক একজন ফরাসী দ্বারা সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি নিজাম ভীত হইয়া ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল 'স্যার জন শোর' ঔদাসীন্য নীতি (Policy of Non-intervention) অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করিয়া নিরপেক্ষ রহিল। আহম্মদনগর হইতে ৫৬ মাইল দূরে খর্দ্দা নামক স্থানে নিজাম সম্মিলিত মারাঠা বাহিনীর হস্তে চুড়ান্তভাবে পরাজিত হইল। নিজাম মারাঠাদের সহিত এক অপমানজনক সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। নিজামকে রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ এবং প্রচুর অর্থ মারাঠাদের হস্তে অর্পণ করিতে হইল। ইংরেজরা নিজামের পক্ষ অবলম্বন করিলে মারাঠাদের শক্তি এতটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না।

ইতিমধ্যে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তরুণ পেশোয়া মাধব-রাও নারায়ণের মৃত্যু হয়। সম্ভবতঃ তিনি নানা ফাড়নবীশের অভিভাবকত্বের কঠোর আধিপত্য সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় রঘুনাথ-এর পুত্র দ্বিতীয় বাজিরাও পেশোয়ার পদ অধিকার করেন। কিন্তু তিনি যেমন দুর্ব্বল তেমনি দুষ্ট প্রকৃতির ছিলেন। মারাঠা সাম্রাজ্য পতনের পথ তিনি পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

(২) ইঙ্গ-মহীশূর সম্বন্ধ

(ক) **প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** ঃ—অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের শাসনাধীন মহীশূর রাষ্ট্র ইংরেজদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির অন্যতম প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিয়াছিল। কর্ণাটে ও বাংলায় যখন শাসনের অব্যবস্থা চলিতেছিল তখন হায়দর দৃঢ় পাদক্ষেপে মহীশূরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতেছিলেন।

হায়দর সাধারণ সৈনিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অশিক্ষিত ও নিরক্ষর হইলেও হায়দরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মানব চরিত্র সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। হায়দর ভাগ্যান্বেষী অশ্বারোহী সৈনিকরূপে মহীশূরের দলবই বা প্রধান মন্ত্রী নন্দরাজের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং অচিরেই স্বীয় কর্ম্মক্ষমতার গুণে সেনানায়কের পদে উন্নীত হন। তখন মহীশূরের প্রধান মন্ত্রীই নামাবশিষ্ট হিন্দু রাজার নামে রাজ্য শাসন করিতেছিল। হায়দর আলি অত্যল্পকালের মধ্যেই প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন এবং আশ্রয়দাতা প্রধান মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিয়া এবং মহীশূরের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলিগার বা জনপদের রাজাদিগকে দমন করিয়া মহীশূরের রাজ্য সীমা বিস্তৃত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বেদেনোর, সুণ্ড, সের, কানাড়া এবং গুটি অধিকার করিয়া মহীশূরের অন্তর্ভুক্ত করেন।

হায়দরের বাল্য জীবনী

মহীশূরের সর্ব্বেসর্ব্বা

হায়দর আলির অভ্যুদয় নিজাম, মারাঠা বা ইংরেজ কেহই প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারিল না। হায়দর মারাঠাদের সহিত সমকক্ষতা করিয়া উঠিতে পারিল না। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মারাঠারা হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাকে গুটি ও সবনুর পরিত্যাগ করিতে ও প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য করিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট উত্তর সরকার ইংরেজদের হস্তে সমর্পণের বিনিময়ে হায়দরের বিরুদ্ধে নিজামকে সাহায্যের জন্য

হায়দরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-জোট

প্রতিশ্রুত হইল। সুতরাং মারাঠা, নিজাম এবং ইংরেজ এই তিন শক্তি সম্মিলিত ভাবে হায়দরকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইল। হায়দর অর্থ প্রদানের দ্বারা মারাঠাদের নিরপেক্ষতা ক্রয় করিলেন। নিজাম অচিরেই দলত্যাগ করিয়া হায়দরের পক্ষে যোগদান করিল। মান্দ্রাজের ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত ব্যাপারকে সুপরিচালিত করিতে পারিল না বলিয়া এই বিপর্য্যয় সম্ভব হইল।

হায়দরের বুদ্ধি কৌশলে ব্যর্থ

অব্যবস্থিতচিত্ত নিজাম অনতিবিলম্বে হায়দরের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইল (১৭৬৮ খৃঃ)। সুতরাং হায়দরকে একাকীই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। বিবাদ বাঁধাইতে পটু হইলেও আত্মরক্ষা করার মত ক্ষমতা মান্দ্রাজ কর্ত্তৃপক্ষের ছিল না। হায়দর মাঙ্গালোর পুনরধিকার করিল এবং বোম্বাইর সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া একেবারে মান্দ্রাজের পাঁচ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য হইয়া হায়দর কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সন্ধির সর্ত্তে সম্মত হইতে হইল। উভয় পক্ষের যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্তিদান ও পরস্পরের অধিকৃত স্থান সমূহ প্রত্যর্পণ করিবার চুক্তি হইল। কোন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে হায়দর আলি যে ইংরেজের সাহায্য পাইবেন তাহাও নির্দ্ধারিত হইল।

ইংরাজ হায়দরের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল, ১৭৬৮

হায়দরের নিকট এই শেষোক্ত সর্ত্তটির মূল্য অত্যধিক ছিল, কেননা তাহার রাজ্য সর্ব্বদা মারাঠা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা ছিল এবং মারাঠার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য তিনি পাইবেন বলিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে দেখা গেল অচিরেই মারাঠারা যখন তাহার রাজ্য আক্রমণ করিল তখন ইংরেজেরা নিরপেক্ষ রহিলেন। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা হায়দর তাহার জীবনে ভুলিতে পারে নাই।

মারাঠা আক্রমণের সময় ইংরেজের নিরপেক্ষতা

(খ) দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০-'৮৪)—প্রথম মারাঠা যুদ্ধ চলিবার সময়েই ইংরেজেরা মহীশূরের হায়দর আলির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্স ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী উপনিবেশ সমূহকে সাহায্য করায় ১৭৭৭ খৃঃ ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা ভারতস্থিত ফরাসী উপনিবেশ অধিকার করিল। মালাবার উপকূলে মাহে বন্দর ফরাসাদের অধিকারভুক্ত ছিল এবং মাহে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হায়দর আলি তাহার রাজ্যের অন্তর্গত মাহে অধিকার করায় অপমান বোধ করিলেন এবং ইংরেজদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। ইংরেজদের প্রতি হায়দরের বিরাগের অন্য কারণও ছিল। ইংরেজরা যে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পরোক্ষভাবে মারাঠাদিগকে মহীশূর আক্রমণে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলি, নিজাম এবং মারাঠাদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ তখনও চলিতেছিল, আর ইংরেজরা গুণ্টুর জেলা অধিকার করায় নিজাম ইংরেজদের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস দাক্ষিণাত্যের সমুদয় শক্তিকে ইংরেজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। প্রথমতঃ তিনি গুণ্টুর জেলা নিজামকে প্রত্যর্পণ করিয়া নিজামকে হস্তগত করিলেন। অতঃপর বেরারের রাজা ও মহাদজী সিন্ধিয়াকেও তিনি হায়দরের পক্ষাবলম্বন হইতে বিরত করিলেন। হেষ্টিংস বন্দিবাস-এর যুদ্ধজয়ী স্যার আয়ার কূটকে হায়দরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

একাকী যুদ্ধ করিতে হইল বলিয়া হায়দর ভীত হইলেন না। তিনি একদল সৈন্য লইয়া ঝটিকার ন্যায় ইংরেজ বাহিনীর উপর নিপতিত হইলেন এবং কর্ণেল বেইলীর সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিয়া আর্কট অধিকার করিলেন (১৭৮০)। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে স্যার আয়ার কূট পোর্টো নোভোর যুদ্ধে হায়দরকে পরাজিত করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হায়দরের পুত্র টিপু সুলতানের হস্তে কর্ণেল

ব্রেথওয়েট তাঞ্জোরের নিকট পরাজিত হইলেন। ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধ ফরাসী নৌ-সেনাপতি সাফ্রেন তাহার নৌ-বাহিনী লইয়া ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হওয়ায় হায়দারের সাহস আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; কিন্তু সেই বৎসরই হায়দর মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মারাঠাদের সহিত ইংরেজের বিরোধ সলবাই-এর সন্ধি দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়।

হায়দরের মৃত্যুতেও দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের নিবৃত্তি হইল না। পিতার মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

হায়দরের মৃত্যু

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে টিপুর হস্তে ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথুস সমগ্র সৈন্য সহ বন্দী হইলেন। সেই বৎসরই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ নিবৃত্তি ও সন্ধি হওয়ায় ভারতেও শান্তি সংস্থাপনের আয়োজন চলিতে লাগিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইল। বন্দী-বিনিময় ও পরস্পরের অধিকৃত রাজ্য প্রত্যর্পণের চুক্তিতে এই সন্ধি সম্পন্ন হইল।

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি

হায়দরের চরিত্র ঃ—হায়দর ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম প্রতিভাবান ব্যক্তি। স্বীয় পুরুষকার ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে তিনি সাধারণ অবস্থা হইতে রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে উন্নীত হইতে সক্ষম হন। তিনি লিখিতে পড়িতে জানিতেন না বটে কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্প, প্রশংসনীয় সাহসিকতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াতে তাহার এই ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছিল। হায়দর রণক্ষেত্রে যেমন ধীরতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন তদ্রূপ রাজ্যশাসন ব্যাপারে উদ্যমী ও সুকৌশলী ছিলেন। তিনি স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং তাহার সম্মুখেই নিয়মিতভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। ব্যক্তিগত ভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনার ফলে বিরোধ বিসংবাদে বিচ্ছিন্ন ও কু-শাসনপীড়িত ক্ষুদ্র মহীশূরকে তিনি ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই অসাধারণ পরিশ্রমী শাসকের সহিত সাধারণের দেখাসাক্ষাৎ করার জন্য অবারিত দ্বার ছিল। সমান মনোযোগের সহিত একসঙ্গে বহুবিধ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা হায়দরের ছিল।

হায়দর কখনও পরাজয়ে হতাশ মনোভাবের পরিচয় দিতেন না। নিজের প্রতিশ্রুতি তিনি কখনও ভঙ্গ করিতেন না, অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। বৃটিশের প্রতি তাহার মনোভাব ও আচরণে কোথাও কিছু অস্পষ্টতা ছিল না। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ হায়দর সম্বন্ধে যে 'ন্যায়-বিবেক-বর্জ্জিত, অ-ধর্ম্মনিষ্ঠ, অসচ্চরিত্র ও নির্ম্মম' এই মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ধর্ম্মের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর না হইলেও হায়দর আলি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং সমস্ত মুসলমান নরপতিদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা উদার ছিলেন। তিনি কঠোরতার সহিত রাজ্যশাসন করিলেও প্রজাগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন।

(গ) **তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** (১৭৯০-'৯২)—লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে নির্দ্দেশ ছিল যে কোম্পানী ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করিবে না এবং আত্মরক্ষা ব্যতীত দেশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে পারিবে না। লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বয়ং শান্তিপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষেও দেখা দেওয়া সম্ভব।

ইংরেজ ও টিপুর মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ

সেই ক্ষেত্রে মহীশূরের সুলতান টিপু ইংরেজের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাবাপন্ন থাকায় ফরাসীর সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে টিপুর শক্তি একেবারে খর্ব্ব হয় নাই। ইংরেজরা গোপনে তাহাকে শত্রু বলিয়া গণনা করিত। কর্ণওয়ালিস নিজামের নিকট এক পত্রে ইংরেজের মিত্রগণের যে তালিকা দিয়াছিলেন,

মহীশূরের নাম তাহাতে ছিল না। সুতরাং টিপু বুঝিয়াছিলেন যে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি সাময়িক যুদ্ধ বিরতি মাত্র, তাহাকে পুনরায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তজ্জন্য টিপু সাহায্যপ্রার্থী হইয়া ফ্রান্সে ও কনষ্টান্টিনোপলে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উভয় পক্ষের মধ্যে যখন অবিশ্বাস ও সন্দেহের পালা চলিতেছিল তখন টিপু স্থলতান ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন।

টিপুর ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণে যুদ্ধ আরম্ভ

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কোম্পানীর পুরাতন মিত্র এবং আশ্রিত। সুতরাং টিপু যখন তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন তখন কর্ণওয়ালিস তাহা ইংরেজের রাজ্য আক্রমণের সমতুল্য বলিয়া মনে করিলেন। নিজাম ও মারাঠারা টিপুর শক্তিবৃদ্ধি তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিলেন সুতরাং ইংরেজদের সঙ্গে তাহারাও টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিলেন। দুই বৎসর যাবৎ টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংরেজ সেনাপতি মেডোজ (Medows) টিপুর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করিতে সক্ষম হয় নাই। পরিশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনার ভার লইয়া রণে অবতীর্ণ হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মিত্রবাহিনী টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অপূর্ব্ব রণ-কৌশলের বলে সমূহ বিনষ্টির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেও টিপু শেষ পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করা অসাধ্য বুঝিয়া ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধিতে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইল। টিপুকে মহীশূর রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিতে হইল। টিপুর প্রদত্ত রাজ্য নিজাম ও মারাঠারা ভাগ করিয়া লইল—, নিজাম কৃষ্ণানদী হইতে আরম্ভ করিয়া পেনার নদীর অপর তীর পর্য্যন্ত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইল। মারাঠারা যে অঞ্চল প্রাপ্ত হইল তাহাতে তাহাদের রাজ্যসীমা তুঙ্গভদ্রা নদীর অপর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। ইংরেজরা স্বয়ং মালাবার, দিন্দিগাল ও বড়মহল গ্রহণ করিল

এবং কুর্গের রাজার উপর তাহাদের আধিপত্য স্থাপিত হইল। এতদ্ব্যতীত টিপু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ক্ষতিপূরণের টাকার জামিন স্বরূপ টিপুর দুই পুত্রকে কর্ণওয়ালিসের শিবিরে বাস করিতে হইয়াছিল।

সন্ধির সমালোচনা

টিপুর শক্তি সম্পূর্ণরূপে খর্ব না করিয়া তাহার সঙ্গে সন্ধি করার জন্য অনেকে কর্ণওয়ালিসের নীতির নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে এতদপেক্ষা অধিক অগ্রসর হওয়া তৎকালে অসুবিধাজনক ছিল। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, ইঙ্গ-ফরাসী মনোমালিন্যের যুগে টিপুর সঙ্গে ফরাসীদের মৈত্রীবন্ধনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। উপরন্তু ডিরেক্টারমণ্ডলী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ইত্যবস্থায় সন্ধি স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র মহীশূর রাজ্য ইংরেজরা গ্রাস করিলে মিত্রপক্ষদ্বয় নিজাম ও মারাঠা অসন্তুষ্ট হইতে পারিতেন।

(৩) হায়দ্রাবাদ ও ইংরেজ

হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশের প্রতিষ্ঠাতা আসফ জা নিজাম-উল-মুলুক প্রথমে মোগল সম্রাটের অধীনে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন; পরে সম্রাট মহম্মদ শাহের সময়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নরপতি হইয়া পড়িলেন। তাহার পুত্র নিজাম আলি প্রতিবেশী মহীশূরের সুলতান ও ক্রমবর্দ্ধমান মারাঠার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া ইংরেজদের সাহায্য-প্রার্থী হইলেন এবং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ কাউন্সিলের সঙ্গে আত্মরক্ষা মূলক ও আক্রমণাত্মক চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময়ে নিজাম প্রথম দিকে হায়দর আলির প্ররোচনায় ইংরেজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু শীঘ্রই পুনরায় ইংরেজ পক্ষে যোগদান করিলেন এবং ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে নূতন করিয়া চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী নিজাম

বাৎসরিক নয় লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে ইংরেজদের হস্তে উত্তর সরকার অর্পণ করিলেন। অল্পকাল পরে ইংরেজগণ 'গুণ্টুর সরকার' নিজামের ভ্রাতা সালাবৎ জঙ্গকে জীবন-স্বত্বে প্রদান করাতে বাৎসরিক নয় লক্ষ টাকা কর কমাইয়া সাত লক্ষে পরিণত করা হয়। নিজাম ফরাসী সৈনিক তাহার সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিতেছেন এই অজুহাতে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন মাদ্রাজের গভর্ণর হঠকারিতার সহিত গুণ্টুর সরকার নিজামের ভ্রাতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন, উপরন্তু নিজামকে দেয় কর পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। নিজাম এই ঘটনায় ইংরেজদের প্রতি বিরক্ত হইয়া ইংরাজের বিপক্ষ হায়দর এবং মারাঠাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংস মান্দ্রাজ কর্তৃপক্ষের ত্রুটি উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময়েই গুণ্টুর নিজামের ভ্রাতার হস্তে পুনরর্পণ করিয়া নিজামের মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন।

নিজামের ভ্রাতার মৃত্যুর পর ইংরেজরা নিজামের নিকট হইতে গুণ্টুর ফিরিয়া পাইবার জন্য দাবি করিল। কেননা, গুণ্টুর নিজামের ভ্রাতাকে মাত্র জীবন-স্বত্বে প্রদত্ত হইয়াছিল। গুণ্টুর ইংরেজ ও নিজাম উভয়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। নিজামের পক্ষে সমুদ্রে নির্গত হইবার ইহাই ছিল একমাত্র রাস্তা, পক্ষান্তরে গুণ্টুর ব্যতীত ইংরেজ অধিকৃত উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযোগ রক্ষা করা অসুবিধাজনক ছিল। নিজাম এই সর্ত্তে গুণ্টুর ইংরেজকে অর্পণ করিলেন যে টিপু নিজামের যে সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছে তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য ইংরেজকে নিজামের সাহায্য করিতে হইবে। কিন্তু ইংরেজ ইতিপূর্ব্বেই হায়দর ও টিপুর সঙ্গে ঐ সকল অঞ্চল যে মহীশূরের অন্তর্ভুক্ত তাহা স্বীকার করিয়া ১৭৬৯ ও ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। যাহা হউক তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল কর্ণওয়ালিস টিপুর সঙ্গে ইংরেজের পুনরায় বিরোধ অনিবার্য্য জানিয়া নিজামের এই দাবী প্রকারান্তরে স্বীকার করিলেন এবং তৃতীয়

মহীশূর যুদ্ধের সময়ে টিপুর বিরুদ্ধে নিজামের সহযোগিতা প্রাপ্ত হইলেন। ইংরেজের পক্ষে যোগদানের পুরস্কার স্বরূপ নিজাম টিপুর সহিত যুদ্ধান্তে হস্তচ্যুত অঞ্চল সমূহের অধিকাংশ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

স্যার জন শোরের সময়ে মারাঠারা সম্মিলিতভাবে নিজামের রাজ্য আক্রমণ করিলে নিজাম পূর্ব্ব-চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী স্যার জন শোর নিরপেক্ষ রহিলেন। নিজাম খর্দ্দার যুদ্ধে মারাঠাদের হস্তে পরাজিত হইলেন (১৭৯৫ খৃঃ)।

(৪) ইংরেজ এবং অযোধ্যা, বারাণসী ও রোহিলখণ্ড

(ক) ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অযোধ্যা-নীতি ও রোহিলা যুদ্ধ :—১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-অযোধ্যা সন্ধির পর হইতে ইংরেজগণ অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। অযোধ্যার সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা করা তৎকালে ইংরেজের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল কেননা মারাঠা বা আফগানের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে অযোধ্যা রক্ষা-প্রাকারের কাজ করিত।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কার্য্যভার গ্রহণের অল্পদিন পূর্ব্বে সম্রাট শাহ আলম কোম্পানীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া মারাঠাদের সাহায্যে দিল্লীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শাহ আলমের নিজস্ব অর্থবল বা সামরিক শক্তি না থাকায় তিনি মারাঠাদের 'হস্ত-ক্রীড়নক' হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানীর পরিবর্ত্তে সম্রাটকে কোম্পানীর দেয় বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং কোরা ও এলাহাবাদ শাহ আলমের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল। সম্রাটের পরিবর্ত্তে অযোধ্যার নবাবের সহিত কোম্পানীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করার জন্য উপরোক্ত দুইটি জেলা নগদ ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে প্রদান করা হইল। এতদ্ব্যতীত সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যা রাজ্যে একদল বৃটিশ সৈন্য

রাখিবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সকল ব্যাপারে কোম্পানীর বেশ আর্থিক লাভ হইল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বেনারসের সন্ধিতে এই সব কার্য্য সম্পাদিত হইল।

রোহিলা যুদ্ধ ঃ—রোহিলখণ্ড অযোধ্যার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত প্রায় ষাট লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত একটি উর্ব্বর প্রদেশ ছিল এবং ইহার জন-সংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু হইলেও প্রদেশটি হাফিজ রহমৎ খাঁ নামে এক মুসলমান সর্দ্দার কর্তৃক শাসিত হইত। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা প্রতিবেশী আফগানদিগকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না এবং এই সমৃদ্ধ প্রদেশটির প্রতি তাহার লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড উভয়েই মারাঠার আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। রোহিলাগণ মারাঠাদের ভয়ে ভীত হইয়া সার রবার্ট বার্কার নামে জনৈক ইংরেজের উপস্থিতিতে নবাবের সহিত আত্মরক্ষামূলক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। এই সন্ধি অনুযায়ী স্থির হইল যে যদি মারাঠারা রোহিলখণ্ড আক্রমণ করে তাহা হইলে নবাব তাহার সামরিক শক্তি দিয়া মারাঠাগণকে বিতাড়িত করিবেন। এই সামরিক সাহায্যের জন্য রোহিলারা নবাবকে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মারাঠারা রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিলে সম্মিলিত নবাব ও ইংরেজবাহিনী মারাঠাগণকে বিতাড়িত করিল। এই সময়ে পেশোয়া প্রথম মাধবরাও-এর মৃত্যু হওয়াতে মারাঠারা আর পুনরায় আক্রমণের জন্য উৎসাহিত হইল না। নবাব তাহার প্রাপ্য চল্লিশ লক্ষ টাকা দাবি করিলে হাফিজ রহমত টাকা দিতে অস্বীকার করিল। অযোধ্যার নবাব প্রতিশ্রুত অর্থ আদায় করার জন্য হেষ্টিংসের নিকট বৃটিশ সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। সৈন্য সাহায্যের বিনিময়ে নবাবের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্তির আশায় হেষ্টিংস নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নবাব ইংরেজ

নবাবের সহিত মারাঠাভীত রোহিলাদের চুক্তি

রোহিলা রাজ্য আক্রমণের জন্য হেষ্টিংসের সৈন্য সাহায্য

সৈন্যের সাহায্যে রোহিলাদিগকে পরাজিত করিয়া রোহিলখণ্ড অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

রোহিলা-যুদ্ধ সম্বন্ধে হেষ্টিংসের আচরণের সমালোচনা ঃ— ইংরেজ সৈন্য ভাড়া দিয়া রোহিলা রাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট করা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অন্যতম অপকীর্ত্তি এবং যে সকল অন্যায় কার্য্যের জন্য হেষ্টিংস বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হন তন্মধ্যে তাহার রোহিলা নীতি অন্যতম। এই গর্হিত কার্য্যের জন্য বার্ক, মেকলে এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন এবং তীব্র ভাষায় তাহার রোহিলা নীতির সমালোচনা করিয়াছেন। হেষ্টিংসের স্বপক্ষে যাহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন স্যার জন ষ্ট্র্যাচি তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাহারা এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে যখন নবাব ও রোহিলাদের মধ্যে চুক্তি কার্য্য একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর উপস্থিতিতে সম্পন্ন হইয়াছে তখন এই চুক্তি কার্য্যে পরিণত করার নৈতিক দায়িত্ব হেষ্টিংস এড়াইতে না পারিয়া নবাবকে সাহায্য করিয়াছিলেন। উপরন্তু রোহিলাখণ্ডের উপর শাসনের জন্য আফগান সর্দ্দারদের কোন ন্যায্য দাবি ছিল না, কেননা হিন্দু-গরিষ্ঠ এই রাজ্যটি মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান সর্দ্দারগণ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু হেষ্টিংসের স্বপক্ষে উক্ত এই সকল যুক্তি কোন বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কেননা, নবাব ও সর্দ্দারদের মধ্যে অনুষ্ঠিত চুক্তি ব্যাপারে ইংরেজ কর্ম্মচারী সাক্ষী মাত্র ছিল—অন্য কিছু তাহার করণীয় ছিল না। আর রোহিলখণ্ডের উপর ন্যায্য অধিকারের যে যুক্তি তাহারা উত্থাপন করেন সেই যুক্তি স্বীকার করিতে গেলে তৎকালীন দেশীয় রাজাদের অধিকাংশের দাবিকেই অস্বীকার করিতে হয়। কেননা, মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উপর অধিকাংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অধিকন্তু রোহিলারা এই

গর্হিত কার্য্য

ষ্ট্র্যাচি প্রভৃতির সমর্থন

কিন্তু সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য

হিন্দু-প্রধান রাজ্য বাহুবলে অধিকার করিলেও সুশাসনের গুণে রোহিলা সর্দ্দাররা হিন্দু-প্রজাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

সুতরাং যে রোহিলারা ইংরেজদের কোন অনিষ্ট করে নাই সেই জাতির স্বাধীনতা শুধু অর্থলোভে বিনষ্ট করার কার্য্যে সহায়তা করিয়া হেষ্টিংস অতিশয় অসদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

(খ) **ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও বারাণসীর চৈৎসিংহ ঃ**—বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের প্রতি হেষ্টিংসের আচরণ অনাবশ্যক কঠোরতা ও অনুচিত রূঢ়তায় কলঙ্কিত। চৈৎসিংহ অযোধ্যার নবাবের অধীনে একজন করদরাজ বা জমিদার ছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্যের আধিপত্য কোম্পানীর হস্তান্তরিত হয়। কোম্পানীর সহিত তাহার এই চুক্তি হয় যে, চৈৎসিংহ যে পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে বার্ষিক সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা কর দিবেন সে পর্য্যন্ত কোম্পানী কোন কারণে তাহার উপর অন্য কোন প্রকার দাবি করিতে পারিবেন না, বা কাহাকেও তাহার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিতে কিংবা শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন না। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময়ে হেষ্টিংস অর্থাভাবে বিব্রত হইয়া কয়েকবার চৈৎসিংহের নিকট চুক্তির অতিরিক্ত অর্থ দাবি করিয়াছিলেন। চৈৎসিংহ বিনা আপত্তিতে এই বে-আইনী দাবি পূরণ করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ হেষ্টিংস রাজার নিকট হইতে অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস চৈৎসিংহকে দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সরবরাহ করিতে আদেশ দিলেন, বিশেষ অনুরোধে এই সংখ্যা কমাইয়া এক সহস্র করা হইল। চৈৎসিংহ কোন প্রকারে পাঁচশত অশ্বারোহী ও ৫০০ শত পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার আদেশ পালনে তথা কথিত শৈথিল্যের অপরাধে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা

বারাণসীর পূর্ব্ব ইতিহাস

চৈৎসিংহের উপর অন্যায় দাবী

করিলেন। এই জরিমানা আদায়ের জন্য তিনি স্বয়ং বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সামান্য অজুহাতে চৈৎসিংহকে রাজপ্রাসাদে যাইয়া বন্দী করিলেন। রাজার এই অপমানে প্রজাপুঞ্জ ক্রুদ্ধ হইয়া কোম্পানীর সিপাহীদিগকে হত্যা করিল। হেষ্টিংস প্রাণ লইয়া চুণারে পলায়ন করিলেন এবং অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। চৈৎসিংহ প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহের দায়িত্ব অস্বীকার করা সত্ত্বেও কোন ফল হইল না। তিনি বারাণসী হইতে বিতাড়িত হইয়া গোয়ালিয়রে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বারাণসীর সিংহাসন তাহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রদান করা হইল। এই নূতন রাজা পূর্ব্বে দেয় বাৎসরিক কর সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

পূরণে অসমর্থ হওয়াতে বন্দী

চৈৎসিংহ সিংহাসনচ্যুত

চৈৎসিংহের প্রতি আচরণের সমালোচনাঃ—হেষ্টিংসের আচরণের সমর্থকগণ এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে চৈৎসিংহ স্বাধীন নরপতি ছিলেন না, তিনি একজন সামান্য জমিদার ছিলেন। সুতরাং তাহার উপর অর্থের দাবী করা হেষ্টিংসের পক্ষে অযৌক্তিক হয় নাই। ঐতিহাসিক স্মিথ হেষ্টিংসকে এই বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন যে তৎকালীন বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থার জন্য হেষ্টিংস জরুরী প্রয়োজনে একান্ত বাধ্য হইয়াই চৈৎসিংহের নিকট অর্থের দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত কোন যুক্তিই বিচারসহ নহে। চৈৎসিংহ যে বারাণসীর স্বাধীন নরপতির মর্য্যাদাযুক্ত ছিলেন তাহা ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে চুক্তি-পত্রেই স্বীকৃত হইয়াছিল। অধিকন্তু যদি জমিদার হিসাবে তাহার নিকট অর্থের দাবী করা হইল তাহা হইলে অন্য জমিদারদিগকে বাদ দিয়া শুধু চৈৎসিংহকে নিপীড়ন করা হইল কেন? দ্বিতীয়তঃ মিঃ স্মিথের 'জরুরা

সমর্থকদের যুক্তি—চৈৎসিংহ সাধারণ জমিদার ছিলেন এবং রাজনীতিক প্রয়োজনে ইহা হইয়াছিল

প্রয়োজন' চৈৎসিংহের নিপীড়নের দ্বারা মিটিতে পারে নাই। চৈৎসিংহ তাহার অধিকাংশ অর্থ লইয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,—রাজকোষে যে ২৩ লক্ষ টাকা পাওয়া গেল তাহাও কোম্পানীর সৈন্যগণ লুঠ করিয়া নিজেরা ভাগ করিয়া লইল। বরঞ্চ বিদ্রোহদমন কার্য্যে, কোম্পানীর অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য হইয়া গেল। সুতরাং এই ক্ষেত্রে হেষ্টিংসের আচরণ যে অনাবশ্যক কঠোরতা, ঔদ্ধত্য ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। পিটও হেষ্টিংসের বিচার সময়ে তাহার এই কার্য্যকে নিষ্ঠুর, অন্যায় এবং অত্যাচারমূলক ("Cruel, unjust and oppressive") বলিয়াছেন। স্যার আলফ্রেড লায়াল বলিয়াছেন যে—বারাণসীর বিদ্রোহের প্ররোচনা হেষ্টিংসের আচরণের ফলেই আসিয়াছে। রাজার সম্বন্ধে হেষ্টিংসের মনোভাবের মধ্যে খানিকটা প্রতিহিংসা ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল এবং তৎজন্য হেষ্টিংসের সমগ্র আচরণের মধ্যে অযৌক্তিক কঠোরতা ও অনাবশ্যক ব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিপক্ষের কথা—চৈৎসিংহ স্বাধীন রাজা এবং উক্ত প্রয়োজন মিটে নাই

(গ) অযোধ্যার বেগমদের প্রতি উৎপীড়ন:—অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আসফউদ্দৌলা সিংহাসনে বসিলেন। তিনি ফৈজাবাদের চুক্তি দ্বারা বৃটিশ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কোম্পানীকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু রাজকোষের অবস্থা শোচনীয় থাকায় কোম্পানীকে দেয় প্রচুর অর্থ বাকী রহিল। হেষ্টিংস প্রাপ্য টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করায় নবাব জানাইলেন যে তাহার মাতা ও পিতামহীর যে ব্যক্তিগত অর্থ আছে তাহা না পাইলে নবাবের পক্ষে কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করা অসম্ভব। নবাবের মাতা ও মাতামহীর ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রচুর আয়যুক্ত জায়গীর ছিল এবং নগদ অর্থ সম্পত্তিও কম ছিল না। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যাস্থিত বৃটিশ রেসিডেন্ট

ইংরাজের প্রাপ্য প্রদানে নবাবের অক্ষমতা

মিডলটনের কথায় সুজাউদ্দৌলার বেগম পুত্রকে তিন লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেও তিনি এতদ্ব্যতীত আড়াই লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছিলেন। তখন বেগমকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে তাহার নিকট আর অর্থের জন্য দাবি করা হইবে না। কিন্তু ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের চাপে যখন নবাব বেগমদের অর্থ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন হেষ্টিংস কোন আপত্তি করিলেন না বরঞ্চ যাহাতে অনিচ্ছুক বেগমদের নিকট হইতে টাকা আদায় করার সুবিধা হয় তজ্জন্য তিনি নবাবকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য ফৈজাবাদে প্রেরণ করিলেন। ইংরেজ সৈন্যগণ বেগমদের খোজা-প্রহরীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ আদায় করিয়া লইল।

বেগমদের অর্থ লুণ্ঠনের জন্য সম্মতি প্রাপ্ত

বেগমদের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের ব্যাপারে হেষ্টিংস সমস্ত ন্যায়নীতি ও শ্লীলতা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। নবাব ব্যক্তিগত ভাবে টাকা আদায়ের জন্য যে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা মঞ্জুর করায় হয়তো পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধ হইতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোক ও খোজা প্রহরীর উপর অত্যাচার করার জন্য একদল বৃটিশ সৈন্য প্রেরণ করা অত্যন্ত গর্হিত ও সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য কার্য্য হইয়াছে। হেষ্টিংসের বিচারের সময়ে হেষ্টিংস বিচারের সময়ে হেষ্টিংস আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিয়াছিলেন যে বেগমরা চৈৎ-সিংহের ব্যাপারে জড়িত ছিল সুতরাং বেগমদিগের প্রতি তাহার আচরণ ন্যায্য হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির কোন ভিত্তি নাই এবং নিজের আচরণ সমর্থনের জন্য পরে এই অলীক অভিযোগ কল্পিত হইয়াছিল।

(ঘ) কর্ণওয়ালিস ও স্যার জন শোরের অযোধ্যা-নীতি :— আসফ-উদ্দৌলার সময়ে অযোধ্যা কুশাসনের জন্য যথেষ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। অধিকন্তু কোম্পানীর প্রাপ্য মোটা টাকার দায় তাহার স্কন্ধে থাকার জন্য অযোধ্যা কোন ক্রমেই আর সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কানপুর

ও ফতেগড় হইতে বৃটিশ সৈন্য উঠাইয়া লইলে অর্থের দায় হইতে কিঞ্চিৎ নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে এই আশায় নবাব কর্ণওয়ালিসকে উপরোক্ত অনুরোধ করিলেন। কর্ণওয়ালিস কোম্পানীকে দেয় অর্থের পরিমাণ ৭৪ লক্ষ হইতে কমাইয়া ৫০ লক্ষ করিলেন কিন্তু বৃটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করিতে সম্মত হইলেন না।

সাদত আলির পক্ষ সমর্থন

আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ওয়াজির আলি ও সাদত আলির মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। স্যার জন শোর সাদত আলির পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাকে নবাবের গদিতে বসাইলেন। তাহার সহিত নূতন সন্ধির বলে কোম্পানী বাৎসরিক ৭৬ লক্ষ টাকা পাইবে স্থির হইল। এতদ্ব্যতীত এলাহাবাদের কেল্লা ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করা হইল। নূতন সন্ধি অনুযায়ী নবাব অন্য কোন ইউরোপীয়কে তাহার রাজ্যে স্থান দিবেন না বা তাহার সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। ওয়াজির আলিকে বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া বারাণসীতে বাস করার অনুমতি দেওয়া হইল। ইহাতে কোম্পানীর মর্য্যাদা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, কিন্তু অত্যধিক টাকার করভার মিটাইতে অযোধ্যার দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। আভ্যন্তরীণ কুশাসনে প্রজাদের আর্থিক দুরবস্থা চরমে উঠিল।

কর বৃদ্ধি ও এলাহাবাদের দুর্গ প্রাপ্তি

(ঙ) **হেষ্টিংসের চরিত্র ও কৃতিত্ব** :—ওয়ারেণ হেষ্টিংসের চরিত্র সম্বন্ধে এত বেশী বিবাদ-বিসম্বাদ হইয়াছে যে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। তাহার বিরুদ্ধে প্রতিকূল মনোভাব এত তীব্র যে অদ্যাপি তাহা দূরীভূত হয় নাই। বার্ক, মেকলে বা জেমস মিলের ন্যায় প্রাচীন যুগের বক্তা ও ঐতিহাসিকগণ যেমন তীব্র ভাষায় তাহার বহুবিধ আচরণের নিন্দা করিয়াছেন তদ্রূপ আধুনিক যুগের থর্ণটন, মার্শম্যান বা

বহু গর্হিত কাজ করিয়াছেন

বেভারিজ প্রভৃতি মনীষিগণও তাহার আচরণ সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। হেষ্টিংসের সমর্থকগণ তাহার বিভিন্ন গর্হিত আচরণের সমর্থনে অন্য কোন যুক্তি না থাকিলে "তৎকালীন রাজনীতিক পরিস্থিতিতে" বা "কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই" ঐ সব অন্যায় কার্য্য করিতে হইয়াছে এই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। অন্যান্য গর্হিত কর্ম্ম বাদ দিলেও রোহিলাদের স্বাধীনতা অপহরণে বৃটিশসৈন্য ভাড়া দেওয়া, চৈৎসিংহের প্রতি উৎপীড়ন, অযোধ্যার বেগমদের ধন লুণ্ঠনে সাহায্য প্রদান ইত্যাদি আচরণ কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। মুর্শিদাবাদ পরিদর্শন কালে মীরজাফরের বিধবা মণিবেগমের নিকট হইতে দেড় লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি যে তাহার চাকুরীর সর্ত্তভঙ্গ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত উৎকোচ ও উপহার গ্রহণ যে কতবার তাহার চরিত্র কলুষিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধ-পক্ষীয়দের বিদ্বেষ যতই উদ্দেশ্যমূলক হউক, পিট ও ডুণ্ডাসের ন্যায় ধীর ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও যে পার্লমেণ্টে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন নাই সে কথা ভুলিলে চলিবে না। তাহার গুণগ্রাহী সমর্থকগণ নানাপ্রকারে তাহার কলঙ্কক্ষালনের চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের পক্ষে নির্ব্বিচারে তাহার সকল কার্য্য সমর্থন করা অসম্ভব।

চরিত্র অসমর্থনীয়

হেষ্টিংসের চরিত্রে অসহিষ্ণুতা ও ঔদ্ধত্যের ফলেই সম্ভবতঃ তাহার শত্রুপক্ষের আক্রোশ অতি তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তাহাকে প্রথম হইতে যে বহু অসুবিধা ও প্রতিকূলতার মধ্যে বৃটিশের মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি রক্ষা করার জন্য কাজ করিতে হইত তাহা মনে রাখা আবশ্যক। জলপথে ফরাসী নৌ-সেনাপতি সাফ্রেন, স্থলপথে মারাঠা, নিজাম ও হায়দর আলি দ্বারা ইংরেজগণ যখন আক্রান্ত ও বিপন্ন তখনই তিনি এদেশে বৃটিশ প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন।

কৃতিত্ব

দুঃসময়ে বৃটিশ শক্তির রক্ষাকর্ত্তা

ক্লাইভের ন্যায় সমর পরিচালনায় তাহার কৃতিত্ব ছিল না বটে কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় তিনি ক্লাইভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। নানা ফাড়নবিশ, মহাদজী সিন্ধিয়া বা হায়দর আলির মত ধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে তাহাকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে এবং প্রথম মারাঠা যুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে জয়লাভ তাহার সুপরিচালনার গুণেই সম্ভব হইয়াছে।

পররাষ্ট্র নীতিতেও: ক্লাইভের আপক্ষা শ্রেষ্ঠ

আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারেও তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ছিল। তাহার রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থায় যথেষ্ট ত্রুটি ছিল বটে কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর পীড়িত বাংলায় তিনি অনেকটা শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সুশাসন প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; বিচার বিভাগে তাহার প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল। তাহার প্রবর্ত্তিত জেলা-শাসন পদ্ধতি বৃটিশ শাসনের ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, বাংলা ও ফার্সি ভাষায় তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষাদানের নিমিত্ত তিনি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৃটিশের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে অবশ্য হেষ্টিংসকে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই বলা চলে। তিনি ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আসন্ন পতন হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহার কৃতিত্বের বলে রক্ষিত ভিত্তির উপর পরবর্ত্তীযুগে ওয়েলেসলী, মার্কুইস অফ হেষ্টিংস (ময়রা), বা ডালহৌসী সাম্রাজ্য সৌধ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে ভারতে আগত বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে (Anglo-Indian statesmen) শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা যাইতে পারে।)

শাসন ব্যবস্থা

বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী

ইঙ্গ-বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

———

চতুর্থ অধ্যায়

বৃটিশ শক্তির ক্রমাগ্রগতি, ১৭৯৮-১৮২৩

ওয়েলেসলী, ১৭৯৮-১৮০৫।

কর্ণওয়ালিস, ১৮০৫ (দ্বিতীয় বার)।

স্যার জর্জ্জ বার্লো, ১৮০৫-'১৮০৭।

লর্ড মিণ্টো, ১৮০৭-'১৩।

মার্কুইস অফ হেষ্টিংস (আর্ল অফ্ ময়রা), ১৮১৩-'২৩।

(১) *ইংরেজ ও মারাঠা : মারাঠা শক্তির পতন*

মারাঠা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা

(ক) **দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ**:—১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাজিরাও পেশোয়ার পদ লাভ করেন। তাহার সময় হইতে মারাঠা সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ক্রমশঃ অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। দ্বিতীয় বাজিরাও দুর্ব্বলচরিত্র ও ষড়যন্ত্রপ্রিয় ছিলেন। বিশাল মারাঠা সাম্রাজ্যকে সুশৃঙ্খল-ভাবে পরিচালনা করিবার শক্তি তাহার ছিল না। মারাঠাদের দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাহাদের প্রতিভাবান নায়কেরা একে একে প্রায় সকলেই গত হইয়াছিলেন। মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া, মলহর রাও হোলকার এই সময়ে জীবিত ছিলেন না। নানা ফাড়নবিশ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত তিনি ভগ্নপ্রায় মারাঠা সাম্রাজ্যকে কোন প্রকারে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মারাঠা জাতির এই শেষ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ধুরন্ধরও পরলোকগমন করেন। "তাহার মৃত্যুর সঙ্গে মারাঠা গভর্ণমেণ্টের সকল জ্ঞান-বৃদ্ধি ও প্রশান্ত নীতি অন্তর্হিত হইল" (পুনার বৃটিশ রেসিডেন্ট কর্ণেল সামার-এর উক্তি)। পুনা-র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলকে

নেতাদের মৃত্যু, নানা ফাড়নবিশের চরিত্র

অবহেলা করা ফাড়নবিশের রাষ্ট্রনীতির অন্যতম ত্রুটি ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ত্রুটি সত্ত্বেও "তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং স্বদেশপ্রেমিকের আন্তরিকতা ও অনুরাগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার কার্য্যক্রম অনুসরণ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে" (গ্রাণ্ট ডাফ)। মারাঠাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজের হস্তক্ষেপ যে ভবিষ্যৎ-আশঙ্কার সম্ভাবনাপূর্ণ তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই তিনি ইংরেজদের সঙ্গে কোন প্রকার মৈত্রীবন্ধন অপছন্দ করিতেন। ফাড়নবিশ ইংরেজদিগের উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন কিন্তু রাজনীতিক-বৈরী হিসাবে তাহাদিগকে তীব্রভাবে ঘৃণা করিতেন।

পেশোয়ার উপর প্রভাব বিস্তারে সিন্ধিয়া ও হোলকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ফাড়নবিশের মৃত্যুর পর মারাঠা-অধিনায়কদের গৃহ-বিবাদ উগ্র আকার ধারণ করে। পেশোয়ার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লইয়া মহাদজী সিন্ধিয়ার উত্তরাধিকারী দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও ইন্দোরের তরুণ অধিপতি যশোবন্ত রাও হোলকারের মধ্যে তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয়। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও দুর্ব্বলচিত্ত ও ষড়যন্ত্রপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বিরোধ জটিল আকার ধারণ করিল। দৌলত রাও প্রথমতঃ পেশোয়ার উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া সসৈন্যে পুনায় অবস্থান করিতেছিলেন। যশোবন্তরাও দৌলতরাও-এর প্রভাব খর্ব্ব করার জন্য সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন এবং সিন্ধিয়াও পেশোয়ার সম্মিলিত বাহিনীকে পুনার অনতিদূরে পরাজিত করিয়া মারাঠা রাজধানীতে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। পেশোয়া পুনা হইতে প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। যশোবন্তরাও বিনায়করাওকে পেশোয়ার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

পেশোয়ার পরাজয় ও পলায়ন

লর্ড ওয়েলেসলী ও অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি (Policy of Subsidiary Alliance) :—মারাঠা রাজ্যের এই আভ্যন্তরীণ

বিবাদের সময় লর্ড ওয়েলেসলী ভারতে কোম্পানীর সাম্রাজ্যের শাসনভার পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী লর্ড কর্ণওয়ালিস এবং স্যার জন শোরের ন্যায় নিরপেক্ষ নীতির (Policy of Non-Intervention) পক্ষপাতী ছিলেন না এবং পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের নির্দ্দেশানুযায়ী রাজ্য বিস্তারে ক্ষ্যান্ত থাকিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ওয়েলেসলী সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন, ভারতে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তার ও বদ্ধমূল করাই তাহার প্রদান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের যে নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুসৃত হইয়াছিল।

ওয়েলেসলীর সময়ে বৃটিশ শক্তির দুরবস্থা

লর্ড ওয়েলেসলী যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন বৃটিশের রাজনৈতিক প্রভাব-ও প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। স্যার জন শোরের ঔদাসীন্য নীতির জন্যই কোম্পানীর মর্য্যাদা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। ইংরেজদের পুরাতন বৈরী টিপু ইতিমধ্যে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইয়াছে, দুর্ব্বলতম নিজাম আত্মরক্ষার জন্য ইংরেজের সাহায্য না পাইয়া ফরাসী সাহায্য শ্রেয়ঃ মনে করিতেছিল। দৌলতরাও সিন্ধিয়া যেরূপ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল তাহাতে ইংরেজের পক্ষে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ ঘটিল; কূর্গ ব্যতীত মালাবার অঞ্চলের সমস্ত রাজগণ ইংরেজের বিরোধী; সর্ব্বোপরি কাবুলের অধিপতি জামান শাহের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল। ইংরেজদের আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তখন ইউরোপে ফরাসীদের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলিতেছিল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়ক হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণের

সর্ব্বত্র ফরাসী প্রভাব

উদ্যোগ করিতেছিলেন; মহীশূর অধিপতি টিপু সুলতানের সহিত ফরাসীদের কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অনেক ভারতীয়-রাজ্যে ফরাসী প্রভাব

অত্যন্ত প্রবল ছিল। কয়েকজন ফরাসী সেনানায়ক পেশোয়া, নিজাম, সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি রাজগণের সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন ভারত হইতে বৃটিশ প্রতিপত্তি লুপ্ত করার জন্য মিশর অভিযানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

অধীনতামূলক মিত্রতা

এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে বৃটিশ শক্তিকে উদ্ধার করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাই ওয়েলেসলীর উদ্দেশ্য ছিল। ভারতবর্ষে ফরাসী প্রভাব বিলুপ্ত করিয়া ভারতীয় রাজ্যসমূহে যাহাতে ইংরেজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য ওয়েলেসলী স্যার জন শোরের ঔদাসীন্য নীতি পরিত্যাগ করিয়া অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি (Policy of Subsidiary Alliance) গ্রহণ করিলেন।

সর্ত্ত-সমূহ

যে ভারতীয় নরপতি বৃটিশের সহিত অধীনতা মূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ হইবেন তাহার রাজ্য বহিঃশত্রু ও গৃহশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার সকল দায়িত্ব বৃটিশ সরকার গ্রহণ করিবেন। কোম্পানীর এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে আশ্রিত নৃপতিকে নানাপ্রকারে নিজের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে হইবে। আশ্রিত নৃপতিকে নিজ ব্যয়ে রাজ্যমধ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য পোষণ করিতে হইবে; এই সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বড় রাজ্যগুলিকে তাহাদের রাজ্যের এক অংশ ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যকে বাৎসরিক একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কর স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। কোম্পানীর অনুমতি ব্যতীত তিনি কোন ইউরোপীয়কে নিজ রাজ্যে চাকুরী দিতে পারিবেন না। তিনি অন্য কোন ভারতীয় বা বৈদেশিক শক্তির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে পারিবেন না। স্বাধীনতার বিনিময়ে দেশীয় নৃপতিবর্গ তাহাদের রাজ্য রক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইবেন।

পরাক্রান্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে উপরোক্ত সর্ত্তে কোম্পানীর মিত্রতা

গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। দুর্ব্বলতম শক্তি নিজামই সর্ব্বপ্রথম এই অধীনতা-মূলক মিত্রতায় সম্মত হইলেন। ওয়েলেসলী বহুবার মারাঠাদিগকে ইংরেজের সঙ্গে পারস্পরিক আত্মরক্ষামূলক এই চুক্তিতে সম্মত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মারাঠারা এই আহ্বানে কোন সাড়া দেয় নাই। কিন্তু পদচ্যুত পেশোয়া বাজিরাও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া বৃটিশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বেসিনের সন্ধিসূত্রে পেশোয়া বৃটিশের অধীনস্থ মিত্র হইলেন (Treaty of Bassein, 1802) এবং একদল বৃটিশ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২৬ লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়যুক্ত রাজ্যের একাংশ বৃটিশের হস্তে অর্পণ করিলেন। বেসিনের সন্ধির পর একদল ইংরেজসৈন্য পুনায় যাইয়া বাজিরাওকে পুনরায় পেশোয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। রক্ষণের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে পেশোয়া স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে ইতস্ততঃ করিলেন না।

বেসিনের সন্ধি ১৮০২, পেশোয়া কর্ত্তৃক অধীনতা মৈত্রী গ্রহণ

বেসিনের সন্ধি ভারতে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সন্ধির ফলে ইংরেজগণ আইনসঙ্গতভাবে মারাঠা-সঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইল এবং মারাঠাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আধিপত্য করার পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হইল। বাজিরাও গদিচ্যুত পেশোয়া হইলেও তাহার পদমাহাত্ম্য উপেক্ষণীয় ছিল না এবং অন্যান্য মারাঠা শক্তির সহিত ভবিষ্যৎ-সংঘর্ষে এই সন্ধির জোরেই ইংরেজগণ অনেকটা সুবিধা লাভ করিতে পারিয়াছিল।

বেসিনের সন্ধির গুরুত্ব

অকর্ম্মন্য পেশোয়া কোম্পানীর আনুগত্য স্বীকার করিলেও অন্যান্য মারাঠা সামন্তরাজগণ স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও তাহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং নিজের ভ্রম স্বীকার করিয়া গোপনে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মারাঠা রাজ্যের এই সঙ্কট সময়ে মারাঠা সর্দ্দারগণ সম্মিলিত-

ভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিল না। দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও বেরারের দ্বিতীয় রঘুজী ভোঁসলা কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও যশোবন্তরাও ইহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন না; ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করিবার জন্য সসৈন্যে নিরপেক্ষ রহিলেন। গাইকোয়াড়ও নিরপেক্ষ রহিল। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা পরাস্ত হওয়ার পর হোলকার একাকী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু তখন যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। এই ত্রিশক্তি যুগপৎ ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইলে ফল হইত অন্যরূপ।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হইল। ইংরেজপক্ষ দাক্ষিণাত্যে আর্থার ওয়েলেসলী (লর্ড ওয়েলেসলীর ভ্রাতা, পরে নেপোলিয়ন বিজয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটন নামে খ্যাত) ও উত্তর ভারতে লর্ড লেকের নেতৃত্বাধীনে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত তাহারা গুজরাট, বুন্দেলখণ্ড ও উড়িষ্যায় বিপক্ষের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ফরাসী কর্ম্মচারী দ্বারা শিক্ষিত সিন্ধিয়ার বাহিনী রণক্ষেত্রে তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারিল না; সিন্ধিয়ার ইউরোপীয় সামরিক কর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিল। মারাঠাদের নিজস্ব চিরাচরিত যুদ্ধপদ্ধতি অর্থাৎ যথাসম্ভব সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করিয়া অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করা—পরিত্যাগ করায় বিপদ হইল। নেতৃত্বহীন সেনাবাহিনী বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না।

আসাই

আর্থার ওয়েলেসলী আসাই নামক স্থানে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সম্মিলিত সৈন্যদলকে পরাভূত করিল (১৮০৩)। পুনরায় ভোঁসলার বাহিনী আরগাঁওএ পরাজিত হইলে ইংরেজরা বিখ্যাত গোয়ালিয়রের দুর্গ অধিকার করিল।

লাসোয়ারী

ইতিমধ্যে উত্তর-ভারতে দিল্লী ও আগ্রা সিন্ধিয়ার হস্তচ্যুত হইল। সিন্ধিয়ার সৈন্যদল একবার দিল্লীতে ও পুনরায়

লাসোয়ারীর যুদ্ধে লর্ড লেকের হস্তে পরাজিত হইল। ইংরেজরা গুজরাট, বুন্দেলখণ্ড ও উড়িষ্যায়ও সাফল্য লাভ করিল। যুদ্ধারম্ভের পাঁচ মাসের মধ্যে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা পরাজয় স্বীকার করিয়া দুইটি বিভিন্ন সন্ধিতে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। দেওগাঁও-এর সন্ধিতে নাগপুরের রাজা ইংরেজের হস্তে উড়িষ্যা সমর্পণ করিয়া অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইলেন। নিজাম বা পেশোয়ার সহিত কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে ইংরেজরা তাহার মধ্যস্থতা করিবে এবং কোন ইউরোপীয় জাতির সহিত ইংরেজের সমর্থন ব্যতীত ভোঁসলা মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইবেন না এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। এল্‌ফিনষ্টোন নামে একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী নাগপুরের দরবারে রেসিডেন্টরূপে প্রেরিত হইলেন। সিন্ধিয়াও ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সুরজি-অঞ্জনগাঁও-এর সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অনুযায়ী সিন্ধিয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত অঞ্চল ইংরেজের হস্তে অর্পণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রাজপুতানার বহু অধিকৃত অঞ্চল, আহম্মদনগর, বরোচ এবং অজন্তা পর্ব্বতমালার পশ্চিমস্থ সমগ্র স্থানের উপর আধিপত্য পরিত্যাগ করিলেন। উপরন্তু তাহাকে মোগল সম্রাট, পেশোয়া, নিজাম এবং ইংরেজের উপর সমস্ত দাবি পরিত্যাগ করিতে হইল। বলা বাহুল্য সিন্ধিয়া নূতন এক চুক্তিপত্র দ্বারা ইংরেজের সঙ্গে অধীনতা মুলক মিত্রতায় অবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন।

ভোঁসলার সঙ্গে দেওগাঁয়ের সন্ধি

সিন্ধিয়ার সঙ্গে সুরজি-অঞ্জন গাঁও-এর সন্ধি

এই দুইটি সন্ধির ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজের মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি অনেকটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং ওয়েলেসলীর কার্য্যকালের প্রারম্ভে ইংরেজগণ যে শঙ্কাজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হইল। অতঃপর মাদ্রাজ ও বাঙ্গালার বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ সূত্র স্থাপিত হইল, নামাবশেষ

ফলাফল

দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজের রক্ষণাধীনে আসিলেন এবং রাজপুতানার জয়পুর, যোধপুর, বুঁদি ও ভরতপুরের জাঠ রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদিত হইল। ফরাসী সেনানায়কের দ্বারা শিক্ষিত মারাঠা সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল, নিজাম ও পেশোয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ইংরেজদের অধিক অনুগত হইল।)

(খ) **হোলকারের সহিত যুদ্ধ**:—যশোবন্ত রাও হোলকার এতকাল যুদ্ধের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার পরাজয়ের পর হোলকার ইংরেজের বিরুদ্ধে রণে অবতীর্ণ হইলেন (১৮০৪)। হোলকার মারাঠাদের প্রাচীন রণপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল মন্‌সন্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন এবং তাহাকে আগ্রায় পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিলেন। অতঃপর হোলকার উৎসাহিত হইয়া দিল্লী অবরোধ করিলে বৃটিশ রেসিডেণ্ট অক্টারলোনী বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া দিল্লী রক্ষা করিলেন।

হোলকার একাকী অবতীর্ণ

অল্পকাল পরে সেনাপতি লেকের হস্তে হোলকার দীগের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন; কিন্তু সেনাপতি লেক ভরতপুরের দুর্গ অবরোধ করার পর অনেক চেষ্টা করিয়া দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। যাহা হৌক ভরতপুরের রাজা বৃটিশের সহিত সন্ধি করিলেন (১৮০৫)। ওয়েলেসলী ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়ার পর বৃটিশনীতি পরিবর্ত্তিত হইল। ওয়েলেসলীর রাজ্যবিস্তার নীতি পরিত্যক্ত হইয়া স্যার জন শোরের নিরপেক্ষ নীতি পুনরায় গৃহীত হইল। হোলকারও কোন ক্রমে নিশ্চিত বিনাশ হইতে রক্ষা পাইলেন। অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল স্যার জর্জ্জ বার্লো (১৮০৭) হোলকারের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অনুযায়ী হোলকার টঙ্ক, রামপুরা, বুঁদি কুচ, বুন্দেলখণ্ড এবং চম্বল নদীর উত্তর-তীরস্থ অঞ্চলের উপর দাবি পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তিনি

দীগের যুদ্ধে পরাজয়

ওয়েলেসলীর বিলাত গমনে হোলকার রক্ষা পাইলেন

তাহার হস্তচ্যুত রাজ্যের অধিকাংশই ফিরিয়া পাইলেন। এতদ্ব্যতীত লর্ড লেকের পুনঃপুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও বার্লো টঙ্ক ও রামপুরার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে হোলকারের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং অন্যান্য রাজপুত রাষ্ট্রের উপর হইতে বৃটিশের রক্ষণাধিকার প্রত্যাহার করিলেন। ইহার ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইল; সমগ্র রাজপুত-ভূমি মারাঠা লুণ্ঠনকারীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার সুযোগ পাইল।

(গ) তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও মারাঠা শক্তির পতন (১৮১৭-'১৯)ঃ—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতেই মারাঠা জাতির মধ্যে অধঃপতনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। বিভিন্ন মারাঠা শক্তির মধ্যে রাজনৈতিক সদ্ভাবের অস্তিত্ব ছিল না; অধিকন্তু রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির অব্যবস্থার জন্য মারাঠাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করার সম্ভাবনাও কম ছিল। মারাঠাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও বিশেষ ভাল ছিল না; সুতরাং সমস্ত দিক দিয়া মারাঠাদের ব্যাপার অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিল।

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে হোলকার কোনও প্রকারে আত্মসম্মান বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু অতঃপর তাহার রাজ্যে গোলমালের সূত্রপাত হইল। যশোবন্ত রাও হোলকার নিষ্কণ্টক হইবার জন্য ভ্রাতা কাশী রাও ও ভ্রাতুষ্পুত্র খণ্ডে রাওকে হত্যা করিলেন। কিন্তু অচিরেই এই অপকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া উন্মাদ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন (১৮১১)। হোলকারের মৃত্যুর পর তাহার প্রিয়পাত্রী তুলসী বাঈ রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন; মৃত যশোবন্ত হোলকারের মন্ত্রী বলরাম শেঠ এবং পাঠান নেতা আমির খাঁ এই নারীর পরামর্শদাতা হইলেন। অযোগ্য পরিচালনার ফলে ইন্দোর অবনতির মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইন্দোর

দৌলত রাও সিন্ধিয়ার পর্য্যাপ্ত অর্থবল ছিল না অথচ তাহাকে বিরাট সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতে হইতেছিল। ইত্যবস্থায় সিন্ধিয়া সৈন্যদলকে

স্বীয় প্রচেষ্টায় বেতনাদি সংগ্রহ করিবার অনুমতি দিলেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন সৈন্যদলের নৈতিক অবনতি ঘটিল, অন্যদিকে সেনাদলের উপর হইতে সিন্ধিয়ার আধিপত্য অনেকটা শিথিল হইয়া গেল।

গোয়ালিয়র

পিণ্ডারী দস্যু ও পাঠানদের লুণ্ঠন কার্য্যের জন্য রঘুজী ভোঁসলার রাজ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা ছিল না। গাইকোয়াড় ইংরেজদের সঙ্গে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে যে অধীনতামূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ হন তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধিতা করার কোন সঙ্কল্প তাহার ছিল না। মারাঠা রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান শক্তি পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বেসিনের সন্ধি দ্বারা কোম্পানীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু এই পঞ্চশক্তির মধ্যে কোন ঐক্য বা স্বার্থের বন্ধন ছিল না। সকলে ইংরেজের প্রভুত্ব সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইতে পারে নাই এবং প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাতের জন্যই তাহারা ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিল না। তথাপি চূড়ান্তভাবে অবলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে মারাঠারা শেষবারের মত ইংরেজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল।

নাগপুর

বরোদা

পেশোয়া

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও গোপনে অন্যান্য মারাঠা সর্দ্দারের সঙ্গে ইংরেজের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস অফ হেষ্টিংস বা আর্ল-অফ ময়রা (১৮১৩-’২৩) পেশোয়ার ক্ষমতা অধিকতর সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পুনার সন্ধিতে পেশোয়াকে মারাঠা শক্তির নেতৃত্বপদ পরিত্যাগে বাধ্য করিলেন।

ইংরেজ পেশোয়া, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিল

অধিকন্তু পেশোয়াকে ইংরেজের হস্তে কোঙ্কণ ও কয়েকটি দুর্গ ছাড়িয়া দিতে হইল ও গাইকোয়াড়ের উপর তাহার দাবির অর্থের পরিমাণ কমাইয়া চারি লক্ষ টাকা করা হইল। উক্ত বৎসরই দৌলত রাও সিন্ধিয়াকে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ করা হইল। এই সন্ধির বলে সিন্ধিয়া পিণ্ডারী-দস্যু দমনে ইংরেজদের সহযোগিতা করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং চম্বল নদীর পরবর্ত্তী অঞ্চল সমূহের উপর ইংরেজের যথেচ্ছা নীতির অধিকার মানিয়া লইলেন। অতঃপর ইংরেজগণ রাজপুত রাষ্ট্রসমূহকে মারাঠার লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিবার সুযোগ পাইল। পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার সঙ্গে বন্দোবস্ত করার পর অবশিষ্ট রহিল ভোঁসলা ও হোলকার। ইতিমধ্যে রঘুজী ভোঁসলা মৃত হইলে ইংরেজগণ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আপ্পা সাহেব-কে নাবালক ভোঁসলার অভিভাবক বলিয়া স্বীকার করিলেন; বিনিময়ে আপ্পা সাহেব ইংরেজের সঙ্গে অধীনতামূলক মৈত্রী-তে আবদ্ধ হইলেন (১৮১৬)। হোলকারের সঙ্গে কোন প্রকার চুক্তি না হইলেও অবশিষ্ট তিনটি প্রধান শক্তিকে ক্ষমতা ও মর্য্যাদা হইতে চ্যুত করিতে পারিয়া কতকটা ইংরেজ নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন।

যুদ্ধ ঃ—স্বাধীনতাচ্যুত মারাঠা সর্দ্দারগণ কোন মতেই স্ব-স্ব অদৃষ্টকে মানিয়া লইতে পারিল না, তাহারা একবার ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া শৃঙ্খল মুক্তির জন্য চেষ্টা করিল। যেই দিন সিন্ধিয়া ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হইলেন সেই দিনই পেশোয়া একদল সৈন্য লইয়া পুনার বৃটিশ রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া পোড়াইয়া দিলেন; কিন্তু কিরকিতে ইংরেজ সৈন্য দলের হস্তে পরাজিত হইলেন। নাগপুরের আপ্পা সাহেব ও যশোবন্ত রাও হোলকারের পুত্র মল্‌হর রাও হোলকার উভয়েই ইংরেজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন। আপ্পা সাহেব সীতবল্‌দীতে ও হোলকার মাহিদপুরে পরাজিত হইলেন। আপ্পা সাহেব পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলে দ্বিতীয় রঘুজী ভোঁসলার এক নাবালক পৌত্রকে নাগপুরের রাজা করিয়া দেওয়া হইল; ভোঁসলার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

নাগপুর

নর্ম্মদা নদীর উত্তরাংশ বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইল। হোলকারও ইংরেজদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। মান্দাসোরের সন্ধিতে হোলকার সমস্ত রাজপুত রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন, নর্ম্মদার দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত জিলা ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিলেন, নিজ ব্যয়ে একদল বৃটিশ সৈন্য স্বীয় রাজ্যে রাখিতে এবং পররাষ্ট্র সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপার ইংরেজের কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে সম্মত হইলেন। হোলকার আমির খাঁ নামক একজন দস্যুনেতাকে টঙ্কের নবাব বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইন্দোরে স্থায়ীভাবে বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখিবার বন্দোবস্ত হইল।

ইন্দোর

কিরকিতে পরাজয়ের পর পেশোয়া পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে কোরেগাঁও ও আষ্টি এই দুই যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হইলেন এবং স্যার জন ম্যালকল্‌মের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। মারাঠা শক্তির রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রতীক পেশোয়া পদ লুপ্ত করা হইল। বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা পেন্সন দিয়া বাজিরাওকে কানপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুরে বাস করার অনুমতি দেওয়া হইল। তাহার রাজ্য বৃটিশ কর্তৃত্বাধীনে আনীত হইল এবং ইহার কিয়দংশ লইয়া গঠিত সাতারা নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হইল। এই ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতাপ সিংহ নামে শিবাজীর এক বংশধরের হস্তে অর্পণ করা হইল।

পেশোয়া

মারাঠাদের পতনের কারণ

যে মারাঠার শক্তি-সৌধ মোগলদের ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠিয়া পেশোয়াদের সময়ে গগনচুম্বী হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ ইংরেজদের সঙ্গে কৃতকার্য্যতার সহিত প্রতিস্পর্দ্ধিতা করিয়া আসিতেছিল ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাহা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

মারাঠা শক্তির পতনের বীজ মারাঠা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল। মারাঠা রাষ্ট্র গঠনের মৌলিক ত্রুটিই ইহার পতন আসন্ন করিল। প্রথমতঃ, "কি শিবাজীর সময়ে, কি পেশোয়াদের আমলে মারাঠা রাষ্ট্রের শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক উন্নতি অথবা জনসাধারণকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার জন্য কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনার বালাই ছিল না। প্রজাবর্গের এক রাষ্ট্রের অধীন হওয়ার পশ্চাতে স্বাভাবিক বন্ধন অপেক্ষা কৃত্রিমতা বা আকস্মিকতার স্থান অধিক ছিল। সুতরাং মারাঠা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সর্ব্বদাই শঙ্কাজনক অবস্থায় ছিল।"—যদুনাথ সরকার।

(১) গঠনতন্ত্রের মৌলিক ত্রুটি; পরিকল্পিত শাসন ব্যবস্থার অভাব

দ্বিতীয়তঃ, মারাঠা রাষ্ট্রের কোন সুপরিকল্পিত অর্থনীতি ছিল না। মহারাষ্ট্র দেশের অধিকাংশই অনুর্ব্বর এবং উষ্ণ হওয়ার জন্য কৃষিকার্য্য ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন শিল্প সমৃদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ কম ছিল। ফলে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মারাঠাদিগকে সর্ব্বদাই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত এবং চৌথ বা সরদেশমুখী প্রভৃতি অর্থের উপর নির্ভর করিতে হইত। এই পরমুখিতা একদিক দিয়া যেমন অনিশ্চিত ছিল, অপর দিক দিয়া তেমনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। তৃতীয়তঃ, শিবাজী-প্রবর্ত্তিত জায়গীর প্রথার ফলে মারাঠা রাষ্ট্রের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। জায়গীরদারগণ জাতীয় স্বার্থ বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া ব্যক্তিগত সুবিধার লোভে অবিরত পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত। মারাঠাদের মধ্যে শিবাজী, প্রথম মাধবরাও, মলহর রাও হোলকার, মহাদজী সিন্ধিয়া এবং নানা ফাড়নবীশ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেন নাই। যে সময়ে ইংরেজের মত সূক্ষ্ম কূটনীতিজ্ঞ জাতির সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে উচ্চতর কূটনীতি পরিচালনার প্রয়োজন হইল সেই

(২) অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্ব্বল ও পরমুখিতা

(৩) জায়গীর প্রথা ও উচ্চতর কূটনীতির অভাব

সময়ে মারাঠাদের মধ্যে এমন কোন দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিলেন না যিনি সমগ্র দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে এই শ্রেণীর ধুরন্ধর রাষ্ট্র নায়কের অভাবেই মারাঠা শক্তির পতন অনিবার্য্য হইল। উপরোক্ত জায়গীর-দারগণ ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত থাকিত, কূটকুশলী উচ্চতর প্রতিভা তাহাদের মধ্যে ছিল না। চতুর্থতঃ, মারাঠারা চিরাভ্যস্ত প্রাচীন রণনীতির পরিবর্তে ইউরোপীয় আধুনিক যুদ্ধ-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া ভুল করিয়াছিল। বিদেশী পদ্ধতি ভাগ্যান্বেষী বিদেশী সেনানায়কের উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া উপযুক্তভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

(৪) রণনীতির পরিবর্ত্তন

Subsidiary alliance

ইংরেজ ও মহীশূর ঃ মহীশূরের পতন

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৯৯ খৃঃ ঃ—তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে টিপু সুলতানের ক্ষমতা যথেষ্ট খর্ব্ব হইলেও টিপু ভীত হইয়া নিজামের মত ইংরেজের নিকট স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বরঞ্চ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং ইংরেজের কাছে পরাজয়ের গ্লানি অপনোদনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। টিপু তাহার সৈন্য-দলকে উপযুক্তভাবে সজ্জিত করিলেন এবং ইংরেজের শত্রু ফ্রান্সের সাহায্য প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগ করিলেন। সেই সময় ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলিতেছিল। ফ্রান্সের সাহায্য প্রত্যাশা করিয়া টিপু 'ফরাসী দ্বীপের' গভর্ণরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে মিত্রতা কামনা করিয়া তিনি আরব, কাবুল, কনষ্টান্টিনোপল, মৌরিটিয়াস ও ভার্সাইতেও দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রীর

ইংরেজের সহিত বিপক্ষতা

ফরাসীদের সঙ্গে পত্রালাপ

প্রতীক হিসাবে তিনি তাহার সেনাদলভুক্ত কয়েকজন ফরাসীকে শ্রীরঙ্গপত্তম এ "স্বাধীনতা-বৃক্ষ" রোপণের অনুমতি দিয়াছিলেন।

টিপুর এই বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব ওয়েলেসলী সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মান্দ্রাজ কাউন্সিলের বিরোধিতা সত্বেও তিনি টিপুর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে প্রস্তুত হইলেন। ওয়েলেসলী নিজামকে অধীনতামূলক মৈত্রী-তে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে টিপুর বিরুদ্ধ দলভুক্ত করিলেন। তিনি টিপুর বিরুদ্ধে মারাঠাদের সহায়তাও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মারাঠারা তদ্রূপ সাড়া না দিলেও ওয়েলেসলী বিজিত টিপুর রাজ্যের কিয়দংশ পেশোয়াকে প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ওয়েলেসলীর যুদ্ধোদ্যম

নিজামের পন্থা অবলম্বন করিয়া টিপু বৃটিশের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইলেই তাহার রাজ্য রক্ষা হইত, কিন্তু তিনি অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন; বিনা যুদ্ধে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন না। টিপু বীরবিক্রমে ইংরেজ সৈন্যদের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু জয়লাভ করিতে পারিলেন না। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষাকল্পে বীরের মত যুদ্ধ করিয়া টিপু প্রাণত্যাগ করিলেন। ইংরেজরা ভারতবর্ষের এক প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর হস্ত নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইল।

যুদ্ধ ও টিপুর পতন

টিপু সুলতানের রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত করা হইল। পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত জেলাগুলি বৃটিশের অধিকারভুক্ত হইল। হায়দ্রাবাদের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি জেলা (চিত্রল দুর্গের কেল্লা ব্যতীত) নিজামকে প্রদত্ত হইল। অবশিষ্ট অংশে মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের এক ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এই নূতন রাজা ইংরেজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন। তাহার রাজ্যে নিজের ব্যয়ে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখিতে হইল। তিনি

মহীশূরের বন্দোবস্ত

ইংরেজকে এক নির্দিষ্ট হারে বাৎসরিক কর প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির হইল। অধিকন্তু রাজ্য শাসন ব্যাপারে কোন অযোগ্যতা প্রদর্শন করিলে এই রাজ্য কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা ইংরেজদের হস্তে রহিল। বেন্টিকের সময়ে কুশাসনের অজুহাতে মহীশূরের রাজাকে পদচ্যুত করিয়া মহীশূরকে প্রত্যক্ষ ইংরেজ শাসনাধীনে আনয়ন করা হয়।) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণের সময়ে পুনরায় মহীশূর ইহার পূর্ব্বতন রাজবংশের উত্তরাধিকারীর হস্তে প্রত্যর্পিত হয়।

ফল

মহীশূর রাজ্যের এই বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজগণ বহুবিধভাবে লাভবান হইল। ভারতবর্ষের সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে কোম্পানীর রাজ্যসীমা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল এবং উত্তর দিক ব্যতীত মহীশূর রাজ্য ইংরেজাধিকৃত স্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিল। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ওয়েলেসলী মার্কুইস পদবী দ্বারা সম্মানিত হইলেন।

নিষ্কলুষ চরিত্র

সৈনিক ও সেনাপতি

কূটনীতি বিশারদ

টিপু সুলতানের চরিত্র ঃ—টিপু ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া তিনি নিষ্কলুষ এবং সমকালীন কলুষিত নৈতিক আবহাওয়ার উর্দ্ধে ছিলেন। শিক্ষার দিক দিয়া তিনি অনগ্রসর ছিলেন না; অনর্গলভাবে ফার্সী, কানাড়ী এবং উর্দ্দু ভাষায় বাক্যালাপ করিতে পারিতেন। স্বয়ং নির্ভীক সৈনিক ও কৌশলী সেনাপতি ছিলেন। কূটনীতিতেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ইংরেজই তাহার একমাত্র শত্রু এবং অন্য কোন ভারতীয় শক্তি নহে, একথা তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং এই শত্রুকে হীনবল করার জন্য শত্রুর বিপক্ষ রাষ্ট্র ফ্রান্সের সহায়তাকামী হইয়াছিলেন। সেই যুগে সুদূর ইউরোপে দুইটি শক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের মাত্রা উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী

কূটনীতিক কার্য্যক্রম স্থির করার মধ্যে টিপুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কাবুলের জামান শাহের সঙ্গেও পত্রালাপ করিয়াছিলেন। টিপু স্বাধীনতাকে অন্য কিছুর বিনিময়ে খর্ব্ব করিতে প্রস্তুত হন নাই বলিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। সমসাময়িক ভারতীয় নরপতিগণ অপেক্ষা টিপু অধিকতর পরিশ্রমী ও কুশলী শাসক ছিলেন।

টিপুর বিরুদ্ধে সমালোচনা

এডোয়ার্ড মুর বা মেজর ডিরোম প্রভৃতি কয়েকজন সমসাময়িক ইংরেজ লেখক মুক্ত কণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাহার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বহু প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিক অন্যায়ভাবে টিপুকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী, উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী, ধর্ম্মান্ধ ও অনুদার বলিয়া মনে করেন। মাঝে মাঝে উগ্রপ্রকৃতির পরিচয় দিলেও তাহা সাধারণতঃ তিনি যাহাদিগকে শত্রু

অধিকাংশই অতিরঞ্জিত

বলিয়া মনে করিতেন তাহাদের প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করিতেন। তিনি স্বভাবতঃ নির্দ্দয় প্রকৃতির ছিলেন না। টিপুর 'শৃঙ্গেরী পত্রাবলী' হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে তিনি ধর্ম্ম

ধর্ম্মীয় উদারতা

সম্বন্ধে অনুদার ছিলেন না। হিন্দুদের শ্রদ্ধা অর্জ্জনের প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। গোঁড়া মুসলমান হইলেও তিনি পাইকারীভাবে হিন্দুদিগকে ধর্ম্মান্তরিতকরণের চেষ্টা করেন নাই।

হায়দর আলির সঙ্গে তুলনা

যে সমস্ত হিন্দুর আনুগত্যের উপর তিনি আস্থাশীল ছিলেন না কেবল তাহাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত হইতে বাধ্য করিতেন। পিতা হায়দর আলির সঙ্গে এক বিষয়ে তাহার পার্থক্য ছিল— রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি পিতার অপেক্ষা কম দূরদর্শিতা ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কারের নামে অনেক সময়ই তিনি অনাবশ্যক পরিবর্ত্তন

স্বদেশপ্রেমিকতা ও ত্রুটী

সাধনে ব্যস্ত হইতেন। কতকটা উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া পরাজয় স্বীকার করা তাহার নিকট অসহ্য বোধ হইত; তজ্জন্য স্বাধীনতা ত্যাগের পরিবর্ত্তে জীবন বিসর্জ্জনই তিনি শ্রেয়ঃ

বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ভারতের অন্য কোন নরপতি টিপুর মত পূর্ব্বাপর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যান নাই।

(৩) ফরাসী প্রভাব দূরীকরণ

বন্দিবাসের যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে ফরাসীদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি একেবারেই ছিল না, কিন্তু ফরাসীরা এই প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা একেবারে জলাঞ্জলি দিতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তাহারা নানা প্রকারে তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফরাসী-ভীতি হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইংরেজকে এই সময় অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। ফরাসীরা নিজাম রাজ্যে, মহীশূরে এবং মারাঠাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রের দরবারে তাহাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। ফরাসীরা ইহাদের সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে এই সকল ভারতীয় শক্তিকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট লুবিন ইংরেজের বিপক্ষে মারাঠাদিগকে উত্তেজিত করার জন্য নানা ফাড়নবিশের সহিত এক সন্ধি করিলেন। ফরাসীরা ভারতে ফরাসী-শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য হায়দর আলির সঙ্গে মৈত্রী একান্ত কাম্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে টিপু সুলতানকে ফরাসীরা পরম সুহৃদ বলিয়া গণ্য করিলেন। নিজাম খর্দ্দার পরাজয়ের জন্য ইংরেজের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করিয়া আত্মরক্ষার জন্য ফরাসী সাহায্য গ্রহণ করিলেন এবং রেমণ্ড নামে ফরাসী সেনানায়কের সহায়তায় এক বৃটিশ বিরোধী সুশিক্ষিত সৈন্যদল গড়িয়া তুলিলেন। সিন্ধিয়া পিরো (Perrow) নামে একজন ফরাসী সেনাধ্যক্ষের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। তাহার দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত চল্লিশ হাজার সৈনিকের এক বাহিনী ইংরেজের পক্ষে বিভীষিকার কারণ হইল।

ইতিমধ্যে ইউরোপে বিদ্রোহী ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজরা ভারতবর্ষস্থিত ফরাসীদের স্থান সমূহ অধিকার করিয়া

লইয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের মিশর অভিযান এবং মিশরে প্রভাব প্রতিষ্ঠার পর ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রতিপত্তি খর্ব্ব করার প্রচেষ্টা ভারতবর্ষস্থিত ইংরেজ নায়কগণের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হইল। ওয়েলেসলী গভর্ণর জেনারেল হইয়া ভারতবর্ষে আগমনের পর ভারতবর্ষ এবং সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে ফরাসী প্রভাব বিনাশের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজামকে অধীনতামূলক মৈত্রী-তে আবদ্ধ করিয়া ফরাসী দ্বারা শিক্ষিত নিজামের সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য করিলেন। ফরাসীদ্বীপ (Isle of France) হইতে যাহাতে ফরাসী রণ-তরী ভারত মহাসাগরে আসিয়া উপদ্রব করিতে না পারে তজ্জন্য ওয়েলেসলী উক্ত দ্বীপে অভিযান প্রেরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি ডাচদের অধিকৃত যবদ্বীপ অধিকারের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছাও পোষণ করিয়াছিলেন এবং ফরাসীরা যাহাতে লোহিত সাগরের পথে ভারত আক্রমণ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে স্যার ডেভিড বেয়ার্ডের নেতৃত্বে লোহিত সাগরে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলী ফরাসীদের প্রভাবাধীন শ্রীরামপুর (দিনেমার অধিকৃত) এবং পর্টুগীজ অধিকৃত গোয়া অধিকার করিয়াছিলেন এবং অ্যামিয়েন্সের সন্ধির পরেও অধিকৃত ভারতবর্ষীয় ফরাসী উপনিবেশ সমূহ প্রত্যর্পণ করেন নাই। ওয়েলেসলীর পরেও ফরাসীরা ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী উপদ্রব সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিল। ১৮১৪-'১৫ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত এই ফরাসীনীতি অনুসৃত হইয়াছিল—তৎপর সমস্ত বন্ধ হইয়া যায়।

(৪) হায়দ্রাবাদ, কর্ণাট, তাঞ্জোর, সুরাট ও অযোধ্যার বন্দোবস্ত

হায়দ্রাবাদ :—১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে খর্দার যুদ্ধে মারাঠাদের হস্তে শোচনীয় পরাজয়ের পর নিজাম ইংরেজদের ঔদাসীন্য নীতিতে বিরক্ত হইয়া স্বীয় সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ফরাসীদের সাহায্যাপেক্ষী হইলেন। ওয়েলেসলী

গভর্ণর জেনারেল হইয়া ভারতবর্ষ তথা হায়দ্রাবাদ হইতে ফরাসী আধিপত্য চিরতরে বিনষ্ট করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে নিজামের পুত্র আলি জা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে বিদ্রোহ দমনে নিজাম ইংরেজের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বৃটিশের অনুরাগী হইলেন। ইংরেজের পক্ষপাতী মন্ত্রী মীর আলমের বিশেষ চেষ্টার ফলে নিজাম ওয়েলেসলী প্রবর্ত্তিত অধীনতামূলক মৈত্রী গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুযায়ী নিজাম নিজব্যয়ে ছয়টি বৃটিশ সৈন্যবাহিনী হায়দ্রাবাদে রাখিতে সম্মত হইলেন, রাজ্যস্থিত সমস্ত অ-বৃটিশ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী বিতাড়িত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং নিজামের পররাষ্ট্র নীতি বৃটিশের দ্বারা পরিচালিত হইবে বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। ফরাসী সেনানায়কের দ্বারা শিক্ষিত নিজামের সেনাদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। নিজাম ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্যতম সহায়ক হইলেন। টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে নিজাম ইংরেজের পক্ষভুক্ত থাকার পুরস্কার স্বরূপ টিপুর রাজ্যের অংশবিশেষ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু বৃটিশ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য উপরোক্ত অঞ্চল অবিলম্বে ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল (১৮০০ খৃঃ)। নিজাম আলি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত হইলে উত্তরাধিকারী সিকন্দর ইংরেজের সঙ্গে অনুরূপ সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণরূপে বৃটিশের আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

নিজাম সর্ব্বপ্রকারে বৃটিশের আনুগত্য স্বীকার করিলেন

অধীনতামূলক মিত্রতার ফলে হায়দ্রাবাদ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু হায়দ্রাবাদের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইল। সর্ব্ববিধ ব্যাপারে অন্য শক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য হায়দ্রাবাদের শাসকবর্গ শাসনের সুব্যবস্থা করিবার সমস্ত উদ্যম হারাইলেন।

ফল

কর্ণাট—ওয়েলেসলীর পররাজ্যগ্রাসী নীতির হস্ত হইতে কর্ণাট আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইল না। কর্ণাটকে প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ ভারতের শাসনাধীন করিবার জন্য ওয়েলেসলী কর্ণাটের নবাব টিপুর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া কর্ণাটের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিলেন। কর্ণাটের নবাব মৃত হইলে তাহার এক দূর আত্মীয়কে নবাব বলিয়া স্বীকার করা হইল এবং এই নূতন নবাবের হস্তে সামান্য ক্ষমতা রাখিয়া সম্পূর্ণ সামরিক ও সাধারণ শাসনব্যবস্থা বৃটিশের পরিচালনাধীনে আনীত হইল। ওয়েলেসলীর এই আচরণ মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে নবাবের বিরুদ্ধে ওয়েলেসলী আনীত অভিযোগ সমূহ নির্ভরযোগ্য নহে। প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করার জন্যই তিনি উক্ত অভিযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ওয়েলেসলী কর্ণাট ইংরেজের শাসনাধীন করিলেন

তাঞ্জোর ও সুরাট—ওয়েলেসলীর আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের হস্ত হইতে তাঞ্জোর ও সুরাট অব্যাহতি পাইল না। মারাঠা রাজ্য তাঞ্জোর শিবাজীর পিতা শাহজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের সুযোগে ওয়েলেসলী তাঞ্জোরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন। তাঞ্জোরের রাজাকে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য করা হইল (১৭৯৯)। বাৎসরিক চল্লিশ হাজার পাউণ্ড পেনশানের বিনিময়ে তাঞ্জোরের রাজা তাঞ্জোরের সম্পূর্ণ শাসনভার ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

সুরাটেরও তাঞ্জোরের অনুরূপ ব্যবস্থা হইল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে হইতে বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদানের বিনিময়ে ইংরেজ সুরাট রক্ষার দায়িত্ব বহন করিয়া আসিতেছিল। ইংরেজকে দেয় উপরোক্ত অর্থ প্রদানে বহুদিন যাবৎ অসমর্থ হওয়ার অপরাধে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সুরাট নবাবের উত্তরাধিকারীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ইংরাজের শাসনাধীনে আসিল। ঐতিহাসিক বেভেরিজ ওয়েলেসলীর এই অপকার্য্যের পশ্চাতে নিছক জবরদস্তি ও অবিচার

ব্যতীত অন্য কিছু উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পান নাই ("The whole proceeding was characterised by tyranny and injustice.")।

অযোধ্যা ঃ—ওয়েলসলীর লুব্ধ দৃষ্টি অযোধ্যার উপরেও নিপতিত হইল। অযোধ্যার নবাব সুদীর্ঘকাল ইংরেজের পরম অনুগত ছিলেন, কিন্তু কোম্পানীর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য অযোধ্যার কিয়দংশ ইংরেজের অধিকারে আনার প্রয়োজন হইল এবং নবাবকে ইংরেজের একান্ত বশংবদ করিয়া রাখার সঙ্কল্প করা হইল। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার জন্য ওয়েলেসলী অযোধ্যার নবাবের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে তাহার দেশীয় সৈন্য কমাইয়া ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। নিস্ফল প্রতিবাদের পর নবাব মান রক্ষার জন্য সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু যখন নবাব জানিতে পারিলেন যে তাহার পুত্রগণ উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে চলিতেছে তখন তিনি পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিলেন। ওয়েলেসলী নবাবের মত পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নবাবকে এক নূতন সর্ত্তে ইংরেজের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিলেন। এই নূতন সর্ত্তে নবাবের রাজ্যে অবস্থিত কোম্পানীর সৈন্য সংখ্যা ও নবাবের দেয় করের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করা হইল। ওয়েলেসলী এতখানি করিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনি নবাবকে এক নূতন সন্ধিতে সম্মত হইতে বাধ্য করিলেন। বাৎসরিক কর প্রদান অপেক্ষা 'অধীন' রাজ্যের কিয়দংশ কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করা সকল দিক হইতে সুবিধাজনক সিদ্ধান্ত করিয়া ওয়েলেসলী নবাবকে গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বর্ত্তী 'দোয়াব', 'নিম্ন দোয়াব' ও রোহিলখণ্ড ইংরেজদের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে অযোধ্যা রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ বৃটিশের অধিকারে আসিল। অতঃপর অযোধ্যা উত্তর দিক ব্যতীত অন্য দিক দিয়া বৃটিশ অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সমস্যা এই সন্ধির ফলে অনেকটা দূরীভূত হইল।

ওয়েলেসলী-র অযোধ্যা-নীতি বহু ঐতিহাসিকের সমালোচনার বিষয়

হইয়াছে। এই সময়ে কাবুলের জামান শাহের দ্বারা হিন্দুস্থান আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, এই আশঙ্কার হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য কোম্পানীর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুদৃঢ় করার প্রয়োজন হইয়াছিল।

অযোধ্যা-নীতির সমালোচনা

ওয়েলেসলী সামরিক প্রয়োজনেই অযোধ্যা সম্বন্ধে উপরোক্ত নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশ্য ওয়েলেসলী স্বয়ং তাহার অযোধ্যা-নীতি অবলম্বনের পশ্চাতে নবাবদের কুশাসন হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার অজুহাত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল যে ইংরেজের হস্তক্ষেপে শাসন ব্যবস্থার কোনই উন্নতি হয় নাই এবং এই প্রকারের অধীন রাষ্ট্রের পক্ষে শাসনের সুব্যবস্থা করাও অসম্ভব। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে নবাবের সঙ্গে ওয়েলেসলীর আচরণ পূর্ব্বাপর অকারণ অসহিষ্ণুতা, রূঢ়তা ও অশোভন ব্যস্ততার মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। একজন অনুগত মিত্রের সঙ্গে ওয়েলেসলীর এই আচরণ মোটেই সমর্থন করা যায় না।

(৫) ইঙ্গ-গুর্খা যুদ্ধ—১৮১৪-'১৬

পলাশী যুদ্ধের অত্যল্পকাল পরে গুর্খা নায়ক পৃথ্বী নারায়ণ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নেপাল উপত্যকা ও কাটামুণ্ডু অধিকার করিয়া নেপালে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ গুর্খারাজ্যের দক্ষিণ সীমা আসিয়া বৃটিশ ভারতের উত্তর সীমান্ত-রেখার সহিত মিলিত হইল। এই সীমানা সুনির্দ্দিষ্ট না থাকায় গুর্খাগণ অনেক সময় ইংরেজ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিত। অবশেষে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

লর্ড হেষ্টিংস স্বয়ং এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং চারিটি বিভিন্ন দিক হইতে যুগপৎ গুর্খারাজ্য আক্রান্ত হয়। গুর্খা সেনাপতি অমর সিংহ থাপা কিছুদিন যুদ্ধ করিবার পর ইংরেজ সেনাপতি অক্টারলোনির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর অক্টারলোনী গুর্খা-রাজধানীর দিকে

অগ্রসর হইলে গুর্খারা সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। সগৌলির সন্ধি অনুসারে গুর্খাগণ তরাই অঞ্চলের উপর দাবি পরিত্যাগ করিল, নেপালের পশ্চিমাঞ্চলের গাড়োয়াল ও কুমায়ুন জেলা ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিল, এবং কাটামুণ্ডুতে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখিতে স্বীকৃত হইল। সগৌলির সন্ধিতে ইংরেজ কেবলমাত্র সিমলা, মুসৌরী, রাণীখেত, আলমোড়া, নাইনিতাল প্রভৃতি পার্ব্বত্য-নিবাসের মালিক হইল তাহা নহে, মধ্য এসিয়ায় যাতায়াতের পক্ষেও তাহার বিশেষ সুবিধা হইল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধিতে সিকিমকে নেপাল প্রদত্ত একটি অঞ্চল অর্পণ করা হইল। এইরূপে ভারতের পূর্ব্বসীমান্ত অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত করা হইল।

(৬) পিণ্ডারী ও পাঠান দস্যু দমন ঃ রাজপুতানা ও মধ্যভারতে আধিপত্য বিস্তার

ভারতের অধিকাংশ নরপতি ক্রমশঃ বৃটিশের সার্ব্বভৌম শক্তি মানিয়া লইল, কিন্তু মধ্য ভারত ও রাজপুতানার অধিকাংশ স্থান পিণ্ডারী ও পাঠান দস্যুদের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিল। উপরন্তু, রাজপুতানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ পারস্পরিক ঈর্ষ্যাকলহে লিপ্ত হইয়া রাজস্থানকে অশান্তির ক্রীড়াভূমিতে পরিণত করিতে লাগিলেন। সমগ্র ভারতে সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাকামী ইংরেজ এই অনাচার ও বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর করিবার জন্য উদ্যোগী হইল। নেপাল যুদ্ধের পর লর্ড হেষ্টিংস এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

পিণ্ডারী যুদ্ধ ১৮১৭-'১৮ ঃ—পিণ্ডারী নামে একদল নিষ্ঠুর দস্যু সম্প্রদায় মধ্য ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়িয়া জনসাধারণের অর্থসম্পদ লুণ্ঠন ও অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের লোক লইয়াই এই দস্যুদল গঠিত ছিল। মারাঠা রাষ্ট্রসমূহ এই দস্যুদলকে যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত করিত বলিয়া ইহারা ইহাদের প্রশ্রয়ে ও রক্ষণাধীনে অত্যন্ত

দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের অবসানে যখন মারাঠা শক্তিবর্গের আর সেনাদল সৃষ্টির প্রয়োজন রহিল না তখন ইহারা সমগ্র মধ্য ও উত্তর ভারত ব্যাপিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিল। পিণ্ডারীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল, কিন্তু তাহারা সহজে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইত না। বিভিন্ন দল হীরু, বুরান চিতু, ওয়াশীল মহম্মদ, আমীর খাঁ, করিম খাঁ ইত্যাদি নেতার অধীনে নানা স্থানে লুণ্ঠনাদি করিত। পিণ্ডারীদের উপদ্রব দমন করিবার পূর্ব্বে হেষ্টিংস দেশীয় রাজাদের পরামর্শ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন। পিণ্ডারীরা যাহাতে কোন দিক দিয়া পলায়ন না করিতে পারে তজ্জন্য হেষ্টিংস উপযুক্ত সেনানায়কের নৈতৃত্বে বিরাট বাহিনী সজ্জিত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে এই দস্যুদলকে বেষ্টন করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই পিণ্ডারী দল পরাজিত ও ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং নেতাদের অধিকাংশই যুদ্ধে নিহত হইল, বা পলায়ন করিল। ইহাদের অন্যতম নায়ক করিম খাঁ ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। তাহাকে যুক্তপ্রদেশে গাওসপুর নামে ক্ষুদ্র একটি রাজ্য দেওয়া হয়। ওয়াশিল মহম্মদ সিন্ধিয়ার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিন্ধিয়া তাহাকে ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বন্দী অবস্থায় ওয়াশিল গাজিপুরে মারা যায়। চিতু পলাতক অবস্থায় আসিরগড়ের অরণ্যে ব্যাঘ্র হস্তে নিহত হয়। সর্ব্বপ্রধান পিণ্ডারী সর্দ্দার আমীর খাঁ পূর্ব্বে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল; তাহাকে টঙ্কের নবাবী দেওয়া হইল। নেতৃত্ব-বিহীন অবস্থায় পিণ্ডারীরা আর উপদ্রব করিতে সাহসী হইল না। মধ্য ভারত এক অশান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

পাঠান দস্যু দমন ঃ—পাঠানরা পিণ্ডারীদের ন্যায় লুণ্ঠনকারী দস্যু-সম্প্রদায় ছিল। তবে ইহাদের দস্যুবৃত্তির মধ্যে পিণ্ডারী অপেক্ষা একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহারা কখনও পিণ্ডারীদের ন্যায় বিচ্ছিন্নভাবে লুঠতরাজ

*অনেকের মতে ইহারা 'পিণ্ড' নামে একপ্রকার উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করিত বলিয়া ইহাদের নাম পিণ্ডারী হইয়াছে।

করিত না। ইহারা সেনাদলের উপযোগী রণসম্ভার লইয়া কোন বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী বা সর্দ্দার শ্রেণীর নিকট উপস্থিত হইত এবং আক্রমণের হুমকী দেখাইয়া কোন সুবিধা বা বিপুল অর্থ আদায় করিত। মহম্মদ শাহ খাঁ এবং আমীর খাঁ-র নেতৃত্বে ইহারা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক সময় ইহারা রাজপুত রাজা বা মারাঠা সর্দ্দারের প্রয়োজনে সামরিক সাহায্য করিত ; বিনিময়ে ইহাদের প্রশ্রয় ও আনুকূল্য লাভ করিত। হেষ্টিংস প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের ক্ষমতা নষ্ট করা অসুবিধাজনক বুঝিয়া ইহাদের নেতাদিগকে হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহ খাঁর মৃত্যুতে আমীর খাঁ ইহাদের একমাত্র নেতা রহিলেন। আমীর খাঁ-র সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার পর আমীর খাঁ টঙ্কের নবাবীর বিনিময়ে দস্যুদলের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন। ইংরেজ ও হোলকার আমীর খাঁকে টঙ্কের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিল। ফলে পাঠান উপদ্রব স্থায়ীভাবে দূরীভূত হইল।

রাজপুতানা ও মধ্যভারতে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তার

লর্ড হেষ্টিংসের সময়ে রাজপুতানার রাজ্যসমূহ ও মধ্যভারতের কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য বৃটিশের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করে। রাজস্থানের রাষ্ট্রসমূহের প্রাচীন শৌর্য্য ও গৌরবের দিন চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। পারস্পরিক ঈর্ষ্যাবিবাদ ব্যতীত মারাঠা, পাঠান ও পিণ্ডারীদের উপদ্রবে রাজস্থান অশান্তির লীলানিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমশঃ যখন ভারতবর্ষের প্রধান শক্তিসমূহ বৃটিশের কর্তৃত্ব মানিয়া লইল : তখন দুর্ব্বল রাজপুত রাষ্ট্রসমূহ বৃটিশের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল।

রাজপুতানার সাহায্যে মোগলরা ভারতে স্বীয় কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মারাঠারা রাজপুত সাহায্যের গুরুত্ব স্বীকার করে নাই

বলিয়া তাহাদের "হিন্দু পাদ-পাদশাহী-র" স্বপ্ন স্বার্থক হইতে পারে নাই। হেষ্টিংস রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বিলাতের কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে রাজপুতানার অধিপতিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে কোটা (১৮১৭), উদয়পুর (১৮১৮), বুঁদি (১৮১৮), কিষণগড়, বিকানীর, জয়পুর, প্রতাপগড়ের রাজ্য সমূহ, যশলমীর ও সিরোহী বৃটিশের সঙ্গে আনুগত্য সর্ত্তে রক্ষামূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ হইল।

ভূপালের নবাবও ইংরেজের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইল; মালব ও বুন্দেলখণ্ডের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ বৃটিশের আনুগত্য স্বীকার করিল। অতঃপর বৃটিশের অনুগত এই সকল রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার ও আভ্যন্তরীণ উন্নতি কার্য্যের জন্য এলফিনষ্টোন, মুনরো, ম্যালকলম্, মেটকাফ্, কর্ণেল টড্ প্রভৃতি সুদক্ষ ইংরেজ কর্ম্মচারী এই সকল রাষ্ট্রে প্রেরিত হইলেন।

লর্ড হেষ্টিংসের কৃতিত্ব:—মোগল সাম্রাজ্যের অবসানের যুগে ভারতবর্ষে যে সকল শক্তি একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দেখা গেল তাহাদের সকলেই পরাস্ত হইয়া একে একে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়াছে এবং শতদ্রু হইতে ব্রহ্মপুত্র এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বৃটিশ প্রভুত্ব সর্ব্বত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'ক্লাইভ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বীজ বপন করেন, ওয়ারেণ হেষ্টিংস বিরোধী শক্তির হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করেন, ওয়েলেসলী সযত্নে ইহাকে বর্দ্ধন ও প্রতিপালন করেন এবং লর্ড হেষ্টিংস (ময়রা) ফসল সংগ্রহ করেন।" দিল্লী, অযোধ্যা, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, কর্ণাটক সুরাট ও তাঞ্জোর ওয়েলেসলীর সাম্রাজ্য নীতির ফলে বৃটিশের কর্তৃত্বাধীনে আসে। লর্ড হেষ্টিংস এই নীতি অনুসরণ করিয়া বৃটিশের আধিপত্য অধিকতর সম্প্রসারিত করেন। তিনি মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন এবং পেশোয়াপদ বিলুপ্ত করেন। তাহারই সময়ে রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের উপর বৃটিশের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড হেষ্টিংস অন্য একটি উল্লেখ-

যোগ্য কার্য্য করেন ; এযাবৎকাল দিল্লীর মোগল বাদশাহের ক্ষমতা নামাবশেষ হইলেও বাহ্যিক একটুখানি মর্য্যাদা অবশিষ্ট ছিল। দ্বিতীয় শাহ আলম প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজের বৃত্তিভোগী হইয়াই ছিলেন, কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় আকবরকে লর্ড হেষ্টিংসের আদেশে তাহার আধিপত্যের অভিনয়-টুকুকেও পরিত্যাগ করিতে হইল। কোম্পানীর অধিকৃত স্থানের উপর তাহার প্রভুত্ব মোটেই রহিল না। বৃটিশ আশ্রিত নিজাম, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত-মারাঠা শক্তি, বা দুর্ব্বল রাজপুতগণের নূতন সার্ব্বভৌম শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হইবার মত সাহস, শৌর্য্য বা ইচ্ছা কাহারও ছিল না। নামতঃ করদ-রাজগণ সকলেই বৃটিশরাজের সমকক্ষ মিত্র, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক বা সামরিক স্বাধীনতা রহিল না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন তখন রণজিৎ সিংহের পাঞ্জাব ব্যতীত একটিও প্রকৃত স্বাধীন রাজ্য অবশিষ্ট ছিল না।

লর্ড ওয়েলেসলীর কৃতিত্ব :—"ওয়েলেসলী ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বৃটিশ শাসকদের অন্যতম। কেবলমাত্র ক্লাইভ, ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও ডালহৌসী-ই তাহার সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারেন, কিন্তু বাস্তবপক্ষে কার্য্যকারিতায় তিনি ইহাদিগকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন"—(রবার্টস)। তিনি যে সময়ে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন ভারতে বৃটিশ শক্তি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্যার জন শোরের নিরপেক্ষ নীতি-র ফল ভারতে বৃটিশ মর্য্যাদা রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকন্তু সেই সময়ে ইউরোপে ইংরেজ-ফরাসী বিরোধ থাকায় ভারতবর্ষেও ফরাসী প্রভাব বিস্তৃত হইবার লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। পেশোয়া, সিন্ধিয়া, হোলকার এবং নিজাম ইহাদের সকলেরই ফরাসী কর্ম্মচারী পরিচালিত শক্তি-শালী সেনাদল ছিল এবং মহীশূরের টিপু সুলতানও ফরাসী শক্তিকে ভারতবর্ষ আক্রমণের জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন। দেশীয় সৈন্যদলে ফরাসী প্রভাব বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বত্র বৃটিশ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ওয়েলেসলী উৎকণ্ঠিত হইয়া

পড়িলেন। কিন্তু শোর অনুসৃত 'নিরপেক্ষ নীতি' দ্বারা ইহা অসম্ভব ছিল। তিনি অধীনতামূলক নীতি প্রবর্ত্তন করিয়া সাম্রাজ্যবাদী কার্য্যক্রম অনুসরণ করিলেন। মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে তাহার অনুসৃত নীতি বৃটিশকে ভারতের প্রধানতম শক্তিতে পরিণত করিল। তিনি মহীশূরের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিলেন, মুসলিম রাষ্ট্র হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যার উপর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন, একে একে তাঞ্জোর, সুরাট ও কর্ণাটের উপর বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, পেশোয়া, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলাকে কোম্পানীর আনুগত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন, দিল্লীর সম্রাটের উপর সিন্ধিয়ার আধিপত্য বিনষ্ট করিলেন এবং তাহাকে অসময়ে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা না হইলে তিনি হোলকারকেও কোম্পানীর বশীভূত করিতে পারিতেন। তাহার অসমাপ্ত কার্য কয়েক বৎসর পর লর্ড হেষ্টিংস সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মোটের উপর তিনি কোম্পানীকে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়াছিলেন এবং বৃটিশ প্রভুত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে সকল ইংরেজ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ওয়েলেসলীর নাম স্মরণযোগ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার, ১৮২৩-'৫৬

আমহার্ষ্ট, ১৮২৩-'২৮।
বেন্টিঙ্ক, ১৮২৮-'৩৫।
মেটকাফ (অস্থায়ী), ১৮৩৫।
অকল্যাণ্ড, ১৮৩৬-'৪২।
এলেনবরা, ১৮৪২-'৪৪।
হার্ডিঞ্জ, ১৮৪৪-'৪৮।
ডালহৌসী, ১৮৪৮-'৫৬।

এই যুগের বৈশিষ্ট্যঃ—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের প্রস্থানের পর হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল। বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহের পর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ভারতের সর্ব্ব-প্রধান শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র হইতে শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত ও উত্তর দক্ষিণে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বৃটিশের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। অতঃপর বৃটিশের প্রথম সমস্যা হইল ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্তিক সীমান্ত-পারের রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত স্থায়ী ভাবে স্থির করা। প্রাক্-বৃটিশ যুগে মোগলদের আমলেও এই দুই সীমান্ত-সমস্যা বর্ত্তমান ছিল এবং এ বিষয়ে কোন স্থায়ী সমাধান হয় নাই। কার্য্যতঃ বৃটিশের ভারতে সার্ব্বভৌম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই দুই সীমান্তিক সমস্যা বৃটিশ সিংহকে কম-বেগ দেয় নাই। বৃটিশকে পশ্চিম-সীমান্তে শিখ, সিন্ধি, পাঠান, বেলুচী এবং খাইবার-পারের আফগানদের সঙ্গে এবং পূর্ব্ব সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র পারের

(১) দুই সীমান্তিক সমস্যা

আসামী ও বর্মীদের সঙ্গে রীতিমত শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। এই যুগের দ্বিতীয় সমস্যা—বৃটিশ-ভারতের পর-রাষ্ট্রনীতি। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতে বৃটিশের পররাষ্ট্র-নীতি প্রধানতঃ ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভীতিকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইত। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়া খণ্ডে ফরাসী আধিপত্য স্থাপনের আশা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। অতঃপর ফরাসীর স্থলে রুশগণ প্রবল হইয়া উঠিল; এই নবশক্তির অভ্যুদয়ে ইংরেজরা প্রমাদ গণিল। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রুশিয়ার প্রভাব ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে লাগিল। আফগানিস্থানে প্রভাব বিস্তার করিয়া রাশিয়া ভারতে বৃটিশের আধিপত্য শঙ্কাজনক করিয়া তুলিল। এই রুশভীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এশিয়াখণ্ডে রাশিয়ার সম্প্রসারণনীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উদ্যোগ আয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই যুগের বৃটিশের পর-রাষ্ট্র-নীতি পরিচালিত হইয়াছিল।

(২) পররাষ্ট্র-নীতি—ফরাসী ভীতির স্থলে রুশ-ভীতি

ভারতে পূর্ব্ব-সীমান্তিক যুদ্ধ

(ক) **প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ, ১৮২৪-'২৬ :**—সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ইংরেজদের বাণিজ্য-সম্পর্ক চলিতেছিল। ক্রমশঃ ভারতবর্ষে ইংরেজের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায় ও চট্টগ্রামের দক্ষিণে আরাকান, পেগু ও টেনাসেরিমে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ট হওয়ার কারণ ঘটিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলম্প্রা নামে একজন বর্মী-নায়ক ব্রহ্মদেশে একটি প্রবল রাজবংশ স্থাপন করেন। তাহার উত্তরাধিকারী বোডাপায়া-র সময়ে (১৭৭৯-১৮১৯) আরাকান (১৭৮৪) মণিপুর ও সুর্ম্মা উপত্যকা ব্রহ্মের পদানত হইল। ব্রহ্মের এই অগ্রগমনে শঙ্কিত হইয়া ইংরেজ

গণ ব্রহ্মের সঙ্গে সংঘর্ষ নিবারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্মরাজের দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মরাজ ইংরেজের মৈত্রী অগ্রাহ্য করিয়া আসাম ও আরাকানের যে সকল বিদ্রোহী বৃটিশ আশ্রয়ে বাস করিতেছিল তাহাদিগকে তাহার হস্তে সমর্পণের দাবি করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু রাজ্যজয়ে উৎফুল্ল হইয়া ব্রহ্মরাজ ইংরেজকে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে বলিলেন, কেননা মধ্যযুগে ইহারা ব্রহ্মদেশের করদরাজ্য ছিল। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট ব্রহ্মের দাবী উপেক্ষা করিলেন। ১৮২১-'২২ খৃষ্টাব্দে আসাম ব্রহ্মের পদানত হইল। অতঃপর ব্রহ্ম বৃটিশ অধিকারভুক্ত চট্টগ্রামের অংশ বিশেষ অধিকার করিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। লর্ড আমহার্ষ্ট এই ঘটনায় ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন।

এই যুদ্ধের প্রথমদিকে ব্রহ্মদেশের সৈনিকগণ বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। ইংরেজগণ প্রথমে আসাম হইতে বর্ম্মীদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইল কিন্তু শীঘ্রই সেনাপতি বন্দুলা-র নেতৃত্বে ব্রহ্ম-সৈন্যদল ইংরেজকে রামু নামক স্থানে পরাজিত করিল। ইতিমধ্যে একদল বৃটিশ সৈন্য রেঙ্গুণে অবতরণ করিল এবং রেঙ্গুণ অধিকার করিল। রেঙ্গুণ পুনরুদ্ধারের জন্য বন্দুলা আহূত হইলেন, কিন্তু ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ডোনাবিউ নামক স্থানে ইংরেজদের নিকট পরাজিত ও নিহত হইলেন। বন্দুলার মৃত্যুতে ব্রহ্মের প্রতিরোধ শক্তি দুর্ব্বল হইল। ইংরেজসৈন্য প্রোম অধিকার করিয়া ব্রহ্ম রাজধানীর ষাট মাইল দূরে ইয়ান্দাবু নামক স্থানে উপস্থিত হইল। ব্রহ্মরাজ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলে ইয়ান্দাবুতে সন্ধি হইল। এই সন্ধি অনুযায়ী ব্রহ্মরাজ এক কোটি টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইলেন, ব্রহ্মের রাজধানী আভাতে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখিবার ব্যবস্থা হইল এবং ব্রহ্মরাজের সহিত কোম্পানীর একটি বাণিজ্য সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ব্রহ্মরাজ আরাকান ও টেনাসেরিম ইংরেজের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন এবং

আসাম, কাছাড় ও জয়ন্তীতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইলেন; অধিকন্তু ব্রহ্মরাজ মণিপুর রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন।

ফলাফল ঃ—প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে ইংরেজের যথেষ্ট সুবিধা হইল। ব্রহ্মদেশের উপকূলের অধিকাংশ অঞ্চল ইংরেজের অধিকারে আসিল এবং আসাম, কাছাড় ও মণিপুর প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজের রক্ষণাধীন রাজ্যে পরিণত হইল। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ পরিচালনায় আমহার্ষ্ট বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাহার অবিবেচনার ফলে প্রথম অবস্থায় ইংরেজকে যথেষ্ট ক্ষতি ও দুর্ণাম ভোগ করিতে হইয়াছে। মাদ্রাজের গভর্ণর স্যার টমাস মুনরো বিশেষ তৎপরতার সহিত হস্তক্ষেপ না করিলে এই যুদ্ধের ফল বৃটিশের প্রতিকূল হইতে পারিত। ব্রহ্ম-সৈন্যগণ পরিণামে পরাজিত হইলেও তাহারা রণক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল।

ব্রহ্মে আধিপত্য

ব্রহ্মযুদ্ধের প্রথম দিকে ইংরেজের আপাতপরাজয়ের ফলে ভারতবর্ষে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। ভরতপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হইলে ইংরেজের সম্মতিক্রমে তাহার নাবালক পুত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। মৃতরাজার ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জ্জনসাল রাজকুমারের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া নিজেই সিংহাসন দাবি করেন। দুর্জ্জনসাল হয়তো মনে করিয়াছিলেন বৃটিশ শাসনের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্য তিনি এইরূপ অন্যায় দাবি করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। আমহার্ষ্ট বৃটিশের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য দুর্জ্জনসালকে শাস্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। লর্ড কম্বারমিয়ার-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হইল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক ভরতপুর দুর্গ অধিকার করিতে যাইয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু লর্ড কম্বারমিয়ার এই দুর্গ অধিকার করিলেন। দুর্জ্জনসাল নির্ব্বাসিত

প্রথমদিকে পরাজয়ের ফলে চাঞ্চল্য

(ক) ভরতপুর অধিকার

হইলেন। বারাকপুরস্থ দেশীয় সিপাহীরা এই সময়ে বিদ্রোহ করিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই তাহা দমন করা হয়।

(খ) **দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ** ঃ—প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্মযুদ্ধের দ্বারা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমান্তের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় নাই। ইহার জন্য নূতন করিয়া যুদ্ধের প্রয়োজন হইল।

ব্রহ্মদেশের নূতন রাজা থারাবাডি (১৮৩৭-'৪৫) ইয়ান্দাবুর সন্ধির সর্ত্ত সমূহ প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিলেন; উপরন্তু রাজধানী আভা-তে অবস্থিত বৃটিশ রেসিডেণ্টকে যথোপযুক্ত সমাদর প্রদর্শন না করায় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রেসিডেন্সি বন্ধ করিয়া দিতে হইল। ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ উপকূলস্থ বৃটিশ বণিকগণও রেঙ্গুণের গভর্ণরের হস্তে অপমানিত হইতেছিল। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য গভর্ণর জেনারেল ডালহৌসী বৃটিশ বণিকদের ক্ষতিপূরণ ও রেঙ্গুণের গভর্ণরের অপসারণ দাবি করিয়া কমোডোর ল্যাম্বার্টের নেতৃত্বে একটি রণতরী ব্রহ্মরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মরাজ যুদ্ধ এড়াইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন এবং রেঙ্গুণের গভর্ণরকেও পদচ্যুত করিলেন। কিন্তু কমোডোর ল্যাম্বার্ট ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রেঙ্গুণ বন্দর অবরোধ করিয়া ব্রহ্মরাজের একটি তরী অধিকার করিলেন। ল্যাম্বার্টের এই কার্য্যে উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ডালহৌসী ল্যাম্বার্টের কার্য্য অনুমোদন করিয়া যাহাতে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের মত অপ্রস্তুত অবস্থার সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য পর্য্যাপ্ত উদ্যোগ আয়োজন করিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে একদল ইংরাজ সৈন্য রেঙ্গুণে উপস্থিত হইল এবং রেঙ্গুণের বিখ্যাত পেগোডা, মার্ত্তাবান, বেসিন ও প্রোম অধিকার করিল। ব্রহ্ম-গভর্ণমেণ্ট যথাবিধি সন্ধি করিতে অস্বীকৃত হইলে ডালহৌসী এক ঘোষণাপত্র দ্বারা পেগু বৃটিশের রাজ্যভুক্ত করিয়া হইলেন। পেগু অধিকারভুক্ত হওয়ার ফলে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-সীমানা সালুইন নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বঙ্গোপসাগরের কূলে সর্ব্বত্র বৃটিশের আধিপত্য সম্প্রসারিত হয়। উত্তর ব্রহ্মদেশ স্বাধীন রহিল।

ইংরেজ ও শিখজাতি-পঞ্চনদে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তার

শিখজাতি ও রণজিৎ সিংহ ঃ—শিখজাতির স্বাধীনতা আন্দোলন শিখনেতা বান্দার নেতৃত্বে ১৭০৮ হইতে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুসৃত হইয়াছিল। মোগলদের হস্তে বান্দার মৃত্যু ও তাহার অনুগামীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার হওয়া সত্ত্বেও শিখজাতি নিরুদ্যম হইল না। মোগল শক্তির পতনের যুগে নাদির শাহ ও আমেদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমণের ফলে পঞ্চনদে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল শিখগণ সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিল। শিখগণ আবদালীর আক্রমণ হইতে পাঞ্জাব রক্ষা করিতে সক্ষম হইল। আবদালীর প্রস্থানের পর শিখরা লাহোর পুনরধিকার করিল এবং ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আবদালীর দুর্ব্বল উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে আবদালী-বিজিত ভারতীয় অঞ্চল সমূহ কাড়িয়া লইল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে শিখ-আধিপত্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে শাহরানপুর হইতে আটক এবং উত্তর দক্ষিণে কাংড়া-জম্মু হইতে মূলতান পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। এইরূপে শিখদের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা সফল হইলে তাহারা ভাঙ্গি, কাহ্নাইয়া, সুকেরচরিয়া, নকাই, ফৈজ্জুল্লাপুরিয়া, আহ্‌লুয়ালিয়া, রামগরহিয়া, দালেওয়ালিয়া, কারোরাসিংঘিয়া, নিশানওয়ালা, শহীদ, নিহাঙ্গ এবং ফুলকিয়া প্রভৃতি দ্বাদশটি 'মিসিল' বা দলে বিভক্ত ইইল। প্রত্যেক দলের নায়ক এক একটি রাজ্যখণ্ড শাসন করিতেন। এই 'মিসিল' গুলির মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য বা জাতীয়

—"শিখগুরুর তালিকা"—

নানক, ১৫৩৮ [মৃত্যু]।
অঙ্গদ, ১৫৩৮-'৫২।
অমরদাস, ১৫৫২-'৭৪।
রামদাস, ১৫৭৪-'৮১।
অর্জ্জুন, ১৫৮১-১৬০৬।
হরগোবিন্দ, ১৬০৬-'৪৫।
হর রায়, ১৬৪৫-'৬১।
হরকিষণ, ১৬৬১-'৬৪।
তেগ বাহাদুর, ১৬৬৪-'৭৫।
গুরুগোবিন্দ, ১৬৭৫-১৭০৮।
[দশম ও শেষ গুরু]
বান্দা, ১৭০৮-'১৬ [শিখ নেতা]।

অধিকারভুক্ত আটক অধিকার করিলেন। পলাতক আফগান-রাজ শাহ সুজা তাহার আশ্রয়প্রার্থী হইলে তাহার নিকট হইতে জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর হস্তগত করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ-এ মুলতান, ১৮১৯ খৃঃ-এ কাশ্মীর ও ১৮২৩ খৃঃ-এ পেশোয়ার তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ তাহার সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক সংহতি রক্ষা করার জন্য সিন্ধু দখল করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কেননা, সিন্ধু ও পাঞ্জাব উভয় রাজ্যই সিন্ধু নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। কিন্তু ইংরেজরা আপত্তি করায় তাহার আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইতে পারে নাই। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কাবুলের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোম্পানী এবং শাহ সুজার সঙ্গে রণজিৎ সিংহের এক সন্ধি হয়। প্রথম আফগান যুদ্ধ এই সন্ধির পরিণতি। প্রথম আফগান যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয় (১৮৩৯ খৃঃ)।

রণজিৎ সিংহের চরিত্র ও কৃতিত্ব

রণজিৎ সিংহ আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। রণজিৎ সিংহ সুপুরুষ ছিলেন না। বসন্তরোগে তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহার আকৃতি উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। "তাহার ভগবদ্ভক্তি অসীম ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাদিগকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন এবং দানানুশীলনে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ভগবানের কৃপায় তাহার সাফল্য আসিয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং নিজেকে ও শিখজাতিকে সমবেতভাবে 'খালসা' বা গুরু গোবিন্দের সাধারণতন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন।"—(কানিংহাম)।

কৃতিত্ব

রাষ্ট্র-শাসনের অপূর্ব্ব প্রতিভা রণজিৎ সিংহের জন্মস্বত্বে লব্ধ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি এই যে তিনি বিশৃঙ্খল শিখজাতিকে স্বীয় শাসনগুণে এক সংহত রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আনিয়া নূতন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সূচনা

করেন। বৃটিশের নিকট বাধাপ্রাপ্ত না হইলে তাহার Pan-Sikhism বা 'অখিল-শিখরাষ্ট্র' স্থাপনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে পারিত। তিনি শুধু শিখজাতিকে যে একরাষ্ট্রীয় রাজতন্ত্রের প্রজায় পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা নহে, অধিকন্তু তিনি সাহসী শিখগণকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা প্রদান করিয়া এমন দুর্দ্ধর্ষ 'খালসা' দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহা স্ববশে আনিতে বৃটিশ-সিংহের বিলক্ষণ বেশ পাইতে হইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ স্বয়ং এই সামরিক শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হন এবং এই কার্য্যের জন্য বহু ইউরোপীয় সেনানায়কের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। বিদেশী দ্বারা শিক্ষিত হইলেও 'খালসা' সৈন্যদলের জাতীয়ভাব মোটেই নষ্ট হয় নাই এবং এই বিষয়ে রণজিৎ সিংহের প্রখর দৃষ্টি ছিল।

(ক) জাতীয়তার ভিত্তিতে শিখ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

(খ) দুর্দ্ধর্ষ সামরিক শক্তি সৃষ্টি

রণজিৎ সিংহের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা বৃটিশের দ্বারা প্রতিহত হইলেও তাহার পরাক্রম ও শাসনদণ্ড পরিচালনার খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং বহু বিদেশী পর্য্যটক তাহার রাজ্য পরিদর্শন ও পরিভ্রমণ করিয়া তাহার অসামান্য রণ-প্রতিভা ও রাজনীতিকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ভিক্টর জ্যাকোয়েমণ্ট নামে একজন ফরাসী পর্য্যটক তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"An extraordinary man—a Bonaparte in miniature." একক প্রচেষ্টা ও শক্তিবলে বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করিলেও রণজিৎ সিংহের হস্ত কখনও অকারণ নররক্তে রঞ্জিত হয় নাই। তাহাকে বহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহার স্বভাবের মধ্যে নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা কোমলতাই বেশী ছিল এবং তিনি পরাজিত শত্রুর প্রতি সর্ব্বদাই সদ্বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। এই সম্বন্ধে Baron Carl Von Hugel নামে একজন জার্ম্মাণ পর্য্যটক তাহার রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া বলিয়া

বিদেশী পর্য্যটকদের প্রশংসা

সংহতির বিশেষ অভাব ছিল। শিখগণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সাময়িকভাবে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সেই সাধারণ শত্রু অন্তর্হিত হওয়ার পরই তাহারা পুনরায় পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইল। পরস্পর বিবদমান শিখশক্তিকে যিনি ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি প্রবল রাষ্ট্রীয় শক্তিতে পরিণত করেন তিনি একজন 'মিসিল' নায়কের পুত্র রণজিৎ সিংহ।

রণজিৎ সিংহ (১৭৮০—১৮৩৯) :—১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সুকেরচরিয়া মিসিলের নায়ক মহাসিংহের পুত্র রণজিৎ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দ্বাদশ

প্রথম জীবন

বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন এবং কয়েক বৎসর পরে পৈতৃক ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের শাসনভার প্রাপ্ত হন। শিবাজী এবং আকবরের ন্যায় রণজিৎ সিংহও নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু অসাধারণ রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রতিভাবলে তিনি একটি বিশাল রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হন। আহম্মদ শাহ আবদালীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাহার পৌত্র জামান শাহ কাবুল ও পাঞ্জাবে পিতামহের অধিকার প্রাপ্ত হন। রণজিৎ সিংহ তাহাকে সাহায্য করিলে তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন এবং লাহোরের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পাঞ্জাবে তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি চলিতেছিল। নূতন সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার ইহাই সর্ব্বোত্তম সুযোগ বুঝিতে পারিয়া রণজিৎ সিংহ প্রথমে

ক্ষমতা বৃদ্ধি

আফগান প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন এবং শতদ্রু নদীর উত্তরতীরস্থ (Trans-Sutlej) শিখ 'মিসিল'-দের মধ্যে বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া হোলকার রণজিৎ সিংহের শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু রণজিৎ সিংহ তাহাকে প্রত্যাখান করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। পরিশেষে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে পাঞ্জাবের উপর হোলকারের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না বলিয়া স্থির হইল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা অধিকার

করিলেন। শতদ্রুর দক্ষিণস্থ (Cis-Sutlej) শিখ-নায়কগণ ইহাতে ভীত হইয়া রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বৃটিশের শরণাপন্ন হন।

লর্ড মিণ্টো ঔদাসীন্য নীতির পক্ষপাতী হইলেও পাঞ্জাবে বৃটিশ প্রভাব বিস্তারের সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে ফরাসী-আক্রমণের আতঙ্ক কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করিয়াছিল। পাঞ্জাবে বৃটিশ-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ফরাসীদের ভারত আক্রমণ অসম্ভব হইবে অধিকন্তু শতদ্রুর দক্ষিণস্থ শিখ রাজ্য সমূহ বৃটিশ আশ্রিত হইলে রণজিৎ সিংহের রাজ্য-প্রসারী মনোবৃত্তিও বাধা প্রাপ্ত হইবে এই স্থির করিয়া লর্ড মিণ্টো রণজিৎ সিংহের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্য ইচ্ছুক হইলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা রণজিৎ সিংহের সঙ্গে কোম্পানীর মৈত্রী স্থাপিত হইল। এই সন্ধি অনুযায়ী রণজিৎ সিংহের রাজ্য-সীমা শতদ্রু নদীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইল। শতদ্রুর দক্ষিণ-তীরের রাষ্ট্র ইংরেজের রক্ষণাধীনে রহিল। যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে কোম্পানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সন্ধি পরিণামে শিখ জাতির ঐক্যের পথে অন্তরায় হইল—শিখ জাতি দ্বিধাবিভক্ত হইল। একপক্ষ বৃটিশ সাহায্যের প্রত্যাশী হইয়া রহিল, অন্যপক্ষ রণজিৎ সিংহের রাজ্যভুক্ত হইল। ("A tragedy of Sikh militant nationalism and the success of the Cis-Sutlej states with the aid of the British Government marked the disruption of the great creation of Guru Govind Sing.") পূর্ব্বদিকে রাজ্য বিস্তারের আশা এইভাবে প্রতিহত হইলে রণজিৎ সিংহ উত্তরে, উত্তর-পশ্চিমে এবং পশ্চিম দিকে রাজ্যপ্রসারে মনোযোগী হইলেন। ১৮০৯ হইতে ১৮১১ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া তিনি গুর্খাদের হস্ত হইতে কাংড়া কাড়িয়া লইলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আফগান

অমৃতসহরের সন্ধি, ১৮০৯

ফল

গিয়াছেন—"Never perhaps was so large an empire founded by one man with so little criminality. এক-নায়ক রাষ্ট্র হইলেও তিনি শাসন ব্যবস্থায় অতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

বৃটিশের প্রতাপের সম্যক পরিচয় উপলব্ধি করিয়া রণজিৎ সিংহ যে বৃটিশের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিলেন ইহাতে বৃটিশ ঐতিহাসিকগণ রণজিৎ সিংহের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। হায়দর আলি বা টিপু সুলতান ইহার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করেন। অনেক সমালোচকের মতে এই সন্ধিতে রণজিৎ সিংহের নিভীকতা ও সুদৃঢ় রাজনীতি জ্ঞানের অভাব সূচিত হইয়াছে। "সব লাল হো যায়েগা"—তাহার এই উক্তিতেই বোঝা যায় তিনি বৃটিশ শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্যে ধরিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং শিখরাষ্ট্র স্থাপন করিলেন, অথচ বৃটিশ আধিপত্য স্থায়ীভাবে প্রতিহত করার জন্য কোন প্রতিবিধানের চেষ্টাই তিনি করিয়া গেলেন না। ইহাতে তাহার বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের অভাবই প্রমাণিত হয়।

(ক) প্রথম শিখ যুদ্ধ, ১৮৪৫-'৪৬

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। পর পর কয়েকজন শিখরাষ্ট্রের অধিপতি বলিয়া ঘোষিত হইলেন, কিন্তু স্থায়ীভাবে কেহই গদিতে অবস্থান করিতে পারিলেন না—আভ্যন্তরীণ গোলযোগে সকলেই পদচ্যুত হইলেন। পরিশেষে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রণজিতের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে পিতৃসিংহাসনে স্থাপিত করা হয় এবং রাণী ঝিন্দন তাহার অভিভাবিকা নিযুক্ত হন। গোলযোগের মধ্যে 'খালসা' সৈন্যদল প্রবল হইয়া পড়ে এবং রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা ইহাদের হস্তগত হয়। রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গ রাষ্ট্রশাসনে অক্ষম হইয়া খালসা পঞ্চায়েতের উপর সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। সৈন্যদল রাষ্ট্রশক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িল। লাহোর দরবারের অমাত্যগণ ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার

উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে এই অশান্ত সৈন্যদলের উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় ইহাদিগকে বৃটিশ রাজ্য আক্রমণে উৎসাহিত করা। কারণ, যদি যুদ্ধে ইহারা হয় তাহা হইলে ইহারা বিনষ্ট হইবে, আর যদি বিজয়ী হয় তাহা হইলে নূতন রাজ্যজয়ের আনন্দে ইহাদের দুর্দ্দমনীয় রণ-স্পৃহা নিবৃত্ত হইবে। সুতরাং প্রথম শিখ যুদ্ধের প্রারম্ভের পূর্ব্বে শিখনেতাদের মধ্যে আন্তরিকতা ও আগ্রহের অভাব ছিল। ইংরেজ অপেক্ষা শিখসৈন্য উৎকৃষ্ট থাকিলেও কোন একক পরিচালনার অভাবে তাহাদিগকে পরাজয় বরণ করিতে হইল।

কিন্তু শিখগণ যে কেবল লাহোর দরবারের প্ররোচনাতেই তাহাদের প্রবল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল তাহা নহে। ইংরাজদের কয়েকটি আচরণের ফলে তাহাদের মনে ধারণা হইয়াছিল ইংরেজরা শিখদের স্বাধীনতা হরণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমতঃ, ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ শতদ্রু নদীর উপর সেতু নির্ম্মানের জন্য বোম্বাইতে নৌকা তৈয়ার করিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ, মুলতানের দিকে অভিযান করার জন্য নববিজিত সিন্ধুদেশে একদল সৈন্য প্রস্তুত হইয়াছিল; তৃতীয়তঃ, উত্তর পশ্চিম প্রান্তের দুর্গ সমূহে দলে দলে ইংরেজ সৈন্যের সমাবেশ হইতেছিল। যে যুগে ইংরেজগণ পররাজ্যগ্রাসী নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন সেই যুগে উপরোক্ত আচরণের ফলে শিখদের চঞ্চল হইবার সঙ্গত কারণ ছিল। খালসা সৈন্য ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর শতদ্রু নদী অতিক্রম করিলে প্রথম শিখযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুদকী (১৮৪৫), ফিরোজশাহ (১৮৪৫), আলিওয়াল ও সোব্রাও (১৮৪৬) এই চারিটি বড় যুদ্ধের পরে প্রথম শিখ যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

মুদকী (**১৮৪৫ খৃঃ**) ঃ—স্যার হিউ গাফের নায়কত্বে ইংরেজগণ শিখ সৈন্যকে মুদকীতে বাধা দেয়। এই সংগ্রামে শিখগণ অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে কিন্তু তাহাদের সেনাপতি লালসিংহের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই

শিখদের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু হতাহত হয় ইংরেজপক্ষে দুইজন প্রসিদ্ধ সেনানায়ক নিহত হয়।

ফিরোজ শাহ (১৮৪৫ খৃঃ) ঃ—মুদকীর যুদ্ধের আটদিন পরে, বৃটিশ সৈন্য ফিরোজশা-তে শিখদের পরিখা-বেষ্টিত সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করিল। শিখরা এই যুদ্ধেও অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল এবং প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে ইংরেজের অবস্থা শঙ্কাজনক করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধেও মুদকীর পুনরাবৃত্তি হইল। শিখসেনাপতি তেজসিংহ যুদ্ধের মাঝখানে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। শিখসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া শতদ্রু নদীর পরপারে পশ্চাদপসরণ করিল। এই যুদ্ধেও উভয় পক্ষের হতাহতের তালিকা কম হয় নাই; ইংরেজ পক্ষে ২০৩ জন অফিসার সহ ৬৯৪ জন নিহত ও ১,৭২১ জন আহত, আর শিখদের ৮,০০০ লোক হতাহত হইল ও ৭৩টি কামান নষ্ট হইল।

আলিওয়াল ও সোব্রাওঁ (১৮৪৬ খৃঃ) ঃ—শিখরা পুনরায় শতদ্রু অতিক্রম করিয়া রণজুর সিংহ মজিথিয়ার নেতৃত্বে লুধিয়ানায় বৃটিশ সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করিল। প্রথমতঃ ইংরেজ সেনাপতি স্যার হ্যারি স্মিথ বুড্ডিওয়ালে শিখদের সহিত এক খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরে অধিক সৈন্য সাহায্যে আলিওয়াল নামক স্থানে 'খালসা সৈন্যকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইলেন। শিখ সৈন্যগণ এই যুদ্ধে ৬৭টি কামান শত্রু হস্তে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় শতদ্রুর অপর তীরে পশ্চাৎগমন করিল। মূল শিখবাহিনী সোব্রাওঁ নামক স্থানে এক সুরক্ষিত গড়ে অবস্থান করিতেছিল। এই যুদ্ধে শিখগণ জয়-লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল এবং যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিল। এই যুদ্ধেও শ্যামসিংহ ব্যতীত অন্যান্য শিখ সেনাপতিদের নিষ্ক্রিয়তা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য ইংরেজ জয়ী হইল। পলাতক শিখসৈন্যগণ বৃটিশের হস্তে নির্দ্দয়ভাবে নিহত হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে ৩২০ জন নিহত ও ২,০৮৩ জন আহত হইল।

যুদ্ধাবসানে বিজয়ী বৃটিশ বাহিনী নৌ-সেতুর উপর দিয়া শতদ্রু অতিক্রম করিল। অতঃপর ইংরেজরা লাহোরে বসিয়া সন্ধির সর্ত্ত গ্রহণ করিতে শিখগণকে বাধ্য করিল। এই সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী শতদ্রুর বামতীরবর্ত্তী সমগ্র অঞ্চল এবং শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী জালন্ধর দোয়াব বৃটিশকে সমর্পণ করিতে হইল। শিখ সৈন্যের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইল এবং বৃটিশের সম্মতি ব্যতীত শিখ রাজ্যে কোন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে না বা বর্ত্তমান রাজ্যসীমা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না বলিয়া স্থির হইল। নাবালক দলীপ সিংহকে রাজা, রাণী ঝিন্দনকে তাহার অভিভাবিকা ও লাল সিংহকে প্রধান অমাত্য বলিয়া স্বীকার করা হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে অর্থ দাবি করা হইল লাহোর রাজ-কোষে অর্থাভাববশতঃ লাহোর দরবারের অন্যতম সর্দ্দার গুলাব সিংহের নিকট কাশ্মীর ও জম্মু এক মিলিয়ন ষ্টার্লিংয়ে বিক্রয় করার বন্দোবস্ত হইল। ইংরেজরা নূতন এক সন্ধিতে গুলাব সিংহকে কাশ্মীর ও জম্মুর রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। অল্পকাল পরে গুলাব সিংহের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের সূচনায় অমাত্য লালসিংহকে দায়ী করিয়া তাহাকে পদচ্যুত করা হইল এবং সন্ধিসর্ত্তকে এমনভাবে সংশোধিত করা হইল যাহাতে পাঞ্জাবের উপর বৃটিশের আধিপত্য অধিকতর দৃঢ় হয়। পাঞ্জাবে একদল বৃটিশ সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা হইল এবং এই সৈন্যের ব্যয়ভার শিখদিগকে বহন করিতে হইল। আট জন শিখ সর্দ্দারকে লইয়া গঠিত একটি অমাত্য সভার উপর রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করা হইল এবং বৃটিশ রেসিডেণ্ট কার্য্যতঃ শিখ রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন এবং পাঞ্জাব প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইল।

সন্ধি

(খ) দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ, (১৮৪৮-'৪৯ খৃঃ) ও পাঞ্জাব অধিকার

প্রথম শিখ যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাবে বৃটিশ আধিপত্য স্থাপিত হইল, কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় ও সমরকুশল শিখগণ এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

প্রথম শিখযুদ্ধে পরাজিত হইলেও প্রকৃত শক্তি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিতে পারিল না। তাহারা মনে করিল, স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণই তাহাদের শোচনীয় পরাজয়ের জন্য দায়ী। সুতরাং পুনরায় ইংরেজের সঙ্গে শিখদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে ইংরেজগণ বৃটিশ রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাজমাতা ঝিন্দনকে নির্ব্বাসিত করিয়া শিখদের অসন্তোষ আরও তীব্র করিয়া তুলিলেন। চতুর্দ্দিকে যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত তখন মুলতানের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সমরানল প্রজ্জলিত হইল।

কারণ

মুলতানের শাসনকর্ত্তা দেওয়ান মূলরাজ-এর সঙ্গে লাহোর দরবারের মনান্তর উপস্থিত হওয়ায় মূলরাজ পদত্যাগ করেন। লাহোর দরবার তাহার পদত্যাগ মঞ্জুর করিয়া সর্দ্দার খাঁন সিংহকে তাহার স্থলে নিযুক্ত করেন। এই নূতন শাসনকর্ত্তা ভ্যান্স এ্যাগ্নিউ ও এণ্ডারসন নামক দুইজন বৃটিশ কর্ম্মচারী সহ মুলতানে প্রেরিত হইলে বৃটিশ কর্ম্মচারীদ্বয় নিহত হয়। এই ব্যাপারে মূলরাজ সংশ্লিষ্ট আছেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মূলরাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের জন্য প্রস্তুত হন। বিদ্রোহী মূলরাজকে দমন করিবার জন্য লাহোর কর্ত্তৃপক্ষ শেরসিংহ নামক একজন শিখ সর্দ্দারকে প্রেরণ করেন। শেরসিংহ সসৈন্যে মূলরাজের পক্ষে যোগদান করিলেন। মহারাণী ঝিন্দনের প্ররোচনায় শিখজাতির মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি জলিয়া উঠিল এবং শিখ সর্দ্দার-গণ সকলেই মূলরাজের পক্ষে যোগদান করিলেন। এইরূপে সমগ্র পাঞ্জাব ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পেশোয়ার প্রত্যর্পিত হইবার আশায় প্রলুব্ধ হইয়া আফগানগণ শিখদের পক্ষে যোগদান করিল।

মূলরাজের সঙ্গে বিরোধ

মূলতানের বিদ্রোহ

গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী স্পষ্ট ভাষায় শিখ জাতির বিদ্রোহী আচরণের উত্তর দিলেন (১০ অক্টোবর, ১৮৪৮)—"Unwarned by precedent, uninfluenced by example, the Sikh nation has called for war, and they shall have it with a vengeance." শিখদের সমর স্পৃহা ভাল করিয়া মিটাইবার জন্য লর্ড গাফের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। এই সৈন্য দল রাভি নদী অতিক্রম করিয়া রামনগর নামক স্থানে শিখ সেনাপতি রাম-সিংহের সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই স্থানে কোন ফলাফল স্থির না হওয়ায় পুনরায় চিলিয়ানওয়ালা নামক স্থানে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয় (১৬ই জানুয়ারী, ১৮৪৯)। এই যুদ্ধে শিখগণ অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং ইংরেজ পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি হয়—শিখগণ এই যুদ্ধে একপ্রকার জয়লাভ করে বলিলেই হয়। ইংরেজ পক্ষে ৬০২ জন নিহত ১৬৫১ জন আহত, চারিটি কামান ও তিনটী পতাকা নষ্ট হইল। এই যুদ্ধের শোচনীয় সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ লর্ড গাফ-কে স্থানান্তরিত করিয়া তৎস্থলে স্যার চার্লস নেপিয়ারকে সেনাপতি নিযুক্ত করার আদেশ প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে ইংরেজরা মুলতানে সাফল্য লাভ করে এবং ইংরেজ কর্তৃক অবরুদ্ধ মুলতান আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া অধীনতা স্বীকার করে (২২ জানুয়ারী, ১৮৪৯)। ধৃত মুলরাজ বিচারে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন—নির্ব্বাসিত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। মুলতানে সাফল্য লাভের জন্য ইংরেজের অনেক সুবিধা হয় এবং নেপিয়ারের আগমনের পূর্ব্বেই লর্ড গাফ পাঞ্জাবের গুজরাট সহরে শিখদিগকে পুনরায় আক্রমণ করেন (২১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৯)। গুজরাটের যুদ্ধেও শিখগণ যথেষ্ট পরাক্রম প্রদর্শন করে, কিন্তু উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইল না। এইবার

যুদ্ধ-ঘোষণা

চিলিয়ানওয়ালা, ১৮৪৯

গুজরাটের যুদ্ধ

শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং তাহাদের প্রতিরোধ ক্ষমতাও চিরতরে বিনষ্ট হইল। শিরসিংহ, ছত্রসিংহ প্রভৃতি শিখ সর্দ্দারগণ ১২ই মার্চ্চ অস্ত্রত্যাগ করিয়া ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিল। আফগানগণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে খাইবারের পরপারে বিতাড়িত করা হইল।

লর্ড ডালহৌসী তাঁহার ক্যাবিনেট সভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের দায়িত্বে সম্পূর্ণ শিখ রাজ্য বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন এবং এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। পাঞ্জাব ইংরাজ-অধিকারভুক্ত হইল। হতভাগ্য দলীপ সিংহ স্বয়ং এই সব ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিলেও তাঁহাকে উহার ফল ভোগ করিতে হইল। তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং তাহার জন্য বাৎসরিক পাঁচলক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। তিনি মাতা ঝিন্দন সহ বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঝিন্দন ইংলণ্ডে মারা যান। দলীপসিংহ প্রথমে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিলাতে অবস্থান করেন, পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় পূর্ব্বধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং এই স্থানে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

পাঞ্জাব শাসনের ভার হেনরী লরেন্স, জন লরেন্স এডোয়ার্ডস, নিকলসন, রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি কয়েকজন সুদক্ষ বৃটিশ কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পিত হয়। ইহাদের সুশাসনে এবং সুদক্ষ পরিচালনায় শিখজাতি সত্বর পরাধীনতার গ্লানি বিস্মৃত হইয়া বৃটিশের পরম অনুগত হয়। শিখদের সহায়তার বলেই ইংরেজ দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধে জয়লাভ করিতে এবং সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছিল।

(৩) আফগানিস্থান ও ইংরাজ

(ক) আহম্মদ শাহ আবদালী, জামান শাহ ও দোস্ত মহম্মদ ঃ—পলাশী বিজয়ের পর হইতে বৃটিশ শক্তি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল শক্তির অবসানের যুগে আফগানগণ

ভারতবর্ষে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল এবং তৃতীয় পানিপথে আফগান মারাঠা সংঘর্ষ ঐ প্রচেষ্টারই অন্যতম বিকাশ মাত্র। ইংরেজরা সর্ব্বদাই এই ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছিল যে তৎপরে তাহাদের অধিকারভুক্ত বঙ্গদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত অযোধ্যা-রাজ্যকে নিশ্চয়ই আহম্মদ শাহ আবদালী অধিকার করিবার চেষ্টা করিবে। অযোধ্যা আফগান অধিকৃত হইলেই বঙ্গদেশ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। কিন্তু বৃটিশের সৌভাগ্যবশতঃ আবদালী পানিপথ বিজয়ের পর আর পূর্ব্বদিকে অগ্রসর না হইয়াই আফগানিস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আবদালীর মৃত্যুর পরে আভ্যন্তরীণ অসুবিধার জন্য আফগানরা দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় ছিল—কিন্তু তাহার পৌত্র জামান শাহের রাজত্বের সময়ে পুনরায় আফগানভীতি আরম্ভ হইল।

আবদালী

জামান শাহ

জামান শাহ স্বরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লাহোর অভিমুখে অভিযান করিলেন এবং নাদির শাহ ও আবদালীর ন্যায় হিন্দুস্থান বিজয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। স্যার জন শোর ও ওয়েলেসলী-র সময়ে জামান শাহের ভারত অভিযানের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রত্যাসন্ন হইয়া উঠিল। অবশ্য ইহার যথেষ্ট কারণও ছিল। টীপু সুলতান পত্রযোগে জামান শাহকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। অযোধ্যার নবাব ওয়াজির আলিও বাংলার অসন্তুষ্ট নবাব নাসির-উল-মুলুক বৃটিশ শক্তি উচ্ছেদের জন্য জামান শাহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। ওয়েলেসলী জামান শাহকে প্রতিরোধ করার জন্য অযোধ্যায় পর্য্যাপ্ত সেনাসমাবেশ করিলেন। সেই সময়ে পারস্যের সঙ্গে আফগানিস্থানের মনোমালিন্য চলিতেছিল। পারস্যের চাপে যাহাতে জামান শাহ স্বদেশ রক্ষার জন্য সম্ভাবিত ভারত আক্রমণে প্রতিনিবৃত্ত হয় তজ্জন্য ওয়েলেসলী পারস্যে দুইবার দূত প্রেরণ করিলেন। এই দৌত্য-কার্য্যের সুফল ফলিয়াছিল। পারস্যের চাপে ভীত জামান শাহ লাহোর হইতেই পেশোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন, সঙ্কল্পিত ভারত

আক্রমণ আর হইয়া উঠিল না। ইংরেজরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। জামান শাহের অবশিষ্ট জীবন অত্যন্ত দুঃখময় হইয়াছিল। প্রতিপক্ষ বারকৃজাই দলের বিরুদ্ধতার ফলে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন, তাহার দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। জামান শাহ বোখারা, হিরাট হইয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরিশেষে লুধিয়ানায় বৃটিশের আশ্রিত ও পেন্সন ভোগী হইয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন।

দোস্ত মহম্মদঃ—জামান শাহের পদচ্যুতির পর আফগানিস্থানে পুনরায় গোলযোগ উপস্থিত হয়। আবদালীর অন্যতম পৌত্র শাহ সুজা এই গোলযোগের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য আফগানিস্থানের আমীর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও পদচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়া লুধিয়ানায় ইংরেজের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। অতঃপর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদ নামে একজন সুচতুর ব্যক্তি আমীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। দোস্ত মহম্মদ সুদক্ষ ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। সিংহাসনারোহনের পর তিনি চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ শিখ নেতা রণজিৎ সিংহের অধিকারে পেশোয়ার থাকায় এবং কাবুলের সিংহাসনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটিশের আশ্রয়ে থাকার ফলে তিনি তাহার নিরাপত্তা সম্বন্ধে মোটেই নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছিলেন না। এই অবস্থায় দোস্ত মহম্মদ প্রথমতঃ ইংরেজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন; কিন্তু অন্য পক্ষের আগ্রহের অভাব দেখিয়া অগত্যা তিনি রাশিয়ার দ্বারস্থ হইলেন।

(খ) প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ, ১৮৩৯-'৪২ঃ—এই যুদ্ধের মূল কারণ ইংরেজদের রুশ আতঙ্ক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে রাশিয়া মধ্য এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যের দরবারে রাশিয়ার প্রতিপত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার প্ররোচনায় পারস্য হিরাট আক্রমণ করে। হিরাট আফগানিস্থানের অধিকারভুক্ত ছিল এবং কোন প্রকারে হিরাট পারস্যের আক্রমণ

হইতে রক্ষিত হয়। হিরাট রাশিয়ার প্রভাবান্বিত ও পারস্যের করতলগত হইলে বৃটিশের ভারত-সাম্রাজ্য বিশেষ বিপদাপন্ন হইত। কেননা, হিরাটের মধ্য দিয়া রাশিয়ার পক্ষে ভারত আক্রমণ অত্যন্ত সুবিধাজনক হইয়া পড়ে।

এই সময়ে লর্ড পামারষ্টোন ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। তিনি রুশিয়ার এই অগ্রসর নীতিতে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়েন। রুশিয়ার অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করার জন্য আফগানিস্থানের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা অত্যাবশ্যক মনে করিয়া তিনি লর্ড অকল্যাণ্ডকে তদনুযায়ী প্রতিবিধান করার জন্য পরামর্শ দেন। অকল্যাণ্ড আফগানিস্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে সখ্য-স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলেকজাণ্ডার বার্ণেস-কে দূতরূপে কাবুলে প্রেরণ করেন। দোস্ত মহম্মদ ইতিপূর্ব্বে বৃটিশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্য সাদর হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন এবং অগত্যাপক্ষে রুশিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বৃটিশের অত্যধিক আগ্রহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া দোস্ত মহম্মদ মৈত্রীবন্ধনের বিনিময়ে বৃটিশের নিকট এই দাবি করিলেন যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে আমীরের হস্তে পেশোয়ার প্রত্যর্পণের জন্য শিখনেতা রণজিৎ সিংহের উপর চাপ দিতে হইবে। লর্ড অকল্যাণ্ড শিখরাজের বিরাগভাজন হইতে সম্মত না হওয়ায় ইঙ্গ-আফগান মৈত্রী-র আশা তিরোহিত হইল। দোস্ত মহম্মদ রুশ দূত ভিক্টোভিচকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদকে অপসারিত করিয়া তৎস্থলে বৃটিশের আজ্ঞাবহ কোন ব্যক্তিকে আমীর করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যখন দোস্ত মহম্মদ রণজিৎ সিংহের নিকট হইতে পেশোয়ার পুনরুদ্ধারের জন্য বৃটিশের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন তখন পর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বৃটিশ নীতির পরিপন্থী বলিয়া অকল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদকে নিরুৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রয়োজনবোধে পর রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না।

রুশ প্রতিরোধ নীতি

দোস্ত মহম্মদের সর্ত্ত

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর শাহ-সুজা বৃটিশের বৃত্তিভোগী হইয়া লুধিয়ানায় বাস করিতেছিলেন ; তাহাকে আমীর নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া স্থির হইল। শাহ-সুজা, রণজিৎ সিংহ এবং ইংরেজ এই ত্রি-পক্ষ দোস্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন (১৮৩৮ খৃঃ)।

যুদ্ধারম্ভ ঃ—অতঃপর মিত্রশক্তি আফগানিস্থান আক্রমণ করিল এবং বিনা আয়াসেই কান্দাহার, গজনী ও কাবুল অধিকার করিল। দোস্ত মহম্মদ ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন ; তাহাকে বন্দীরূপে কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। শাহ সুজা বৃটিশের সাহায্যে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। স্বাধীনতাপ্রিয় আফগানগণ বিদেশীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত শাহ সুজাকে প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিল না। কাবুলে অবস্থিত ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারীদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার তাহাদের মনে ইংরেজ-বিদ্বেষের সৃষ্টি করিল। ইত্যবস্থায় শাহ সুজা সহ ইংরেজদের আফগানিস্থান হইতে সসম্মানে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। পরিবর্ত্তে কাবুলস্থিত বৃটিশ অমাত্য ম্যাক্‌নাটন তাহার অবলম্বিত নীতিকে দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া রহিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড আরও দুইটি মারাত্মক ত্রুটি করিলেন। প্রথমতঃ, বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য প্রায় এলফিনষ্টোনকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাবুলস্থিত বৃটিশ সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন ; দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ সৈন্যদলকে কাবুলের বিখ্যাত দুর্গ বালা হিসারে অবস্থান করিতে না দিয়া তথায় শাহ সুজাকে বাস করিবার অনুমতি দিলেন। বৃটিশ সৈন্যদলকে সহর হইতে দূরে এক অরক্ষিত ও অসুবিধাজনক স্থানে থাকিতে হইল। অধিকন্তু রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে অশান্তি উপস্থিত হওয়ায় ইংরেজরা শিখ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে আফগানগণ দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁ-র অধীনে বিদ্রোহী হইল। ২রা নভেম্বর হঠাৎ কাবুলের এক ক্ষিপ্ত জনতা লেফ্‌টেনাণ্ট আলেকজাণ্ডার বার্ণেস-কে তাহার গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া

হত্যা করিল। বৃটিশ রাজপুরুষগণ এই দারুণ বিপদের সময়ে সাহস ও কার্য্য-কুশলতার পরিচয় দিতে পারিল না। সেনাপতি এলফিনষ্টোনের নিষ্ক্রিয়তার জন্য বিদ্রোহীরা ইংরেজ সৈন্যদের রসদপত্রাদি লুণ্ঠন করার সুযোগ পাইল। বৃটিশের কাবুলস্থিত অমাত্য ম্যাক্‌নাটন দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁ-র সহিত এক অপমানজনক সন্ধি করিয়া বসিলেন; ইংরেজগণকে অবিলম্বে কাবুল পরিত্যাগ করিতে হইবে, দোস্ত মহম্মদকে আমীর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং ইংরেজকে শাহ সুজার পক্ষ ত্যাগ করিতে হইবে —ইহাই ছিল এই সন্ধির মর্ম্ম। কিন্তু অনতিবিলম্বে ম্যাক্‌নাটন আকবর খাঁ-র সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া বিদ্রোহীদের চক্রান্তে নিহত হন। ম্যাক্‌নাটনের স্থলাভিষিক্ত মেজর পটিঞ্জার আফগানদের সঙ্গে কোনও প্রকার আপোষরফা না করিয়া বলপূর্ব্বক কাবুল দুর্গ বালা-হিসার অধিকারপূর্ব্বক ভারত হইতে সাহায্য না আসা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত এলফিনষ্টোন উপরোক্ত সন্ধির সর্ত্তকেই মানিয়া লইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র আফগানদের করে অর্পণ করিয়া একরূপ নিরস্ত্র হইয়াই দুর্গম প্রান্তরের মধ্য দিয়া দুর্জ্জয় শীতকালে ভারত-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অত্যধিক শৈত্যে ও আফগানদের আক্রমণে প্রত্যাবর্ত্তনকারী সৈন্যদলের সংখ্যা ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। মোট ১৬,৫০০ সৈন্যের মধ্যে আকবর খাঁ-র হস্তে প্রতিভূ স্বরূপ আটক ১২০ জন ও মাত্র ডাঃ ব্রাইডন নামক আর একজন ব্যতীত পথে সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ডাঃ ব্রাইডন এই শোচনীয় সংবাদ বহন করিয়া জালালাবাদে উপস্থিত হন। লর্ড অকল্যাণ্ড এই দুর্ঘটনাকে লঘু করিয়া প্রকাশ করিলেও সত্য ঘটনা প্রকাশিত হইলে তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইল এবং লর্ড এলেনবরা পরবর্ত্তী গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন।

এলেনবরা (১৮৪২-'৪৪)

আফগান যুদ্ধে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত নিরুৎসাহিত হইয়া আর

অধিক অগ্রসর হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। লর্ড এলেনবরা ধ্বংসাবশিষ্ট বৃটিশ সৈন্যের আফগানিস্থান পরিত্যাগ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু পরাজয়ের কলঙ্ক কালিমা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা অনেকের মনঃপূত হইল না। অবশেষে ইংরেজদের মান রক্ষার জন্য এলেনবরা কান্দাহার হইতে নট ও পেশোয়ার হইতে পোলককে গজনী ও কাবুল হইয়া খাইবার পাশের পথে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিলেন। বৃটিশ বাহিনী গজনী নগর এবং দুর্গ বিধ্বস্ত করিল। তোপের মুখে কাবুলের বিখ্যাত বাজার উড়াইয়া দেওয়া হইল এবং বালা হিসারের উপর বৃটিশ পতাকা উড্ডীন করা হইল। ইংরেজ বন্দিগণ উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল এবং বৃটিশ বাহিনী বিজয়গর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় বৃটিশ বাহিনী সুলতান মাহমুদ সোমনাথ লুণ্ঠন করিয়া মন্দিরের যে কপাট লইয়া যান তাহা আফগানিস্থান হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে এবং ইহা দ্বারা ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের উপর অনুষ্ঠিত অপমানের প্রতিশোধ লওয়া হইল বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

প্রথম আফগান যুদ্ধের উপসংহার যতই আড়ম্বরপূর্ণ ঘোষণার মধ্য দিয়া পরিসমাপ্ত হউক না কেন ইহাতে অকারণ অর্থ ও প্রচুর লোকক্ষয় ব্যতীত ইংরেজের কোন লাভ হইল না। শাহ সুজা ইতিপূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিলেন। দোস্ত মহম্মদ পুনর্ব্বার কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং আ-মৃত্যু (১৮৬৩) ইংরেজের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্নই রহিলেন। সোমনাথের মন্দিরের কল্পিত কপাট লইয়া যথেষ্ট বাগাড়ম্বর হইলেও পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে উহা সত্য সত্যই উক্ত মন্দিরের কপাট ছিল না। আনয়নের ফলে হিন্দুরাও ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইল না—অকারণ মুসলমানদের মনে তিক্ততার সৃষ্টি হইল মাত্র।

(৪) সিন্ধুদেশ অধিকার, ১৮৪৩

সিন্ধুদেশ তালপুরের আমীর বা মীরগণের দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে শাসিত হইতেছিল। ইহা নামতঃ আফগানিস্থানের অধীন হইলেও

বাস্তবপক্ষে ইহা একপ্রকার স্বাধীন রাজ্যই ছিল। তালপুরের সর্দ্দারগণের উল্লেখযোগ্য তিনটি শাখা হায়দ্রাবাদ, খয়েরপুর এবং মীরপুর এই তিন স্থানে অবস্থান করিত।

বহুদিন হইতে বৃটিশ সরকারের লুব্ধ দৃষ্টি সিন্ধুদেশের উপর নিপতিত হইয়াছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ এক বাণিজ্য মিশন সিন্ধুদেশে প্রেরণ করে কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না। ১৮০৯ ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে আমীরদিগের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সিন্ধুদেশ হইতে ফরাসী-প্রভাব বিলুপ্ত করিয়া দেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার বার্ণেস যখন সিন্ধুনদী হইয়া লাহোরে গমন করেন তখন হইতে ইংরেজের নিকট সিন্ধু দেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব অনুভূত হয়। তদবধি সিন্ধুদেশ বৃটিশের অধিকারভুক্ত হওয়ার বিষয় কেবল সময়সাপেক্ষ হইয়া থাকে। সিন্ধু-দেশের প্রতিবেশী শিখদের এই দেশের উপর লোলুপ দৃষ্টি বরাবরই ছিল—কিন্তু ইংরেজের প্রতিবন্ধকতার জন্যই সিন্ধু রণজিৎ সিংহের কুক্ষিগত হইতে পারে নাই। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক রণজিৎ সিংহের সিন্ধু বাঁটোয়ারার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আমীরগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজের সঙ্গে এক সন্ধিতে আবদ্ধ হন। তাহাতে স্থির হয় যে হিন্দুস্থানের ব্যবসায়িগণ সিন্ধু-দেশে অবাধে বাণিজ্য করিতে পারিবে, কিন্তু রণতরী বা সামরিক দ্রব্যাদি সিন্ধু জনপদের মধ্য দিয়া প্রেরিত হইতে পারিবে না। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রণজিৎ সিংহ সিন্ধুদেশ অধিকার করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজের চেষ্টায় শিখগ্রাস হইতে এইবারও সিন্ধুদেশ নিষ্কৃতি পাইল। কিন্তু শিখগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া সিন্ধুদেশ বৃটিশ সিংহের কবলে পড়িল। উপরোক্ত রক্ষা কার্য্যের মূল্যস্বরূপ লর্ড অকল্যাণ্ডের সময়ে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশকে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখিতে হইল। স্পষ্টতঃ সিন্ধুদেশ ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইবার পথ প্রশস্ত হইল।

প্রথম আফগান যুদ্ধের সময়ে ইংরেজগণ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি সর্ত্ত ভঙ্গ

করিয়া সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া আফগানিস্থানে সৈন্য প্রেরণ করিতে ইতস্ততঃ করিল না। আমীরদের প্রতিবাদ নিস্ফল হইল। অতঃপর লর্ড অকল্যাণ্ড আমীরদের নিকট এক মোটা অর্থের দাবি·করিলেন। কারণস্বরূপ অকল্যাণ্ড এই যুক্তি দেখাইলেন যে বৃটিশের প্রচেষ্টার জন্যই সিন্ধুদেশ আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমীরকে দেয় অর্থভার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে—সেই প্রচেষ্টার মূল্যস্বরূপ এই দাবি করা হইল। অথচ প্রকৃত ঘটনা এই, আমীররা গত ত্রিশ বৎসর নির্ব্বাসিত শাহ সুজাকে কোনরূপ অর্থ প্রদান করে নাই—স্বয়ং শাহ সুজাও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আমীরদিগকে ইহার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। আমীরদের সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই অর্থ তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বের সন্ধি ভঙ্গ করিয়া এক নূতন সন্ধির প্রবর্ত্তন করা হয়; তাহাতে সিন্ধু দেশকে স্পষ্টরূপেই বৃটিশের রক্ষণাধীনে আনয়ন করা হইল এবং তথায় একদল ইংরেজ সৈন্য রাখার ব্যয়স্বরূপ আমীরগণকে বাৎসরিক তিনলক্ষ দিতে বাধ্য করা হইল।

ইহা অপেক্ষা অধিক দুরদৃষ্ট সিন্ধুদেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আফগান যুদ্ধের সময় সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া বৃটিশ সৈন্য চলাচল করাতেও আমীররা প্রতিবাদ করে নাই—বরঞ্চ সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করিয়াছিল। এত আনুগত্য সত্ত্বেও আমীরগণ বৃটিশের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয়। এই সময়ে মেজর আউটরামের স্থলে স্যার চার্লস নেপিয়ারকে পূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা দিয়া সিন্ধুদেশে প্রেরণ করা হয়।

সিন্ধুদেশে নেপিয়ার

নেপিয়ার সিন্ধুদেশ অধিকার করার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার পক্ষে অজুহাত সৃষ্টির অসুবিধা হইল না। আমীরগণের বিরুদ্ধে এক কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন করিয়া নেপিয়ার আমীরগণকে সিন্ধুদেশের কতকাংশ বৃটিশের হস্তে অর্পণ করিবার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন এবং এই আদেশ প্রতিপালন করার জন্য বিলম্ব না করিয়া তিনি উপরোক্ত স্থান

বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। অধিকন্তু কোন প্রকার যুদ্ধ-ঘোষণা ব্যতীতই তিনি ইমামগড়ের বিখ্যাত দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন (১৮৪৩)। স্যার চার্ল স নেপিয়ারের উদ্ধত ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হইয়া বেলুচি-যোদ্ধাগণ ইংরেজ রেসিডেন্সী আক্রমণ করিল (১৮৪৩)। তখন উভয়পক্ষে রীতিমত যুদ্ধ হইল। মিয়ানী ও দাবো নামক দুই স্থানের দুইটি যুদ্ধে বেলুচগণ ভীষণভাবে পরাজিত হয়। মনের উল্লাসে নেপিয়ার গভর্ণর জেনারেল এলেনবরো-র নিকট এক সংক্ষিপ্ত বার্ত্তায় রণজয়ের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন—"Peccavi", i.e., "I have Sind." আমীরগণ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইল এবং সিন্ধুদেশ বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভু ক্ত হইল। নেপিয়ার কৃত কর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ সত্তর হাজার পাউণ্ড হস্তগত করিতে দ্বিধা করিলেন না।

সিন্ধুদেশ জয়

সিন্ধু দেশ অধিকার সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেল এলেনবরো ও নেপিয়ারের আচরণ যে অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয়েই সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য লইয়া প্রথম হইতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং বারংবার সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া অত্যন্ত অন্যায়ভাবে বৃটিশের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছেন। নৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়া বিচার করিলেও ইহা সমর্থনের অযোগ্য হইয়া পড়ে—"If the Afghan episode is the most disastrous in our annals, that of Sind is morally even less excusable."—(Innes). এই দুষ্কর্ম্মের কর্ত্তা নেপিয়ারও স্বয়ং স্বকৃত কর্ম্মের নৈতিক-দুষ্টতা সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—"We have no right to seize Sind, yet we shall do so, and a very advantageous, useful, humane piece of rascality it will be." আশ্চর্য্যের বিষয় এই কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গ সিন্ধু অধিকার সমর্থন করিতে না পারিলেও সিন্ধুদেশের স্বাধীনতা পুনর্বহাল করার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। বরঞ্চ নেপিয়ারই সিন্ধুদেশের প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

সমালোচনা

(৫) ইংরেজ ও ক্ষুদ্র দেশীয় রাষ্ট্রসমূহ, ১৭৭৪—১৮৫৮

(ক) প্রথম যুগ, ১৭৭৪-১৮২৩ :—মোগল সাম্রাজ্যের অবসানে যখন ভারতবর্ষ হইতে কেন্দ্রীয় শক্তি অপসৃত হইল তখন মোগল সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ভারতে বহু ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ দেশীয় রাজ্য স্বাধীন সত্তা লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয়ে এই সকল দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে বৃটিশের নীতি নির্দ্ধারণের প্রয়োজন হইল। এই নীতি রাজ্য ভেদে বিভিন্ন গভর্ণর জেনারেলের ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল।

দেশীয়-রাজ্য নীতি (ক) ওয়ারেণ হেষ্টিংস-এর আমল

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে মারাঠা ও মহীশূরের সুলতানের শক্তি সামর্থ্য ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল সমূহের নিরাপত্তার বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সুতরাং ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়াস করিয়াছিলেন এবং বৃটিশ অধিকারের চারিদিকে রক্ষা-প্রাকার সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। মোটামুটি দেশায় রাজ্য সম্বন্ধে ইহাই ছিল তাহার নীতি, যদিও বারাণসীর চৈৎসিংহ, অযোধ্যার বেগম বা রামপুরের নবাবের সঙ্গে তাহার আচরণের নৈতিকতা সমর্থনের অযোগ্য ছিল।

(খ) ওয়েলেসলীর আমল

ওয়েলেসলীর সময় হইতে বৃটিশের দেশীয়-রাজ্য নীতি স্বতন্ত্র ভাবে অনুসৃত হইতে লাগিল। ওয়েলেসলী ও তাহার পরবর্ত্তিগণ এই মনোভাব লইয়া দেশীয় রাজ্য নীতি পরিচালনায় অগ্রসর হইয়াছেন যে সমগ্র ভারতের উপর বৃটিশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পরিণামে অবশ্যম্ভাবী। ওয়েলেসলীর পরিকল্পিত বশ্যতামূলক নীতির দ্বারা কার্য্যতঃ কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের উপর বৃটিশের সার্ব্বভৌমত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল রাজ্যের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণই ছিল এবং একমাত্র মহীশূর ব্যতীত সকল রাজ্যের সঙ্গে ওয়েলেসলী

সম-অধিকারের সর্ত্তে সন্ধি করিয়াছিলেন। ওয়েলেসলীর অবলম্বিত এই আভ্যন্তরীণ শাসনের স্বাধীনতা দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে কল্যাণকর হয় নাই। আভ্যন্তরীণ পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলেও দেশরক্ষার ব্যাপারে ইহাদিগকে বৃটিশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকার জন্য দ্বৈধ শাসনের যে কুফল বাংলায় হইয়াছিল তাহাই এই সকল রাজ্যে ফলিতে আরম্ভ করিল। অযোধ্যা, কর্ণাট, তাঞ্জোর এই শ্রেণীর রাজ্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(গ) লর্ড হেষ্টিংসের আমল

লর্ড হেষ্টিংসই প্রথমে দেশীয়-রাজ্য নীতিতে বৃটিশের সর্ব্বাঙ্গীণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। দেশীয় রাজাদের সহিত সন্ধি-সর্ত্তে পূর্ব্বে যে পারস্পরিক সাহায্য ও সৌহার্দ্দ্যের কথা ছিল হেষ্টিংস তৎপরিবর্ত্তে "অধীনতামূলক সহযোগিতার" প্রবর্ত্তন করেন এবং দেশীয় রাজগণের সন্ধি বা বিগ্রহ করা প্রভৃতি স্বাধীন অধিকার সমূহকে বৃটিশের করে সমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। বাহ্যতঃ এই সকল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকিত কিন্তু কার্য্যতঃ বৃটিশ রেসিডেণ্ট নানা প্রকারে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহাদিগকে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাটুকু হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিত। অবশ্য লর্ড হেষ্টিংস দেশীয় রাজ্য বৃটিশের অধিকারভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

(খ) **দ্বিতীয় যুগ, ১৮২৩-১৮৫৮**ঃ—লর্ড হেষ্টিংস ও সিপাহী বিদ্রোহের অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে বৃটিশের দেশীয় রাজ্যনীতি পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে পরিচালিত হইতে থাকে। দেশীয় রাজ্যে অবস্থিত রেসিডেণ্টগণ উহাদের আন্তঃ-পরিচালন ব্যবস্থায় অনবরত হস্তক্ষেপ করিয়া স্পষ্টতঃ উহাদের উপর বৃটিশের আধিপত্য প্রয়োগ করিলে লাগিল। এতদ্ব্যতীত অতঃপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট 'কবলীকৃত নীতি'ও ক্রমশঃ গ্রহণ করিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টর সভা কবলীকৃত নীতির উপর বিশেষ জোর দিতে লাগিল এবং লর্ড ডালহৌসীর সময়ে ইহা বিশেষভাবে কার্য্যে পরিণত করা হইল। বাণিজ্য-দ্রব্যের গতিবিধি ও বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের সুযোগ সুবিধার জন্যই

বিশেষ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের উপর বৃটিশ সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল।

বেণ্টিঙ্ক দেশীয়-রাজ্য নীতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকার নির্দ্দেশ লইয়াই ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তিনি এই নীতির বিপরীত পন্থা অনুসরণ করিলেন এবং বিলাত হইতেও এই ব্যাপারে সমর্থন লাভ করিলেন। কুশাসনের অভিযোগে মহীশূরের নরপতি রাজা কৃষ্ণ উদয়ারকে পেন্সন দিয়া তিনি তাহার রাজ্য গ্রহণ করিলেন। কাছাড়ের শেষ নরপতির বংশ বিলুপ্ত হওয়ায় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কাছাড় বৃটিশের অধিকারভুক্ত হইল। একই অভিযোগে জয়ন্তিয়ার শাসনভার গ্রহণ করা হইল। কুর্গের নরপতি বীররাজেন্দ্র উদয়ার প্রজাপীড়ন করিতেন বলিয়া প্রজাপুঞ্জের অনুরোধে কুর্গ-কে বৃটিশ শাসনাধীনে আনয়ন করা হইল। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড আফগান-যুদ্ধ লইয়া বিব্রত থাকার জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার সময়েও বৃটিশের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধি পোষণের অভিযোগে মান্দ্রাজের কারনূল রাজ্য বৃটিশের অধিকারভুক্ত করা হয়।

বেণ্টিঙ্ক

মহীশূর, কাছাড়, কুর্গ ও জয়ন্তিয়া অধিকারভুক্ত

পরবর্ত্তী গভর্ণর জেনারেল এলেনবরো-র সময় উল্লেখযোগ্য দেশীয় রাজ্য গোয়ালিয়রে বৃটিশের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের পর দৌলতরাও সিন্ধিয়া শাসিত গোয়ালিয়র শতদ্রুর দক্ষিণে সর্ব্বাপেক্ষা সামরিক শক্তি-সম্পন্ন রাষ্ট্র ছিল। দৌলত রাও-এর মৃত্যু (১৮২৭)-র পর তাহার জনৈক আত্মীয় জনকজীরাও গোয়ালিয়রের গদিতে উপবিষ্ট হইলে চারিদিকে নূতন রাজার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিপক্ষের চক্রান্ত আরম্ভ হয়। নিঃসন্তান জনকজী মৃত হইলে (১৮৪৩ খৃঃ) গোয়ালিয়রের আভ্যন্তরীণ অশান্তি চরম অবস্থায় উপনীত হয়। জয়াজী রাও নামে এক নাবালক

এলেনবরো

গোয়ালিয়রে বিদ্রোহ

সিন্ধিয়া বলিয়া ঘোষিত হইল—এলেনবরো মৃত রাজার মাতুল কৃষ্ণরাও কদমকে অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু মৃত রাজার বিধবা স্ত্রী তাহাকে অপছন্দ করিয়া তাহার মনোনীত এক ব্যক্তিকে অভিভাবক নিযুক্ত করার উদ্যোগ করিলেন। এই ব্যাপারে গোয়ালিয়রে অশান্তির সৃষ্টি হইল এবং গোয়ালিয়রের সুশিক্ষিত চল্লিশ সহস্র সৈন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। এলেনবরো গোয়ালিয়ারের আভ্যন্তরীণ বিরোধে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সিন্ধিয়ার সৈন্য-দল যদি পার্শ্ববর্ত্তী শিখ রাষ্ট্রের সত্তর হাজার সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ভারতে বৃটিশ আধিপত্য বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এলেনবরো শান্তিপূর্ণ উপায়ে গোয়ালিয়র বিরোধের সমাধানে ব্যর্থ হইয়া গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। গোয়ালিয়রের সৈন্য-দল মহারাজপুর ও পানিয়ারের যুদ্ধে পরাস্ত হইল। গোয়ালিয়র এক প্রকার আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইল। একজন বৃটিশ রেসিডেন্টের অধীনে নাবালক রাজার জন্য অভিভাবক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। সৈন্য-দলের সংখ্যা মাত্র নয় হাজারে পরিণত করা হইল ও দশ হাজার বৃটিশ সৈন্য গোয়ালিয়রে রাখার ব্যবস্থা হইল। এই ব্যবস্থায় গোয়ালিয়র বৃটিশের অনুগত হইল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গোয়ালিয়রের সুযোগ্য মন্ত্রী দিনকর রাও বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যদল দিয়া সাহায্য করিয়াছিল।

বৃটিশের আশ্রিত

ডালহৌসী ও স্বত্ব-বিলোপ নীতি

লর্ড ডালহৌসী-র সময়ে বৃটিশের দেশীয় রাজ্যনীতি নবরূপ পরিগ্রহ করিল। ডালহৌসী 'Doctrine of Lapse' নামে এক নীতি প্রবর্ত্তন করিয়া দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে তাহা কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলা আবশ্যক যে এই নীতির প্রকৃত উদ্ভাবক ডালহৌসী ছিলেন না—১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের পর ডিরেক্টার সভা স্বত্ব-বিলোপ নীতির কথা

উল্লেখ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ডালহৌসীর পূর্ব্বে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মণ্ডভী, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কোলাবা ও জালায়ুন এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সুরাটের ক্ষেত্রে স্বত্ব-বিলোপ নীতি প্রযুক্ত হয় এবং এই সব স্থান বৃটিশের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু ডালহৌসীর সময়ে কঠোরভাবে এই নীতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহার সঙ্গে ডালহৌসীর নামই বিশেষভাবে জড়িত হইয়া আছে। ডালহৌসী সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণর জেনারেলদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং বৃটিশের রাজ্য বিস্তারের জন্যই বাহুবল ব্যতীত স্বত্ব-বিলোপ নীতি দ্বারা প্রজার হিতসাধনের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া এবং অন্যান্য বিবিধ কারণে বহু দেশীয় রাজ্য বৃটিশের অধিকারভুক্ত করেন।

স্বত্ব-বিলোপ নীতি
Doctrine of Lapse

'স্বত্ববিলোপ নীতি'র মূল কথা এই—বৃটিশের অনুগ্রহে যে সকল দেশীয় রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল সেই সকল আশ্রিত রাজ্যের নরপতি অপুত্রক হইলে সাধারণতঃ তাহাদের মৃত্যুর পরে তাহাদের রাজ্যসার্ব্বভৌম-শক্তি বৃটিশের অধিকারে স্বতঃই ফিরিয়া আসিবে। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত ঐ প্রকার আশ্রিত রাজ্যের কোন শাসক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে রাজ্যের উত্তরাধিকার প্রদান করিতে পারিবেন না। অবশ্য এই স্বত্ববিলোপ নীতি বৃটিশের আশ্রিত মিত্র রাজ্যের পক্ষে প্রযুক্ত হইবে না। মোগল শক্তির অবসানে বৃটিশই ভারতের একমাত্র সার্ব্বভৌম শক্তি এই দাবির উপরে স্বত্ব-বিলোপ নীতি উদ্ভাবিত ও প্রযুক্ত হইল। স্বত্ব বিলোপের ত্রুটিতে সাতারা (১৮৪৮), জৈৎপুর, সম্বলপুর ও বাঘট (১৮৫০), উদয়পুর (১৮৫২), নাগপুর (১৮৫৩) এবং ঝাঁসি (১৮৫৪) প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য বৃটিশের অধিকারভুক্ত হইল। এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বৃটিশের সৃষ্ট অনুগ্রহাধীন রাজ্য ও আশ্রিত মিত্র রাজ্য-এর মধ্যে একটুখানি পার্থক্য রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এই পার্থক্য এত সূক্ষ্ম ছিল যে তদনুসারে শ্রেণী-নির্ণয় করা দুরূহ এবং উপরোক্ত রাজ্য সকল সত্যই বৃটিশের সৃষ্ট কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে না।

সাতারা রাজ্য বৃটিশের সৃষ্ট। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার পতনের পর সাতারা রাজ্য শিবাজীর এক বংশধরের হস্তে অর্পণ করা হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কু-শাসনের অপরাধে সাতারার রাজাকে গদিচ্যুত করিয়া তাহার ভ্রাতাকে সিংহাসন প্রদান করা হয়। শেষোক্ত নরপতি অপুত্রক ছিলেন; তিনি বৃটিশের অনুমোদন ব্যতিরেকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ খৃঃ-এ তাহার মৃত্যুর পর ডালহৌসী এই দত্তকের অধিকার অগ্রাহ্য করেন।

সাতারা

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে নাগপুরও বৃটিশের আয়ত্তাধীন হয়—লর্ড হেষ্টিংস নাগপুরকে পুরাতন রাজবংশের এক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করেন। এই রাজা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অপুত্রক এবং দত্তক বিহীন অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। বৃটিশ-সৃষ্ট এই কারণে ডালহৌসী নাগপুর অধিকারভুক্ত করেন। স্বত্ব-বিলোপ নীতি অনুযায়ী হয়তো সাতারা ও নাগপুর বৃটিশের অধিকারভুক্ত হওয়া সঙ্গত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নিছক সাম্রাজ্যের স্বার্থেই ডালহৌসী উভয় রাষ্ট্র অধিকার করিয়াছিলেন। কেদনা এই উভয় রাষ্ট্রই বোম্বাই-মাদ্রাজ ও মাদ্রাজ-কলিকাতা যাতায়াতের পথে অবস্থিত ছিল।

নাগপুর

পেশোয়া-র নিকট হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত ঝাঁসি-র গদিতে ইংরেজের মনোনীত এক ব্যক্তি অধিষ্ঠিত ছিল। এই রাজার মৃত্যুর পর (১৮৫৩) তাহার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় ইহা ন্যায়সঙ্গতভাবে বৃটিশের অধিকারে আসিল।

ঝাঁসি

ডালহৌসীর স্বত্ব-বিলোপ নীতি অনুযায়ী কয়েকটী ভূতপূর্ব্ব নরপতির বৃত্তি ও পদ মর্য্যাদা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। তাহার মতে ক্ষমতাবিহীন উপাধি বা পদমর্য্যাদা অর্থহীন এবং ইহাতে বৃটিশের 'সদিচ্ছার' উপর দেশীয় লোকের অশ্রদ্ধা আসিতে পারে। কর্ণাটের নবাব ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মৃত হইলে লড

কর্ণাট, তাঞ্জার-এর উপাধি বাতিল

ডালহৌসী তাহার উত্তরাধিকারীকে স্বীকার করিলেন না। অপুত্রক তাঞ্জোররাজের মৃত্যুর (১৮৫৫) পর তাহার কন্যা থাকা সত্ত্বেও তাঞ্জোরের রাজা উপাধি নিষিদ্ধ হইল। ভূতপূর্ব্ব পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে তাহার দত্তক পুত্র নানা ধুন্দুপন্থকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইল। এই যুক্তি প্রদর্শিত হইল যে উক্ত বৃত্তি পেশোয়াকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছিল—উত্তরাধিকার সূত্রে নহে। ডালহৌসী মোগল সম্রাটকেও উপাধি হইতে বঞ্চিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—কিন্তু ডিরেক্টার সভার আপত্তিতে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হন নাই।

পেশোয়ার বৃত্তি ও উপাধি বন্ধ

লর্ড ডালহৌসী 'প্রজার হিত সাধনের' অজুহাতে অনেক দেশীয় রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার মতে দেশীয় কুশাসন অপেক্ষা বৃটিশ শাসন প্রজাদের পক্ষে অধিক কল্যাণজনক। কুশাসনের জন্যই ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা রাজ্য বৃটিশ রাজ্যান্তর্গত করা হইল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ওয়েলেসলীর সময়ে অযোধ্যাকে আশ্রিত করদ রাজ্যে পরিণত করা হয় এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও বৃটিশের অধিকার বজায় থাকে। প্রকৃত ক্ষমতাবিহীন দায়িত্ব থাকার জন্যই নবাবগণ প্রজার স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রজাদের দুরবস্থার প্রতি বেন্টিঙ্ক ও হাডিঞ্জ নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু তথাপি শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি হয় নাই; কেননা মৌলিক ক্রটি সংশোধনের জন্য কেহই চেষ্টা করেন নাই। ডালহৌসী ক্রমবর্দ্ধমান বৃটিশ-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই প্রকার কু-শাসিত রাজ্য রাখিতে প্রস্তুত হইলেন না। ডালহৌসী অবশ্য অযোধ্যা সম্পূর্ণ অধিকারের পক্ষপাতী ছিলেন না—কেবলমাত্র ইহার শাসনভার গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন।

প্রজার হিতার্থে রাজ্য অধিকার

অযোধ্যা রাজ্য

কিন্তু ডিরেক্টার সভা পূর্ণ অন্তর্ভূক্তির আদেশ দিলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা অযোধ্যা বৃটিশের কুক্ষিভুক্ত হইল। শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে বাৎসরিক বারো লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় নির্ব্বাসিত করা হয়।

অযোধ্যা অধিকারের সমালোচনা

অযোধ্যা রাজ্য অধিকার করা বৃটিশের পক্ষে মোটেই ন্যায়ানুগ হয় নাই এবং এই কার্য্য যে আন্তর্জ্জাতিক বিধি সম্মত নহে তাহা স্বয়ং ডালহৌসী-ই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যে কুশাসনের অভিযোগে অযোধ্যা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার জন্য নবাব অপেক্ষা বৃটিশের অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতিই অধিকতর দায়ী। উপরোক্ত মিত্রতার সুযোগে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অথবা হস্তক্ষেপ করিয়া নবাবের পক্ষে সুশাসন একেবারে অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সমগ্র দেশীয় রাজ্যের মধ্যে অযোধ্যাই সম্ভবতঃ পূর্ব্বাপর বৃটিশের একান্ত অনুগত ও বশংবদ ছিল। এই বিশ্বস্ত রাজ্যকে অকস্মাৎ কোন সংশোধনের সুযোগ না দিয়া অধিকার করায় বৃটিশের সুনামের যথেষ্ট হানি হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে অকল্যাণ্ডের সময়ে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে নবাবের সঙ্গে যে চুক্তি হইয়াছিল তাহাতে নবাবকে হয় সংস্কার প্রবর্ত্তন করা নতুবা আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া বৃটিশের হস্তে শাসনভার অর্পণ করার জন্য বলা হইয়াছিল। এই চুক্তি অযোধ্যা-গ্রাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। অযোধ্যা অধিকারের সিদ্ধান্ত করিয়া অকস্মাৎ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট নবাবকে জানাইলেন যে উপরোক্ত চুক্তি পূর্ব্বেই বাতিল হইয়া গিয়াছে।

অযোধ্যা অধিকার করার প্রত্যক্ষ ফলও ভাল হয় নাই। ইহার ফলে অযোধ্যার তালুকদার শ্রেণী নবাবের আমলে যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা হইতে বঞ্চিত হয় এবং ইংরেজের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়ে। এই বৃটিশ-বিদ্বেষ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বৃটিশের প্রতিকূলা-

চরণে সাহায্য করিয়াছিল। ডালহৌসী অন্যান্য কারণে কয়েকটি দেশীয় রাজ্য গ্রহণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সিকিমের ১৬৭৬ বর্গমাইল পরিমিত অংশ এই অভিযোগে বাজেয়াপ্ত করা হইল যে সিকিমের অধিপতি বৃটিশ প্রতিনিধিকে আটক করিয়াছিল এবং দুইজন বৃটিশ প্রজার উপর দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম বহুদিন যাবৎ স্বীয় রাজ্যে বৃটিশ সেনা পোষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদান করেন নাই। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্য অর্থের পরিবর্ত্তে নিজামের নিকট হইতে বেরার প্রদেশ গ্রহণ করা হইল।

সিপাহী বিদ্রোহে অযোধ্যার যোগদান

ডালহৌসী-র দেশীয়-রাজ্য নীতির সমালোচনা :—লর্ড ডালহৌসী শ্রেষ্ঠ গভর্ণর-জেনারেলদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাহার সময়ে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিসর ও মর্য্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ডালহৌসী যে সকল উপায়ে বৃটিশের অধিকার বর্দ্ধিত করিয়াছেন তাহাতে সমালোচনার অবকাশ আছে। তাহার অনুসৃত দেশীয়-রাজ্য নীতি-র মধ্যে 'স্বত্ব-বিলোপ' দ্বারই বহু দেশীয় রাজ্য বৃটিশের রাজ্যান্তর্গত হইয়াছে। এই নীতিতে সাতটি দেশীয় রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। অপুত্রক হিন্দুর পক্ষে দত্তক পুত্রের অধিকার ধর্ম্মবিধিসঙ্গত, ডালহৌসী দত্তক পুত্র অস্বীকার করিয়া দেশীয় রাজাদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন, উপরন্তু, 'আশ্রিত মিত্র' রাজ্য এবং বৃটিশ সৃষ্ট 'অধীন রাজ্য' এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝিতে না পারায় দেশীয় নৃপতিগণ বিভ্রান্ত হইয়াছিল। স্বয়ং গভর্ণর জেনারেলও এই পার্থক্য ধরিতে পারেন নাই। উদয়পুর বৃটিশ-সৃষ্ট অধীন রাজ্য ছিল না ইহার উত্তরাধিকারী লুপ্ত হইলে ইহা সরগুজা-র রাজার অধিকারে অপবর্ত্তিত হইবার কথা, ইংরাজের অধিকারে আসার কথা নহে। ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্য করৌলী স্বত্ব-বিলোপ নীতিতে গ্রহণের চেষ্টা করিলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহা 'আশ্রিত মিত্র' রাজ্য এবং অধীন রাজ্য নহে, ইহা ডালহৌসীকে জানাইয়া দেন এবং ডালহৌসীও করৌলী অধিকার হইতে

বিরত হন। লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে পাঞ্জাবের বাঘাট ও উদয়পুর রাজ্য সম্বন্ধে ডালহৌসী-র ত্রুটি সংশোধিত হয় ও ইহাদের স্বাধীনতা প্রত্যর্পিত হয়। সুতরাং ডালহৌসীর স্বত্ব-বিলোপ নীতির পশ্চাতে নৈতিক যুক্তি অপেক্ষা অন্য উদ্দেশ্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু তিনি সকল সময়ে দেশীয়-রাজ্য নীতি সম্বন্ধে যে অসতর্ক ও অসংযমী ভাষা প্রয়োগ করিতেন তাহাতে দেশীয় নরপতিদের মনে যথেষ্ট আতঙ্ক সৃষ্টি হইবার সঙ্গত কারণ ছিল।

ডালহৌসীর স্বপক্ষেও বলা যাইতে পারে যে স্বত্ববিলোপ নীতির প্রথম প্রবর্ত্তক তিনি ছিলেন না। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতেই এই নীতি প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছিল—তিনি কেবল কঠোরতার সহিত ইহাকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত করেন। দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত সাতটি রাজ্যের মধ্যে অন্ততঃ তিনটি সাঁতারা, ঝাঁসী ও নাগপুর যে বৃটিশের সৃষ্ট অধীন রাজ্য সন্দেহ নাই। সর্ব্বোচ্চ সার্ব্বভৌম শক্তি হিসাবে এই তিনটি রাজ্যের উপর বৃটিশের অধিকার ন্যায়সঙ্গত। তৃতীয়তঃ, দৈবাৎ, এই সময়ে যুগপৎ এতগুলি দেশীয় রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং স্বত্ববিলোপ নীতি ইহাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হওয়ায় ডালহৌসী সমালোচনার পাত্র হন।

কুশাসনের অপরাধে দেশীয় রাজ্য অধিকার করা ডালহৌসী-অনুসৃত অন্যতম নীতি ছিল এবং অযোধ্যা রাজ্য এই নীতির কবলে পতিত হইয়া বৃটিশের রাজ্যভুক্ত হয়। অযোধ্যার নবাব দীর্ঘকাল যাবৎ প্রজাশাসনের প্রতি উদাসীন ছিলেন এবং প্রজাগণের দুরবস্থার অন্ত ছিল না সত্য, কিন্তু এই কুশাসনের পরোক্ষ দায়িত্ব নবাব অপেক্ষা বৃটিশের অধিক ছিল। সর্ব্ব-প্রকারে অধীন সামন্ত রাজ্যের পক্ষে সুশাসন করার সুযোগ যথেষ্ট ছিল না। চিরবিশ্বস্ত অযোধ্যা রাজ্যের স্বাধীন সত্তার সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও ইহা বাজেয়াপ্ত করা অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে ডালহৌসী অপেক্ষা বৃটিশ গভর্মেণ্ট অধিক সমালোচনার পাত্র। ডালহৌসী অযোধ্যা পূর্ণগ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু ইংলণ্ডের নির্দ্দেশে তাহাকে এই কার্য্য করিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত সিকিমের কিয়দংশ ও বেরার রাজ্য নানা অজুহাতে বৃটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। মোট কথা, ডালহৌসী প্রথম হইতেই দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। এই নীতির মর্ম্মকথা এই' যে কোন উপায়ে ভারতে বৃটিশের অধিকার বিস্তৃত করিয়া বৃটিশকে সার্ব্বভৌম শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং অধিকার বিস্তারের জন্য তিনি বাহুবল, 'স্বত্ব বিলোপ নীতি, প্রজাহিত প্রভৃতি যে সকল নীতি-বিন্যাস করিয়াছিলেন তাহা সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিকোণ ব্যতীত অন্য কোন ভাবেই করা চলে না। সাম্রাজ্য :বিস্তার সম্বন্ধে তিনি উগ্রপন্থী ছিলেন এবং এই সকল ব্যাপারে তিনি তাহার উপযুক্ত সহযোগী হেনরী লরেন্স, শ্লীম্যান বা আউটরাম প্রভৃতির পরামর্শে কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, বা দেশীয় লোকের সংস্কার বা মনোবৃত্তিকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিতে স্বীকৃত ছিলেন না। বৃটিশের মর্য্যাদা সম্বন্ধে এতই সচেতন ছিলেন যে তিনি বহু দেশীয় নরপতির নামাবশেষ উপাধি রহিত করিয়া দিলেন। পাছে মোগল-মহিমা বৃটিশ মর্য্যাদার পরিপন্থী হয় তাহার প্রতিকারের জন্য হৃতরাজ্য মোগল সম্রাটের উপাধি পর্য্যন্ত ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষের নিষেধে সম্রাটের পদমর্য্যাদা অক্ষুন্ন ·থাকে। "তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ গত্যন্তর থাকিলে দেশীয় রাজ্য অধিকার হইতে :বিরত থাকিতেন; কিন্তু ডালহৌসী কোন প্রকার কারণ প্রদর্শন করিতে পারিলেই দেশীয় রাজ্য বৃটিশের অধিকার-ভূক্ত করিবেন এই সাধারণ নীতি অনুসরণ করিতেন"।—(Innes) ডালহৌসীর রাজ্যগ্রাসী নীতি বহুক্ষেত্রে expediency বা প্রয়োজনানুরোধে অনুসৃত হইলেও সাধারণভাবে ইহা ভবিষ্যতে বৃটিশের পক্ষে অকল্যাণকর হইয়াছিল; ইহাতে দেশীয় রাজ্য সমূহে বৃটিশের উদ্দেশ্য ও সততা সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্ট হইয়াছিল এবং অনতিকাল পরে সমগ্র ভারতব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বালনে সহায়তা করিয়াছিল।



ভারতবর্ষ—১৮৫৬
বৃটিশ অধিকৃত রাজ্য
বৃটিশের আশ্রিত বা করদ রাজ্য
কাশ্মীর
নেপাল
দিল্লী
রাজপুতনা
আগ্রা
মুর্শিদাবাদ
বঙ্গদেশ
দমন
বোম্বাই
নিজাম ডোমিনিয়ন
ভিজাগাপট্টম
মহীশূর
মাদ্রাজ
কলিকট
পণ্ডিচেরী
কলম্বো
সিংহল
আ র ব সা গ র
ব ঙ্গো প সা গ র
K.C.

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্রোহ (সিপাহী মিউটিনি)

বিদ্রোহের পূর্ব্বাভাস

লর্ড ক্যানিং-এর শাসনের (১৮৫৬-৬২) প্রারম্ভে সমগ্র আর্য্যবর্ত্তে বৃটিশের বিরুদ্ধে যে ভীষণ সমর-বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল তাহা সরকারী বিবরণে ১৮৫৭-'৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহী মিউটিনি বলিয়া খ্যাত ; ভারতের জননায়কগণ ইহাকে স্বাধীনতা-সমর আখ্যা প্রদান করেন। সমগ্র ভারতব্যাপী বৃটিশ শক্তির আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্যের শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজনীতি, শাসন-ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্রমশঃ ভারতের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করিয়া ভারতের সনাতন জীবন যাত্রা পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্ত্তনের স্রোত আনয়ন করে। এই পরিবর্ত্তন বহুক্ষেত্রে জনসাধারণের মনোবৃত্তির প্রতিকূল হওয়ায় তাহাদের মানসিক প্রতিকূলতা সময় সময় বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এই জাতীয় বিদ্রোহের মধ্যে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের বেরিলী বিদ্রোহ, ১৮৩১-'৩২ খৃষ্টাব্দের কোল বিদ্রোহ ও ছোটনাগপুর ও পালামৌর অধিবাসীদের অভ্যুত্থান, বারাসতের তিতুমীর ও ফরিদপুরের দিতুমীরের নেতৃত্বে যথাক্রমে ১৮৩১ ও ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মুসলমানদের ফরাজী বিদ্রোহ, ১৮৪৯, ১৮৫১, ১৮৫২ ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মোপলা বিদ্রোহ ও ১৮৫৫-'৫৬ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত বিদ্রোহ সমূহ স্থানীয় অভ্যুত্থানের সমতুল্য এবং স্বল্প পরিসীমায় আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৮৫৭-'৫৯ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের অসন্তোষের ফলে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আকারে ও প্রকারে এত ভীষণ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল যে তাহা ভারতস্থিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি-ভূমিকে পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া দিয়াছিল।

(ক) বিদ্রোহের কারণ :—বিদ্রোহের কারণকে প্রধানতঃ চারিভাগে

বিভক্ত করা যাইতে পারে; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়, এবং সামরিক। রাজনৈতিক কারণের মধ্যে ডালহৌসীর সামন্ত রাজ্য কবলিত করার প্রয়াস ও স্বত্ব-বিলোপ নীতি, দিল্লীর মোগল বাদশাহকে পুরাতন রাজধানী হইতে দিল্লীর সন্নিকটবর্ত্তী কুতুবে স্থানান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। এই সকল কার্য্য হিন্দুও মুসলমান নরপতিদের মনে বৃটিশের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও অসন্তুষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। অযোধ্যা অধিকার বা বাদশাহকে পূর্ব্ব গরিমা হইতে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা মুসলমানদিগকে বৃটিশ বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল; আবার ভূতপূর্ব্ব পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও-এর দত্তকপুত্র নানা ধুন্দুপন্থকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া ইংরেজরা হিন্দুজাতির বিদ্বেষের কারণ হইল ভারতস্থিত ইংরেজ শাসনকর্ত্তাগণ সময়ে সময়ে এমন অসংযত উক্তি করিতেন যে যদিও তাহা অপ্রকাশ্যেই করিতেন—তাহাতে ইহা ধারণা করার সঙ্গত কারণ ছিল যে বৃটিশ শক্তি বেপরোয়াভাবেই রাজ্যগ্রাসীনীতি অনুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর। উদাহরণ স্বরূপ স্যার চার্লস নেপিয়ারের একখানা ব্যক্তিগত লিপির ভাষা উল্লেখ করা যাইতে পারে—'were I Emperor of India for tweleve years……no Indian Prince should exist. The Nizam would be no more heard of…Nepal would be ours…" প্রকৃত প্রস্তাবে ডালহৌসীর অনুসৃত নীতিতে রাজ্যবঞ্চিত বা অসন্তুষ্ট দেশীয় নরপতিবর্গ বা তাহাদের সহযোগিবৃন্দই বৃটিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত করিতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাবের পরামর্শদাতা আহম্মদ উল্লা, নানা সাহেব, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব, নানার অনুগামী তাঁতিয়া টোপী ও আজিমুল্লা খাঁ, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারের জগদীশপুরের জমিদারী-বঞ্চিত রাজপুত সর্দ্দার কুনোয়ার সিং, মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের আত্মীয় ফিরোজ শাহ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

(ক) রাজনৈতিক

দ্বিতীয়তঃ, বহু দেশীয় রাজ্য ও জায়গীর বৃটিশের কবলিত হওয়ায় এই সমস্ত নরপতি ও জমিদারের বহু কর্ম্মচারী ও অনুচরবৃন্দ কর্ম্মচ্যুত হইয়া অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পতিত হয়। ইহার ফলে ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্চপদ ও শাসন কর্ত্তৃত্বলাভের উচ্চাশা ইংরেজের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে রুদ্ধ হয় এবং দেশের নানা স্থানে সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। সিপাহী সংগ্রামের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরকাল দক্ষিণাত্যে প্রায় কুড়িহাজার দেশীয় জমিদারের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইহাতে বৃটিশের আয়ের পথ বৃদ্ধি হইলেও দেশে অর্থনৈতিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। অযোধ্যা প্রদেশে এই অশান্তি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে; কেননা এই স্থানের চীফ কমিশনার জ্যাকসনের সময়ে অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারীদের বৃত্তি ও ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; রাজধানী সহর চীফ কমিশনার স্বয়ং অধিকার করিয়া বসেন এবং অযোধ্যার সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে সামরিক বৃত্তিধারী বহু লোক কর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়ে। জ্যাক্সনের এই সকল অবিবেচক কার্য্যের ফলে দীর্ঘকাল অনুগত অযোধ্যা প্রদেশ অশান্তি ও বৃটিশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়।

(খ) অর্থনৈতিক ও সামজিক

তৃতীয়তঃ, উপরোক্ত কারণ সমূহের সঙ্গে ধর্ম্মনৈতিক কারণও জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজ অধিকারের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্যের শিক্ষা-দীক্ষা ও ভাবধারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়াছিল। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন, শিশুবলি নিবারণ, ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুর সম্পত্তিতে অধিকার আইন (১৮৫৬), খৃষ্টান মিশনারীদের উগ্র ধর্ম্মপ্রচার, ইংরেজী ভাষার প্রচলন, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তন—সমস্ত মিলিয়া সনাতনপন্থী হিন্দুর মনে এই ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল যে ইংরেজরা ভারতীয়দিগকে ইউরোপের ধর্ম্ম ও সভ্যতার অনুগামী করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কোরাণের অনুশাসনে আস্থাবান মুসলমান ওয়াহাবী-দের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে

(গ) ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কারণ

পারে। ওয়াহাবী'-রা বৃটিশের হস্তে স্বধর্ম্মচ্যুত হইবার আশঙ্কার কথা মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করিয়া তাহাদিগকে বৃটিশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে।

উপরোক্ত কারণ সমূহ বর্ত্তমান থাকিলেও যদি ইংরেজের দেশীয় সৈন্যদল বিশ্বস্ত থাকিত তাহা হইলে ভারতব্যাপী বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরেজের ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যেও নানা কারণে অশান্তির বীজ উপ্ত হইয়াছিল এবং সময়ে সময়ে তাহা আত্মপ্রকাশ করিত। বহু দূরদেশে দীর্ঘকাল তাহাদিগকে সামরিক কারণে অবস্থান করিতে হইত বলিয়া তাহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পূর্ব্ববর্ত্তী তেরো বৎসরের মধ্যে সিপাহীরা চারিবার বিদ্রোহ করিয়াছিল; দূরদেশে যুদ্ধ করিতে যাইয়া অতিরিক্ত ভাতা পাইত না বলিয়া তাহারা উপরোক্ত বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে (১৮৫২ খৃঃ) সিপাহীদিগকে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশে যাইতে বাধ্য করায় তাহারা জাতিনাশের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। ইহার উপরে যখন লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে দেশীয় সৈন্যদলের যুদ্ধের প্রয়োজনে সমুদ্রপারে গমন চাকুরীর অন্যতম সর্ত্তরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয় তখন সিপাহীরা অধিকতর অসন্তুষ্ট হয়। কেননা বাংলা, বিহার, অযোধ্যা ও গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল হইতেই দেশীয় সৈন্য সংগ্রহ করা হইত এবং ইহারা সনাতন বিধিনিয়মের বিশেষ পক্ষপাতী ছিল। উপরন্তু সৈন্যদলে বিদ্রোহের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে যথেষ্ট শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব দৃষ্ট হইতেছিল। ডালহৌসীর সময়ে সেনাবিভাগের বহু সুযোগ্য কর্ম্মচারীকে সামরিক বিভাগ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্যত্র শাসনকার্য্য পরিচালনায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সেই সময়ে সামরিক বিভাগে পদোন্নতি গুণবত্তা বা কর্ম্মদক্ষতার উপর নির্ভর করিত না; তাহা নির্ভর করিত বয়সের অগ্রাধিকারের উপর। সুতরাং অনেক সময় শুধু বয়সাধিক্যে বহু অনুপযুক্ত লোক সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইত। এই সকল কারণে সুশৃঙ্খলার সহিত সৈন্যদলকে

(ঘ) সামরিক কারণ

পরিচালনার জন্য উপযুক্ত লোকের যথেষ্ট অভাব হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি, ভারতীয় সেনাবিভাগে বৃটিশ অপেক্ষা ভারতীয় সংখ্যায় অধিক ছিল। ডালহৌসীর ভারত হইতে প্রস্থানের সময়ে ভারতীয় সিপাহীর সংখ্যা ছিল ২৩৩,০০০, আর বৃটিশ সৈন্য ছিল ৪৫,৩২২। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রয়োজন হওয়াতে বহু বৃটিশ সৈন্য ভারত হইতে প্রেরিত হওয়ায় ভারতীয় সৈন্যের অনুপাত বৃটিশের তুলনায় অধিক হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত দিল্লী ও এলাহাবাদের মত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বৃটিশ সৈন্য কম ছিল। এই সকল স্থান একপ্রকার সিপাহীদের হস্তে ছিল বলিলেই হয়। কলিকাতা ও পাটনার মধ্যে একমাত্র দিনাপুরে একটি বৃটিশ রেজিমেণ্ট ছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংরেজের দুর্গতির কথা শ্রবণে সিপাহীরা বৃটিশের সাহস ও রণকৌশল সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারাইয়াছিল। সিপাহীরা মনে করিল এই সুযোগে সহজেই ইংরেজদিগকে পরাভূত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করা যাইতে পারে।

অবশেষে অশুভক্ষণে সৈন্যদলে এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইল। এই নূতন বন্দুকের টোটা পশুচর্ব্বিতে স্নেহার্দ্র ছিল এবং ইহা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকের নলে পুরিতে হইত। সৈন্যগণের মধ্যে প্রচারিত হইল যে এই চর্ব্বি গরু ও শূকর হইতে জাত; ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্যদল ইংরেজরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করিতেছে ভাবিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে চর্ব্বি সংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্যে খানিকটা সত্য ছিল; কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলায় বা অজ্ঞাতে উলউইচ-এর শস্ত্রকারখানায় চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইংরেজরা প্রথমে এই জনরব অলীক বলিয়া ঘোষণা করিলেও প্রকৃত তথ্য সিপাহীদের নিকট অজ্ঞাত রহিল না। এই অস্বীকৃতিতে বৃটিশের ধর্ম্মনাশের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে সিপাহীদের ধারণা অধিকতর বদ্ধমূল হইল। বিবিধ কারণে দাহানুকূল অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই

এনফিল্ড রাইফেল

সৃষ্ট হইয়াছিল ; পশু-চর্ব্বির কাহিনী তাহাতে অগ্নিশলাকার কার্য্য করিল। বিদ্রোহের বহ্নি শতদ্রু হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চলকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

(খ) বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য : স্বাধীনতা সংগ্রাম কি না :—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী সংগ্রামকে কেহ কেহ স্বাধীনতার রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতব্যাপী না হইলেও উত্তরাঞ্চলের বহু স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল এবং এই সকল স্থানে প্রায় জাতীয় অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। কিছুকালের জন্য অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ডে বৃটিশের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে বৃটিশ শক্তিকে ভারত হইতে বিলুপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা করিয়াছিল। উভয় সম্প্রদায়ই বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হইয়াছিল—মুসলমানগণ মোগল বাদশাহকে মহিমাচ্যুত করায়, হিন্দুগণ পেশোয়ার গৌরবকে অবলুপ্ত করায়। সাধারণ শত্রু বৃটিশের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের প্রারম্ভে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাও বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং বিদ্রোহের সমসাময়িক আউটরামের উক্তি অনুযায়ী এই বিদ্রোহ যে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা এই বিদ্রোহকে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন তাহারা তাহাদের স্বপক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন—উক্ত বিদ্রোহ কখনও ভারতব্যাপী সামগ্রিক রূপ ধারণ করে নাই এবং তিনটী প্রাদেশিক সৈন্যদলের মধ্যে একটিমাত্র দল বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। দেশীয় নরপতিদের মধ্যে এবং জমিদার শ্রেণীর মধ্যে মাত্র অযোধ্যার তালুকদার শ্রেণী ব্যতীত অধিকাংশই বৃটিশের পক্ষে ছিল। অধিকন্তু মোগল ও মারাঠা এই দুই সাম্রাজ্যের উপর বৃটিশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাদশাহ ও পেশোয়া উভয়ের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাকামী পরস্পর-পরিপন্থী দুই পক্ষের মধ্যে ঐক্যসূত্র থাকা সম্ভব নহে। ইত্যবস্থায় ইহাকে 'স্বাধীনতা-সংগ্রাম' আখ্যা প্রদান করা অযৌক্তিক। কিন্তু এই যুক্তি

সর্ব্বাংশে গ্রহণ করার অসুবিধা রহিয়াছে। অধিকাংশ দেশীয় নরপতি বা জমিদারশ্রেণী ইহাতে যোগদান না করিলেও তত্রত্য জনসাধারণ বহুস্থলেই বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ গোয়ালিয়রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তথাকার মন্ত্রী দিনকর রাও বৃটিশের সাহায্য করিলেও গোয়ালিয়রের সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়াছিল। আর হিন্দু-মুসলমান অর্থাৎ পেশোয়া-বাদশাহের সমর্থকদের মধ্যে শত্রুতা বা প্রতিপক্ষতা থাকিলেও উভয়ের সাধারণ শত্রুর বিপক্ষে প্রথমতঃ দণ্ডায়মান হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। এই বিদ্রোহকে জাতীয় অভ্যুত্থানে পরিণত করার চেষ্টা কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বেই চর্ব্বির ব্যাপারে অ-প্রস্তুত অবস্থায়ই সিপাহীরা বৃটিশের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। Sir James Outram যে বলিয়াছেন—The catridge incident merely "Precipitated the mutiny before it had been thoroughly organizd and before adequate arrangements had been made for making the mutiny a first step to a popular insurrection."—তাহা সত্যই যুক্তিযুক্ত। সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বেই সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ইহা আঞ্চলিকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। তথাপি যে প্রচণ্ড বেগে ইহা অগ্রসর হইয়াছিল জাতীয় শত্রু বিতাড়ন শ্রেণীর কোন উচ্চ আদর্শ ব্যতীত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ব্যক্তিগত স্বার্থে বা প্রতিহিংসায় অতখানি প্রচণ্ডতা সম্ভব নহে। মোট কথা, পরিণামে অকৃতকার্য্য হওয়ার জন্যই ইহা স্বাধীনতার যুদ্ধ না হইয়া বিদ্রোহ আখ্যায় নিন্দিত হইয়াছে; নতুবা ইহাকে স্বাধীনতার যুদ্ধ না বলার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

(গ) **সিপাহী সংগ্রাম ও ইহার দমন** :—সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের প্রকাশ বারাকপুরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রথম দেখা দেয়; কিন্তু অচিরেই তাহা দমন করা হয়। ঐ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে মীরাটে ইহা গুরুতর আকার ধারণ করে। সেখানকার সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া

কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বন্দী সিপাহীদিগকে উদ্ধার করে, উর্দ্ধতন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীগণকে নিহত করে এবং ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দেয়। মীরাটের বৃটিশ সেনাপতির অধীনে ২২০০ ইউরোপীয় সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিলেন না। সিপাহীরা সাহস পাইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া দিল্লী হস্তগত করিল। সেখানকার ইউরোপীয়েরা অনেকে নিহত হইল এবং তাহাদের গৃহাদিও লুণ্ঠিত হইল। সহরের উপকণ্ঠস্থিত টেলিগ্রাফ অফিসের দুইজন সংবাদ-প্রেরক যথাসময়ে পাঞ্জাবে টেলিগ্রাফ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে সতর্ক করার অবকাশ পাইয়াছিল। দিল্লীর তোপখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী উইলোবী আটজন সরকারী কর্ম্মচারী লইয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত তোপখানা রক্ষা করেন—পরিশেষে আত্ম-সমর্পণে স্বীকৃত না হইয়া তোপের মুখে বারুদখানা উড়াইয়া দেন। বিদ্রোহীরা মোগল বাদশাহের প্রাসাদ অধিকার করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধ মোগল বংশধর বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। দিল্লী বিদ্রোহীদের কবলিত হওয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্য্যাদা অত্যন্ত বিপন্ন হইল।

বিপ্লুত অঞ্চলের পরিধি

পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার স্যার জন লরেন্স যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া পঞ্জাব প্রদেশ শান্ত রাখিতে সক্ষম হইলেও বিপ্লব-বহ্নি অন্যত্র বিস্তৃত হইল। দিল্লী পুনরধিকারের পূর্ব্বেই বিদ্রোহ অচিরেই গাঙ্গেয় প্রদেশ সমূহে ও মধ্যভারতে ব্যাপ্ত হইল। রাজপুতানার নাসিরাবাদ, বেরিলী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস ও বিহারের অঞ্চল বিশেষ বিদ্রোহে যোগদান করিল। আরার সন্নিকটস্থ জগদীশপুরের কুনোয়ার সিংহের বিদ্রোহ পাটনা বিভাগের কমিশনার উইলিয়ম টেলার এবং বেঙ্গল আর্টিলারীর ভিন্‌সেণ্ট আয়ারের প্রচেষ্টায় দমিত হইল। কর্ণেল নীল বেনারস-এর বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হন ; তিনি এই বিদ্রোহ দমনে অত্যন্ত নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করেন। তাহার আদেশে ধৃত সমস্ত

বিদ্রোহীদিগকে নিহত করা হয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহে সামরিক আইন ঘোষিত হয়। উপরন্তু সমস্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া উত্তেজিত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী এমন কি বে-সরকারী কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে ফাঁসিতে লটকাইয়া দেন—ইহা হইতে অপ্রাপ্ত বয়স্কেরা পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পাইল না। অতঃপর নীল এলাহাবাদে যাইয়া অবরুদ্ধ সেনাপতি কাপ্তেন ব্রেনিয়ারকে সাহায্য করায় এলাহাবাদের কেল্লা রক্ষা প্রাপ্ত হয়।

বিদ্রোহীদের কর্ম্ম-পরিধি কানপুর, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌতে অধিকতর সীমাবদ্ধ ছিল। নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী অঞ্চলে বিদ্রোহ প্রসারিত হইতে পারে নাই। কোলাপুরের একদল দেশীয় সৈন্য বিদ্রোহী হইলেও লর্ড এলফিনষ্টোনের চেষ্টায় বোম্বাই প্রদেশ শান্ত থাকে এবং জর্জ্জ লরেন্স যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া রাজপুতানা স্থির রাখেন। পাঞ্জাব বিশেষতঃ শিখ সর্দ্দারগণ, কাশ্মীরের গোলাব সিং এবং বহু জমিদার ও ভারতীয় কর্ম্মচারী বৃটিশের অনুগত ছিল। গোয়ালিয়রের প্রধান মন্ত্রী দিনকর রাও, হায়দ্রাবাদের মন্ত্রী স্যার সালার জঙ্গ, ভূপালের বেগম, নেপালের গুর্খাবীর স্যার জঙ্গ বাহাদুর—এই কয়েকজনের প্রযত্নে বিদ্রোহ বহ্নি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই এবং ইহাদের অমূল্য সাহায্যে ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা প্রাপ্ত হয়।

কানপুর ঃ—কানপুরের বিদ্রোহীদলের নেতা শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর উত্তরাধিকারী নানা সাহেব নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং বৃটিশ সৈন্যাবাস আক্রমণ করিলেন। এই সেনানিবাসে চারিশত ইউরোপীয় ও বহু স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা অবস্থান করিয়া অসম সাহসিকতার সহিত আঠারো দিন বিদ্রোহীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিল; পরিশেষে নিরাপদে এলাহাবাদে পৌঁছাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতিতে ইহারা আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু তাহারা যখন নৌকাযোগে পার হইতেছিল তখন তাহাদের উপর মারাত্মক গুলিবর্ষণ করা হয়; ফলে চারিজন ব্যতীত অবশিষ্ট সকল পুরুষ নিহত হয়। দুইশত এগারো জন স্ত্রীলোক ও শিশুকে

বিবিগড় নামক নিবাসে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়; পরিশেষে ইহাদিগকে নানা সাহেব ও তাঁতিয়া টোপীর আদেশে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়। বেনারস ও এলাহাবাদে বৃটিশ ও শিখ সৈন্যদল যে নির্ম্মম অত্যাচার করিয়াছিল তাহার প্রতিহিংসা হিসাবে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা বলা দুরূহ। এই নির্ম্মম হত্যালীলার সংবাদ শ্রবণে ভারতস্থিত এবং বৃটেনে অবস্থিত ইংরেজের মনে ভয়ানক বিদ্বেষ ও উত্তেজনা প্রকাশ পায়; ফলে সর্ব্বত্র বিজয়ী কোম্পানীর সৈন্যদল পৈশাচিক ব্যবহার করে। সত্বর নীল ও হ্যাভেলক কানপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডের একদিন পরে। বিদ্রোহী গোয়ালিয়র সৈন্যদলের হস্ত হইতে স্যার কলিন ক্যাম্পবেল কানপুর উদ্ধার করেন।

দিল্লী ঃ—বিদ্রোহীদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল দিল্লী এবং অচিরে দিল্লী পুনরধিকার করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। আম্বালা হইতে আগত একদল বৃটিশ সৈন্য মিরাটাগত অন্য এক দলের সহযোগে বাদলী সারি-তে এক বিদ্রোহীদলকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠস্থিত এক পাহাড় অধিকার করিল এবং সেই স্থান হইতে বিদ্রোহীদের উপর লক্ষ্য রাখিল। স্যার জন লরেন্স পঞ্জাব হইতে নিকলসনের নেতৃত্বে একদল শিখসৈন্য দিল্লীর উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিলেন। নিকলসন স্যার আর্চ্চডেল উইলসন, বেয়ার্ড স্মিথ ও নেভিল চেম্বারলেনের সহায়তায় বিদ্রোহীদের সকল প্রতিবন্ধকতা ব্যর্থ করিলেন এবং দিল্লীর কাশ্মীর ফটক কামানের গোলাতে উড়াইয়া দিয়া ছয়দিন কঠোর যুদ্ধের পর দিল্লী অধিকার করিলেন। নিকলসন মারাত্মক আঘাতে নিহত হইলেন। বিজয়ী বৃটিশ বাহিনীর জিঘাংসা লীলায় বহু নির্দ্দোষ নরনারী প্রাণ হারাইল। হড্সন নামে একজন বৃটিশ সেনানী হুমায়ুনের কবরে লুক্কায়িত বৃদ্ধ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, তাহার দুই পুত্র ও তাহার এক পৌত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিল। ইহারা আত্মসমর্পণ করিলেও হড্সনের প্রতিহিংসার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। হড্সনের মনে বিশ্বাস

হইয়াছিল যে ইহারা ইউরোপীয়দের হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে এবং ইহাদিগকে জীবিত রাখিলে ইহারা জনতার সাহায্যে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। এই ধারণায় হড্সন সম্রাটের পুত্র ও পৌত্রদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। এইরূপে মোগলবংশ অবলুপ্ত হইল। বৃদ্ধ বাদশাহ রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত হইলেন—তথায় তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সাতাশি বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। হড্সনের উপরোক্ত হত্যাকাণ্ড কোনমতেই সমর্থন করা চলে না। হতভাগ্য বাদশাজাদারা যে বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাহা নির্দ্দিষ্টরূপে প্রমাণিত হয় নাই, বা বিদ্রোহী-জনতা ইহাদিগকে উদ্ধার করার কোন চেষ্টা করে নাই। ঐতিহাসিক ম্যালিসনের ভাষায়—এতদপেক্ষা নিষ্ঠুর এবং অনাবশ্যক অপকার্য্য কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই কার্য্যে শুধু ভুল হয় নাই, অপরাধও হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ ঃ—লক্ষৌতে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিলে চীফ কমিশনার হেনরী লরেন্স সমস্ত ইউরোপীয় অধিবাসী ও কর্ম্মচারী এবং ৭০০ বিশ্বস্ত সিপাহী সহ লক্ষৌর রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোলার আঘাতে লরেন্স নিহত হইলে অবরুদ্ধ রেসিডেন্সির ভার ইংলিস নামক বৃটিশের উপর পতিত হয়। ইংলিস বীরবিক্রমে কিছুকাল আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। ইতিমধ্যে হ্যাভেলক ও আউটরাম সসৈন্যে ইংলিসের সাহায্যার্থে লক্ষৌতে উপস্থিত হইলেন এবং অজস্র গুলিবর্ষণে রাস্তা পরিষ্কার করিয়া রেসিডেন্সীর সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হইলেন। কিন্তু ইংলিস, হ্যাভেলক ও আউটরাম এই সেনানীত্রয় বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অবরুদ্ধ স্থান হইতে বহির্গত হইতে পারিলেন না। অবশেষে স্যার কলিন ক্যাম্পবেল ইংলণ্ড হইতে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া আসিলেন এবং অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহ বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে দমন করিতে সমর্থ হইলেন। কলিন ক্যাম্পবেল নেপালের জঙ্গ বাহাদুর প্রেরিত একদল গুর্খাবাহিনীর সহায়তায় লক্ষৌর অবরোধ উন্মুক্ত করিতে কৃতকার্য্য হন এবং লক্ষৌ বৃটিশের পুনরাধিকৃত হয়।

ইতিমধ্যে লর্ড ক্যানিং-এর এক ঘোষণাপত্রে অযোধ্যার তালুকদারদের মধ্যে ছয় জন এবং যাঁহারা নিজেকে রাজভক্ত বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারিবে তাহারা ব্যতীত অবশিষ্ট সকলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইলে অযোধ্যার তালুকদারগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয় এবং ইহারা খণ্ড যুদ্ধ চালাইতে থাকে। বেরিলী ও রোহিলখণ্ড পুনরধিকারের সংবাদে ইহাদের মনোবল শিথিল হইয়া যায় এবং অচিরেই এই বিদ্রোহ দমিত হয়। বিদ্রোহীদের অধিকাংশ নেপালে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দুর্দ্দশাময় অবশিষ্ট জীবন যাপন করে।

মধ্যভারতঃ—এই সময়ে অযোধ্যার দক্ষিণস্থ অঞ্চলের বিদ্রোহীরা তাঁতিয়া টোপী নামক এক মারাঠা ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে গোয়ালিয়রের বিংশতি সহস্র বিদ্রোহী সৈন্যসহ কাল্পিতে যমুনা অতিক্রম করে এবং নানা সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়। এই বিদ্রোহীরা কানপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ উইণ্ডহ্যামকে পরাজিত করে। কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি স্যার কলিন ক্যাম্পবেলের হস্তে পরাজিত হইয়া ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈর সঙ্গে যোগদান করেন এবং মধ্য-ভারতে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। স্যার হিউ রোজ বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়া তাঁতিয়া টোপীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। হিউ রোজ সাগর অধিকার করিয়া তাঁতিয়া টোপীকে বেতোয়ার যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেন। ঝাঁসিও হিউ রোজ কর্তৃক অধিকৃত হইল। লক্ষ্মীবাঈ এবং তাঁতিয়া গোয়ালিয়রের প্রস্থান করিয়া সেখানকার সৈন্যদলকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন এবং সিন্ধিয়াকে আগ্রায় বিতাড়িত করিলেন। গোয়ালিয়রের রাজা বৃটিশের অনুগত ছিলেন—কিন্তু তাহার সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়াছিল। নানা সাহেব পেশোয়া বলিয়া ঘোষিত হইলেন। পুনরায় মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়ের আশঙ্কায় হিউ রোজ কালবিলম্ব না করিয়া রাণী এবং তাঁতিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন এবং মোরার ও কোটা নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিলেন। ঝাঁসির স্বদেশ-প্রেমিক রাণী লক্ষ্মীবাঈ পুরুষের বেশে সজ্জিত

হইয়া অশ্বারোহণে শত্রুর বিপক্ষে অবতীর্ণ হইলেন এবং বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন (১৭ই জুন, ১৮৫৮)। তাঁতিয়া টোপী নানা স্থানে পলায়ন করিয়া অবশেষে গোয়ালিয়র-রাজের মানসিংহ নামে এক অধীন সামন্তের দ্বারা ইংরেজের হস্তে সমর্পিত হইলেন এবং বিদ্রোহের অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইল। নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সম্ভবতঃ নেপালেই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। এইভাবে ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে ভারতে শান্তি ঘোষণা করা হয়।

ইংলণ্ডে ও ভারতে বহু ইংরেজ বিদ্রোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর কঠোর নীতি অনুসরণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। এমন কি নিকলসন পর্য্যন্ত দিল্লীর নারী ও শিশু হত্যাকারীদের জন্য জীবন্ত চর্ম্ম তুলিয়া ফেলা বা অগ্নিদগ্ধ করা প্রভৃতি কঠোর শাস্তি বিধিবদ্ধ করার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এই নিষ্ঠুর নীতি অনুসরণ করিতে সম্মত হন নাই। তিনি স্থির করিলেন, ন্যায়সঙ্গত বিচারের দ্বারা যাহাদের অপরাধ প্রমাণিত হইবে তাহাদিগকে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তি দেওয়া হইবে। এইজন্য ইউরোপীয় সমাজে তাহাকে পরিহাস করিয়া 'Clemency Canning' বা দয়ার্দ্র ক্যানিং আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ক্যানিং-এর নীতি তৎকালে যথার্থ ও সময়োপযোগী হইয়াছিল। নিপীড়ন নীতি গ্রহণ করিলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রীতির পরিবর্ত্তে তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি হইত।

(ঘ) **সিপাহীদের ব্যর্থতার কারণ**:—নানা কারণে বিদ্রোহীরা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; প্রথমতঃ, সামরিক দিক দিয়া তাহারা ইংরেজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। সিপাহীরা পুরাতন গাদা-বন্দুকের সাহায্যে যুদ্ধ চালাইয়াছিল—অথচ ইংরেজরা নূতন আবিষ্কৃত টোটা-বন্দুক ব্যবহার করায় যুদ্ধে অধিকতর সুবিধা পাইল। দ্বিতীয়তঃ, টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তিত হওয়ায়

(ক) সিপাহীরা আধুনিক সমরাস্ত্র হইতে বঞ্চিত

একদিকে যেমন কোম্পানী পক্ষে শত্রুর গতিবিধি বা সামরিক সামর্থ্য ইত্যাদি অতি দ্রুত জানা এবং তদনুযায়ী প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত করার অত্যাশ্চর্য্য সুবিধা হইল, অন্য দিকে ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারিয়া সিপাহীরা পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তৃতীয়তঃ, ইংরেজর সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা সামান্য কয়েকজন ব্যতীত অধিকাংশ দেশীয় নরপতির অকুণ্ঠ সাহায্য প্রাপ্ত হয়—বিশেষতঃ গোয়ালিয়রের স্যার দিনকর রাও, হায়দ্রাবাদের স্যার সালার জঙ্গ নেপালের জঙ্গ বাহাদুর এবং শিখজাতি বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বিদ্রোহীরা সর্ব্বত্র সিপাহীদিগকে দলভুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য দেশীয় নরপতির সাহায্য না পাওয়ায় যথেষ্ট শক্তিশালী হইতে পারে নাই।

(খ) টেলিগ্রাফ ইংরেজের সুবিধা

(গ) দেশীয় নরপতিগণের নিশ্চলতা বা ইংরেজকে সাহায্য প্রদান

অধিকন্তু সম্প্রতি বিজিত শিখজাতি তাহাদের হৃত-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ইংরেজের বিপক্ষে নিশ্চয়ই যোগদান করিবে বিদ্রোহীরা এই প্রত্যাশা করিয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শিখজাতি বিদ্রোহদমনে ইংরেজের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইল—বিদ্রোহে যুক্ত হওয়া তো দূরের কথা! তদুপরি বঙ্গদেশ এবং সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারত একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকায় বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ সামর্থ্য অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই সব অঞ্চলের জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া বিদ্রোহীরা বিশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। চতুর্থতঃ, বিদ্রোহীদের পুরোভাগে পরিচালক সংখ্যায় এবং গুণবত্তায় ইংরেজ পক্ষ অপেক্ষা কম ছিল। লরেন্স, আউট্রাম, হ্যাভেলক, নিকলসন, নীল বা এডোয়ার্ডস্‌-এর মত দক্ষ ও নির্ভীক নেতা বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিল না। পরিশেষ উপায় সম্বন্ধে অর্থাৎ বৃটিশ-শক্তি বিতাড়ন ব্যাপারে সিপাহীরা একমত

(ঘ) উপযুক্ত সংখ্যক নেতার অভাব

(ঙ) উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব

হইলেও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাদের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না বৃটিশ শক্তির অবসানে ভারতে মোগল বা মারাঠা কোন শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার পরিকল্পনা করা হয় নাই। ইহার ফলে বিদ্রোহীদের কার্য্যাবলী দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

(ঙ) **বিদ্রোহের ফলাফল** ঃ—একাধিক কারণে সিপাহী সংগ্রাম ভারতের ইতিহাসে এক নূতন পথের সূচনা করিয়াছে। এই বিদ্রোহের দ্বারাই প্রমাণিত হইল যে ভারতে বৃটিশ আধিপত্যের ভিত্তি কত দুর্ব্বল। ইহার শিক্ষা ভবিষ্যতে সুদীর্ঘকাল ভারতের রাষ্ট্র-যন্ত্র পরিচালকবর্গকে শাসন-নীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাবে প্রভাবিত করিল। সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্র হিসাবে বৃটিশ জাতি ভারতে আগমন করিয়াছিল এবং সৌভাগ্যবশতঃ সমস্ত ভারতবর্ষের আধিপত্য তাহাদের করতলগত হইলেও তাহারা এই বিরাট উপ-মহাদেশের জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকিয়া শাসন নীতিতেও বণিক-বৃত্তি-সুলভ মনোবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এযাবৎ চলিয়া আসিতেছিল। বিদ্রোহের এই আকস্মিক বিপর্য্যয়ে তাহারা তাহাদের এযাবৎ অনুসৃত শাসন-নীতির মৌলিক ব্যর্থতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া ভারতের শাসন নীতি ও পদ্ধতির সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন করিল। প্রত্যক্ষভাবে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন ব্যাপারে তিনটি পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

প্রথমতঃ, বিদ্রোহ কোম্পানী-রাজত্বের অবসান ঘটাইল। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারতবর্ষের শাসনভার সামান্য বণিক-কোম্পানীর হাতে ফেলিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। স্থির হইল, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর নিজ শাসনাধীনে থাকিবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী ভারতবর্ষে যথাবিধি শান্তি ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২রা আগষ্ট পার্লামেন্টের মহাসভায় এক আইন লিপিবদ্ধ হইল। ইহার দ্বারা ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডেশ্বরীর হস্তে অর্পিত হইল। তাহার নামে রাজমন্ত্রীদিগের মধ্যে একজন বিশিষ্ট অমাত্য ভারত-সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়া পঞ্চদশ-সদস্য-সমন্বিত এক সভার সাহায্যে ভারতের

শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবেন। গভর্ণর জেনারেল "রাজপ্রতিনিধি" (Viceroy) উপাধিতে ভূষিত হইবেন।

এই ক্ষমতা হস্তান্তরকরণকে সম্পূর্ণ নূতন বলা যায় না; প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে বাস্তব পরিবর্ত্তন অপেক্ষা দস্তুর-বিধির পরিবর্ত্তন বলা যায়। কেননা, সুদীর্ঘকাল যাবৎ কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ-সভার (Board of Control) সভাপতি হিসাবে যিনি প্রকৃতপক্ষে ভারত শাসন করিতেন তিনি ইংলণ্ডের অন্যতম মন্ত্রীই ছিলেন। কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গ মাত্র পরামর্শদাতারূপে অবস্থান করিতেন।

লর্ড ক্যানিং ইংলেণ্ডশ্বরী কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণের সংবাদে এলাহাবাদে এক বিরাট দরবার করিয়া প্রচার করিলেন (১লা নভেম্বর, ১৮৫৮)। মহারাণীর তরফ হইতে ঘোষিত এই ঘোষণা পত্রকে মহারাণীর ঘোষণাপত্র বলা হয় (Queen's Proclamation) নামে পরিচিত; ইহাকে ভারতবাসীদের 'ম্যাগনাকার্টা' বলা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ভারতের জনসাধারণ ও দেশীয় রাজন্যবর্গকে জানান হইল যে অতঃপর ন্যায়-বিচার সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ-কামনা, ধর্ম্ম এবং সামাজিক ব্যাপারে নিরপেক্ষতা ও উদারতা বৃটিশের রাজ্যশাসনের মূল উদ্দেশ্য হইবে। দেশীয় নরপতিবর্গের সহিত বিভিন্ন সময়ে সন্ধি দ্বারা তাহাদের স্বত্ব ও মর্য্যাদারক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা মানিয়া লওয়া হইবে। নানা অজুহাতে দেশীয় রাজ্য গ্রাসের নীতি পরিহার করা হইবে। জাতি বা ধর্ম্ম কোন ভারতবাসীর উচ্চপদে নিযুক্ত হওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবে না। উপযুক্ত গুণানুসারে তাহারা রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে থাকিবে। বিদ্রোহ ব্যাপারে বৃটিশ প্রজার হত্যাকাণ্ডের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর সকলকে শাস্তি প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদত্ত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সমর-বিভাগই প্রধানতঃ বিদ্রোহের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া এই বিভাগকে একেবারে নূতন করিয়া গঠিত করা হইল। আগামী

পঞ্চাশ বৎসরের জন্য 'বিভাগ ও বিভেদ' ইহা বৃটিশ সামরিক বিভাগের নীতি হইয়া রহিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখা হইল। সৈন্যদলে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইল এবং সামরিক বিভাগের সমস্ত উচ্চপদ ইউরোপীয়দের হস্তে অর্পিত হইল। গোলন্দাজ বিভাগ পুরাপুরি ইউরোপীয়দের একচেটিয়া করিয়া রাখা হইল।

তৃতীয়তঃ, ইংরেজের দেশীয় রাজ্যনীতিরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। স্বত্ব-বিলোপ নীতি বাতিল করিয়া তাহাদিগকে দত্তক-গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইল। তাহাদের রাজ্য ভবিষ্যতে ইংরেজের রাজ্যভুক্ত হইবে না এই প্রতিশ্রুতি তাহারা পাইল, কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা ও অধিকার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সীমাবদ্ধ করা হইল। দেশীয় নৃপতিদের বৈদেশিক নীতির অধিকার বিলুপ্ত করা হইল, এমন কি ভারতের অভ্যন্তরেও তাহারা পরস্পরের সঙ্গে বৃটিশের মাধ্যমে ব্যতীত যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হইতে পারিবেন না বলিয়া স্থির হইল। তাহাদের সৈন্যবলও সীমাবদ্ধ করা হইল। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহারা পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পাইলেও যদি তাহাদের কুশাসন বা অন্য কার্য্যকলাপের ফলে দেশে অশান্তি বা বিদ্রোহের সম্ভাবনা হয় তাহা হইলে সাময়িকভাবে সেই বিঘ্নিত দেশীয় রাজ্য ইংরেজ গ্রহণ করিতে পারিবেন বলিয়া তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইল।

এতদ্ব্যতীত এই বিদ্রোহের অন্য দুইটি পরোক্ষ ফল পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, ভারতের শাসন ব্যাপারে ভারতবাসিগণকে এযাবৎকাল বঞ্চিত রাখার নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং শাসনকার্য্যে ভারতবাসী গ্রহণের নীতি গৃহীত হয়। সিপাহী-সংগ্রামের সময় প্রথমোক্ত ত্রুটি অনেকে উপলব্ধি করেন এবং হায়দ্রাবাদের স্যার সৈয়দ আহম্মদ প্রভৃতি বহু ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি এই ত্রুটির গুরুত্ব সম্বন্ধে ইংরেজকে সচেতন করাইবার চেষ্টা করেন। শাসন কার্য্যে ভারতবাসীকে অধিকার না দিলে শাসন কার্য্যের কোন বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে শাসিতের জনমত উপলব্ধি করা দুরূহ হয়—পক্ষান্তরে শাসক জাতিও

এই সম্বন্ধে তাহাদের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় জনগণের নিকট ব্যক্ত করিবার কোন সুযোগ প্রাপ্ত হন না। ভারতীয় মনোভাবের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় না থাকায় সিপাহী অভ্যুত্থান হওয়ার কারণ ঘটিয়াছিল। ইহা মনে করিয়া লর্ড ক্যানিং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট অনুযায়ী নব গঠিত শাসন পরিষদে পাতিয়ালার মহারাজ, বেনারসের রাজা এবং স্যার দিনকর রাওকে বে-সরকারী সভ্যরূপে গ্রহণ করেন। অতঃপর শাসন কার্য্যে ভারতীয় গ্রহণের নীতি অত্যাবশ্যকরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই বিদ্রোহের পরোক্ষ ফল হিসাবেই ভারতের রাজনীতিতে চরমবাদের সৃষ্টি হইল। এই বিদ্রোহের সময় উভয় পক্ষই চরম নিষ্ঠুর কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল—এই নিষ্ঠুরতার আতিশয্যের ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে একটা জাতি-বৈরিতা ও পারস্পরিক তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এই বিদ্বেষের মধ্য দিয়াই ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হয়, এবং পরবর্ত্তী কালের বিভিন্ন রাষ্ট্রনীতিক চিন্তাধারা এই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ভারত-বাসীকে ঈপ্সিত উদ্দেশ্য লাভে সহায়তা করে।

সপ্তম অধ্যায়

সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত ভারতের শাসন ব্যবস্থা, ১৭৫৮—১৮৫৬

(১) কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

পলাশী বিজয়ের পর যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যক্ষ শাসনাধিকারে আসিল, তদবধি ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার প্রতি ইংলণ্ড আগ্রহশীল হইল। বণিক-কোম্পানীর জন্য রচিত শাসনব্যবস্থা রাজ্য শাসনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত কি না তাহা বৃটিশ পার্লামেণ্টের স্বার্থসন্ধী বিভিন্ন রাজনীতিকদলের বিতর্কের বিষয় হইল। কিন্তু ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং এ্যাক্টের পূর্ব্বে ভারতের শাসন সম্বন্ধে কোন সুনিয়ন্ত্রিত বিধি রচিত হয় নাই। এই বিধির ফলে ইংলণ্ডে ও ভারতে কোম্পানীর কার্য্যপদ্ধতির উপর পার্লামেণ্ট খানিকটা কর্তৃত্ব করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট, ১৭৭৩ খৃঃ :—ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসন সময়ে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্ট পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। আইনের দৃষ্টিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি বণিক-সঙ্ঘ হইলেও কার্য্যতঃ ইহা ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত অংশের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। একটি সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব কয়েকজন ব্যবসায়ীর হস্তে রাখা সমিচিন নহে মনে করিয়া বৃটিশ পার্লামেণ্ট কোম্পানীর উপর কর্তৃত্বের অভিপ্রায়ে এই আইন লিপিবদ্ধ করিলেন।

এই আইনের দ্বারা অংশীদারগণের ভোটের ক্ষমতা পাঁচশত পাউণ্ড আয় হইতে এক হাজার পাউণ্ড আয়ে উন্নীত করা হইল। এযাবৎ চব্বিশ জন ডিরেক্টার মাত্র এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইত—অতঃপর তাহারা চারি বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন স্থির হইল এবং তাহাদের এক চতুর্থাংশ প্রতিবৎসর অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে ডিরেক্টারবর্গ ভারত হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ সংক্রান্ত সকল চিঠিপত্র বৃটিশ ট্রেজারীতে জমা দিবেন এবং সামরিক বা বে-সামরিক কাগজপত্র অতঃপর মন্ত্রীদের অবগতির জন্য পাঠাইবেন।

ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যের জন্য রেগুলেটিং এ্যাক্টের নিম্ন বিধানগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) বাঙ্গালার শাসনভার একজন গভর্ণর-জেনারেল এবং চারিজন সভ্য দ্বারা গঠিত এক কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত হইল। ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে গভর্ণর জেনারেলের পদে এবং ক্লেভারিং, মন্‌সন, বারওয়েল ও ফিলিপ ফ্রান্সিসকে কাউন্সিলের সভ্যপদে নিযুক্ত করা হইল। ইহারা প্রত্যেকেই পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইলেন। ইহাদের পাঁচজনের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য হইলে যে পক্ষে সংখ্যাধিক্য হইবে তাহার মতই গৃহীত হইবে। দুই পক্ষে সমান ভোট হইলে গভর্ণর-জেনারেল একটি অতিরিক্ত ভোট (কাষ্টিং ভোট) দিতে পারিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

(২) মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর প্রত্যেকটি একজন গভর্ণর ও একটি কাউন্সিলের শাসনাধীন হইল। সাধারণ শাসনকার্য্য সম্বন্ধে এই দুইটি প্রেসিডেন্সী বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র রহিল, কিন্তু অর্থনৈতিক এবং পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের (অর্থাৎ স-পারিষদ গভর্ণর জেনারেলের) কর্ত্তৃত্বাধীন হইল। কোন ভারতীয় রাজ্যের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইলে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইবে, কিন্তু যদি অনুমতি লওয়ার সময় না থাকে, অথবা কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ উক্ত বিষয়ে বিশেষ কোন নির্দ্দেশ দেয়, তবে উক্ত অনুমতির আবশ্যক হইবে না এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

(৩) বিচার কার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য কলিকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল। একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন সাধারণ বিচারপতি

দ্বারা এই কোর্ট গঠিত হইল। ইংলণ্ডেশ্বরের ভারতপ্রবাসী প্রজাগণ এবং কোম্পানীর কর্মচারিগণ এই আদালতের বিচারাধীন হইলেন। স-কাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক প্রণীত কোন কোন শ্রেণীর আইন সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইবে না এইরূপ ব্যবস্থা হইল। স্যার ইলাইজা ইম্পে ইহার প্রধান বিচাপতি নিযুক্ত হইলেন।

(৪) কোম্পানীর কর্মচারিগণ যাহাতে অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা হইল যে, কোম্পানীর কোন কর্মচারী কোন ভারতীয়ের নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং গভর্ণর জেনারেল, কাউন্সিলের সভ্যগণ ও বিচারকগণ ব্যক্তিগতভাবে বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারিবেন না।

রেগুলেটিং এ্যাক্টের ত্রুটি:—পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রীসভা কর্তৃক কোম্পানীর কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হইলে ভারতবর্ষে সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইবে লর্ড নর্থ এই আশা করিয়াছিলেন ; কিন্তু রেগুলেটিং এ্যাক্টের কয়েকটি বিশেষ ত্রুটির জন্য তাহার প্রত্যাশা সফল হয় নাই। কার্য্যকালে এই সকল ত্রুটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই এ্যাক্ট বলবৎ থাকায় ওয়ারেণ হেষ্টিংস-এর পূর্ণ শাসন সময়ে তাহাকে যথেষ্ট বিব্রত হইতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ, গভর্ণর জেনারেল সকল বিষয়েই কাউন্সিলের মতানুযায়ী চলিতে বাধ্য থাকায় বিশেষ অসুবিধার উৎপত্তি হইল। চারিজন সদস্যের মধ্যে একমাত্র বারওয়েল ব্যতীত অন্য কেহই হেষ্টিংস-এর কার্য্য সমর্থন করিতেন না ; সুতরাং হেষ্টিংসকে নানা প্রকারে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের উপর বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই। ফলে ঐ দুই গভর্ণমেণ্টের সহিত বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নানা বিষয়ে মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময়ে এই অস্পষ্টতার ফলে বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সুপ্রীম

কোর্ট এবং গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে সম্পর্ক অস্পষ্ট থাকায় উভয়ের মধ্যে ভবিষ্যতে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। সুপ্রীম কোর্ট স-পারিষদ গভর্ণর জেনারেলের উপর কর্তৃত্ব দাবি করিয়া গভর্ণর জেনারেলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা বিচারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিল। ইহাতে বিচার ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবার উপক্রম হইল। "রেগুলেটিং এ্যাক্ট-পার্লামেণ্টকে কোম্পানীর উপর, ডিরেক্টরগণকে তাহাদের অধস্তন কর্ম্মচারীদের উপর, গভর্ণর জেনারেলকে তাহার কাউন্সিলের উপর এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী-কে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপর অধিকার সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেয় নাই।" এই বিচার বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে মহারাজ নন্দকুমার সম্পর্কিত ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

নন্দকুমারের ফাঁসি

কাউন্সিলের সভ্যগণের সহিত হেষ্টিংস-এর সদ্ভাব না থাকায় তাহারা সর্ব্বপ্রকারে হেষ্টিংস-কে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সদস্যগণের মধ্যে ফ্রান্সিস গভর্ণর জেনারেলের শত্রুগণকে পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিতেছিল। মহারাজ নন্দকুমার নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ হেষ্টিংস-এর বিরুদ্ধে গুরুতর এক অভিযোগ আনয়ন করিলেন যে হেষ্টিংস বহু স্থান হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব উৎকোচ গ্রহণের মধ্যে মীরজাফরের বিধবা মণিবেগমের নিকট হইতে ৩,৫৪,১০৫ টাকা গ্রহণের কথা উল্লেখযোগ্য। হেষ্টিংস উক্ত অর্থের বিনিময়ে মণিবেগমকে নবাবের আবাসগৃহাদির উপর কর্তৃত্বভার প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদ পরিভ্রমণ কালে হেষ্টিংস মণিবেগমের নিকট হইতে দেড় লক্ষ টাকা উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন— যদিও এই জাতীয় উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া কোম্পানীর নির্দ্দেশ ছিল। হেষ্টিংস এই অভিযোগের জন্য কাউন্সিলের সভ্যগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিচারে সম্মুখীন হইতে অস্বীকৃত হইলেন। হেষ্টিংসের আপত্তি সত্ত্বেও কাউন্সিল সিদ্ধান্ত

করিল যে, হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ সত্য এবং হেষ্টিংসকে উক্ত অর্থ কোম্পানীর অর্থভাণ্ডারে জমা দিতে হইবে। হেষ্টিংস কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিলেন এবং তিনি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনয়ন করিলেন। এই উভয় মামলা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই মোহন প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদিত এক দলিল সম্পর্কে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনয়ন করিলেন (মে, ১৭৭৫ খৃঃ)। সুপ্রীম কোর্টে জুরির সাহায্যে বিচারে নন্দকুমারের অপরাধ সাব্যস্ত হইল এবং জালিয়াতির অপরাধে তাহার ফাঁসি হইল।

Miscarriage of justice

এ কথা সত্য যে, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ যথোপযুক্ত ভাবে প্রমাণিত হয় নাই এবং বিচারের ব্যভিচারের ফলেই তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। উপরন্তু, বিচারকগণ আসামীপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করার ভার লইয়া ন্যায়বিচার-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি নন্দকুমার দোষী হইলেও তাহার ফাঁসি হওয়া সঙ্গত হয় নাই। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে জালিয়াতি-অপরাধের জন্য ফাঁসি হইত, কিন্তু এই আইন ভারতীয় বিধানে ছিল না এবং বহু পরে ভারতীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

Judicial murder

কোন কোন ঐতিহাসিক ইহাকে 'Judicial murder' বা বিচারের নামে হত্যাকাণ্ড বলিয়া বর্ণনা করেন। তাহারা বলেন, মোহন প্রসাদ হেষ্টিংস-এর সৃষ্ট ব্যক্তি এবং নন্দকুমারের দ্বারা আনীত গুরুতর অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই তিনি মোহন প্রসাদের সাহায্যে শত্রুকে অপসৃত করিলেন। প্রধান বিচারপতি হেষ্টিংস-এর বাল্যবন্ধু বলিয়া তিনি ইম্পেকে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। স্বয়ং নন্দকুমারও ক্লেভারিংএর নিকট লিখিয়াছিলেন যে গভর্ণর-জেনারেল ও সুপ্রীম কোর্ট তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া তিনি আশঙ্কা করেন।

ইম্পে

পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট (Pitt's India Act) ঃ—ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালেই রেগুলেটিং এ্যাক্টের ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে। তখন পার্লামেণ্ট পুনরায় ভারতবর্ষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একটি সংশোধন-আইনের দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করা হইল এবং গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিলের সহিত সুপ্রীম কোর্টের বিবাদের পথ রুদ্ধ হইল। অতঃপর তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী পিটের (Pitt, the younger) চেষ্টায় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইল। রেগুলেটিং এ্যাক্টের ত্রুটিগুলি সংশোধন করাই এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

বাঙ্গালার গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে চারিজনের পরিবর্ত্তে তিন জন সভ্য থাকিবে বলিয়া স্থির হইল; কোম্পানীর সেনাধ্যক্ষ এই তিনজনের অন্যতম হইবেন। গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিলের মধ্যে মতভেদ হইলে গভর্ণর-জেনারেল 'কাষ্টিং ভোট' দিতে পারিবেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের উপর স-কাউন্সিল গভর্ণর জেনারেলের অধিকার সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হইল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের এক অতিরিক্ত আইনের দ্বারা গভর্ণর জেনারেলকে বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সিলের মত অগ্রাহ্য করিবার এবং প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণের অধিকার প্রদান করা হইল।

কোম্পানীর উপরে পার্লামেণ্টের অধিকার দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে ছয় জন সভ্য দ্বারা গঠিত 'বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল (Board of commissioners for the affairs of India)। এই বোর্ডের সভাপতি একজন মন্ত্রী হইলেন; তিনিই প্রকৃতপক্ষে বোর্ডের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র—নিছক বাণিজ্য-সম্পর্কিত কাগজপত্র ব্যতীত—বোর্ডের নিকট দাখিল করিতে এবং বোর্ডের নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য রহিলেন। এই বোর্ডের সভ্যগণ কোন জরুরী বা গোপন নির্দ্দেশ প্রেরণ করিবার অধিকারী হইলেন—এই নির্দ্দেশ প্রেরণের পূর্ব্বে ডিরেক্টার-

গণের এক Secret Committee-র নামমাত্র অনুমোদনের ব্যবস্থা রহিল। কোম্পানীর অংশাদারগণের ক্ষমতাও হ্রাস করা হইল। বোর্ডের নির্দ্দেশানুযায়ী ডিরেক্টারগণ কোন কার্য্য করিলে তাহা পূর্ব্ববৎ বাতিল বা স্থগিত রাখিবার কোন ক্ষমতা তাহাদের রহিল না। কোম্পানীর ডিরেক্টারগণের হস্তে শুধু কোম্পানীর কর্ম্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করার অধিকার রহিল। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে ভারত-শাসন ক্ষমতা কোম্পানীর নিকট হইতে ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে স্থানান্তরিত হইল।

পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের পর হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর শাসন-ভার অবসান হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের শাসনব্যবস্থায় তেমন কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের সংশোধন আইন ব্যতীত ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখনই কোম্পানীর সনন্দ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক পুনরনুমোদিত হইয়াছে তৎসঙ্গেই ভারতবর্ষের জন্য প্রয়োজনীয় শাসনবিধি রচনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এই সকল পরিবর্ত্তন উল্লেখযোগ্য।

১৭৮৪-১৮৫৮

ক্রমশঃ বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের সভাপতির ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া তাহাকে ভারতবর্ষের ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা করা হইল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ আইনে কোম্পানীর ভারতস্থিত সাম্রাজ্যের উপর ইংলণ্ডেশ্বরের পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হইল এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে কোম্পানীর ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার অনুমতি রহিত করা হইল। অতঃপর কোম্পানী পার্লামেণ্টের অধীনে একটি শাসন প্রতিষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিলের উপর বোম্বাই ও মাদ্রাজের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রদান করা হইল। এই ব্যবস্থায় শুধু কর্ত্তৃত্ব নহে, অধীনস্থ প্রদেশদ্বয়ের আভ্যন্তরীণ শাসন, পররাষ্ট্রনীতি, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সমস্ত গভর্ণর জেনারেলকে অর্পিত হইল। অতঃপর গভর্ণর জেনারেল জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল বৃটিশ-ভারতবাসীর জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

গভর্ণর জেনারেলকে আইন প্রণয়ন কার্য্যে সাহায্য করার জন্য আইন-সভ্য নামে একজন নূতন সভ্য নিযুক্ত করা হইল। এই অতিরিক্ত আইন প্রণয়ন ব্যতীত কাউন্সিলের অন্য কোন কার্য্যে বা আলোচনায় তিনি যোগদান করিতে পারিবেন না। প্রসিদ্ধ বাগ্মী এবং লেখক লর্ড মেকলে প্রথম আইন-সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিলের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব ও উচ্চ মর্য্যাদা পরিস্ফুট করার জন্য অতঃপর গভর্ণর-জেনারেল স-কাউন্সিল ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল নামে অভিহিত হইলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় নূতন করিয়া কোম্পানীকে সনন্দ মঞ্জুর করা হইল। পার্লামেণ্টের পুনরাদেশ ব্যতীত কোম্পানী রাজার অছি হিসাবে ভারত শাসন করিতে থাকে। এই সময় ভারতের শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইল। কোম্পানীর ডিরেক্টারগণের সংখ্যা হ্রাস করিয়া আঠারো করা হইল। পূর্ব্বে ডিরেক্টারগণ কোম্পানীর কর্ম্মচারী মনোনয়ন ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এখন প্রকাশ্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা উচ্চপদে নিয়োগের কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। আইন সভ্যকে কাউন্সিলের সাধারণ সভ্যভুক্ত করা হইল। বাংলাদেশ পৃথক একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর শাসিত প্রদেশে পরিণত হয়। এই ব্যবস্থায় প্রথম কার্য্যনির্ব্বাহক (Executive) বিভাগ ও আইন (Legislative) বিভাগ পৃথক করা হয়। পূর্ব্বে কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যই আইন রচনা করিয়া লইতেন। আইন প্রণয়ন সভা মোট ১২ জন সভ্য দ্বারা গঠিত হইল—গভর্ণর জেনারেল প্রধান সেনাপতি, গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের চারিজন সভ্য, চারিটি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট (বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) মনোনীত চার জন কোম্পানীর কর্ম্মচারী, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অন্য আর একজন বিচারপতি। এই সভার অধিবেশনে সর্ব্বসাধারণ দর্শক ও শ্রোতৃরূপে উপস্থিত হইতে পারিত এবং ইহার কার্য্য বিবরণী সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইত।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট ও পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট দ্বারা যে কার্য্যের সূত্রপাত অর্থাৎ কোম্পানীর নিকট হইতে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ করার ক্রম-নীতি—তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিভিন্ন সনন্দ মঞ্জুরের সময়ে ভারত শাসন বিষয়ে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সুতরাং সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল এবং কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল না। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বা প্রভাব প্রতিপত্তিশালী বোর্ডের সভাপতি থাকিলে ডিরেক্টারবর্গের বিরোধিতা অবশ্য বজায় থাকিত না। কিন্তু কোম্পানী সর্ব্বদাই অন্য কিছু না হৌক বোর্ডের কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু কালক্রমে কোম্পানীকে সমুদয় আধিপত্য পরিত্যাগ করিতে হইবে ইহা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কোম্পানীর হাতে শেষ পর্য্যন্ত একটি মাত্র ক্ষমতা ছিল—কর্ম্মচারী মনোয়ন করা। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এই চাকুরী প্রদানের ক্ষমতাও কোম্পানীর হস্ত হইতে তুলিয়া লওয়া হয়—প্রতিযোগিতা দ্বারা কর্ম্মচারী মনোনীত হইবে বলিয়া স্থির হওয়ার পর কোম্পানীর প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া যায়। সাধারণ নীতি অনুযায়ীই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর হস্ত হইতে ক্ষমতা গ্রহণ করিতেন—সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইহা অতি আকস্মিক-তার সঙ্গে ঘটিল মাত্র।

(২) প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা (১৭৬৫—১৮৫৬)

বঙ্গদেশ—প্রথম পর্ব্ব—১৭৬৫-'৯৩ :—১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়াও স্বয়ং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না। কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের ভার মহম্মদ রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়ের উপর ন্যস্ত করিলেন। বাঙ্গালায় রেজা খাঁ এবং বিহারে সিতাব রায় কোম্পানীর প্রতিনিধি হইলেন। সংগৃহীত রাজস্ব হইতে কোম্পানী এলাহাবাদের সন্ধি অনুযায়ী বাদশাহকে ২৬ লক্ষ টাকা এবং

বাংলার নবাবকে ৩২ লক্ষ টাকা (পূর্ব্বে ৫৩ লক্ষ ছিল) প্রদান করিত এবং অবশিষ্টাংশ নিজেদের জন্য রাখিত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় কোম্পানীর কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব না থাকায় কোম্পানী যথোপযুক্ত প্রাপ্য অর্থ হইতে বঞ্চিত হইল, বাঙ্গালার জন সাধারণেরও দুর্গতির পরিসীমা রহিল না; অথচ উপরোক্ত দুই নায়েব-দেওয়ান এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারীবর্গ বিত্তশালী হইতে লাগিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস গভর্ণর হইয়া নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিলেন। রেজা খাঁ ও সিতাব রায় পদচ্যুত হইলেন; কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ সাক্ষাৎ-ভাবে দেওয়ানীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস নায়েব-দেওয়ানের পদ উঠাইয়া দিলেন এবং কোম্পানীর কোষাগার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন। বাঙ্গালার নবাব নাবালক থাকায় হেষ্টিংস-এর সুবিধা হইল। তিনি নবাবের ভাতা কমাইয়া দিলেন এবং মণিবেগমকে নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন। হেষ্টিংস-এর এই সমস্ত কার্য্যের ফলে বাঙ্গালাদেশের প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা নবাবের অধিকার হইতে কোম্পানীর হস্তে আসিল এবং মুর্শিদাবাদের স্থলে কলিকাতা বঙ্গদেশের রাজধানী হইতে চলিল।

শাসনের প্রকৃত অধিকার কোম্পানীর হাতে আসায় শাসন ব্যবস্থা সুগঠিত করার গুরু দায়িত্ব কোম্পানীর উপর পতিত হইল। সুশাসন প্রবর্ত্তিত করার যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা ছিল। প্রথমতঃ, এযাবৎ প্রচলিত নবাবের শাসন ব্যবস্থা এমন ভগ্নদশায় উপস্থিত হইয়াছিল যে তাহার অল্প স্বল্প সংস্কার করিয়াও কার্য্য নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, একেতো কোম্পানী হঠাৎ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে শাসক-প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হইয়াছে, তদুপরি ভারতবর্ষের ভাষা, রীতিনীতি, ধর্ম্ম, সংস্কার ইত্যাদিও ইংরেজের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। এত সব অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াও হেষ্টিংস ও কর্ণওয়ালিস প্রায় কুড়ি বৎসর কাল (১৭৭২-'৯৩) শাসন-ব্যবস্থা, রাজস্ববিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক রীতি অনুসরণের পর যে পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার সার্থক

কার্য্যকারিতার উপরই ভবিষ্যতে ভারতের শাসনব্যবস্থার সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থাকে রাজস্ব ও বিচার এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) **রাজস্ব সংস্কার** ঃ—এই সময়ে কোম্পানীর আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব। দেওয়ানী লাভের পর প্রথমদিকে কোম্পানী নানা কারণে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া নায়েব-দেওয়ান উপাধিধারী কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা সকল দিক দিয়া অসন্তোষজনক হওয়ায় ১৭৭২ খৃঃ-এ কোম্পানী স্বয়ং ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করিলেন। রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য কলিকাতায় একটি 'বোর্ড অফ্ রেভিনিউ' সমিতি স্থাপিত হইল এবং প্রত্যেক জেলায় রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন করিয়া কালেক্টর নামে ইংরেজ কর্ম্মচারী ও দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত হইল।

সেকালে কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন না, জমিদারগণকে রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়া তাহাদের প্রাপ্ত অর্থের এক অংশ গ্রহণ করিতেন। জমিতে জমিদারের স্থায়ী অধিকার স্বীকার করা হইত না। যিনি সর্ব্বোচ্চ হারে খাজনা দিতে স্বীকৃত হইতেন তাহাকেই কয়েক বৎসরের জন্য জমিদারী দেওয়া হইত। নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ অতীত হইলে তাহার ঐ জমিদারীতে কোন স্বত্ব থাকিত না। ইহা পুনরায় সর্ব্বোচ্চ হারে অন্য রাজস্ব প্রদানকারীকে দেওয়া হইত। ইহার অসুবিধা বিস্তর ছিল। নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে জমিদার প্রজার অর্থশোষণ করিয়া নিজের স্বার্থ-সাধন করিতেন, জমির উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা করিতেন না। ইহাতে প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হইত এবং জমির উৎপাদিকা শক্তিও কমিয়া যাইত। কোম্পানীর পক্ষেও এই ব্যবস্থা লাভজনক ছিল না। অনেকে জমিদারী প্রাপ্তির লোভে অতিরিক্ত হারে রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইত, কিন্তু পরে ঐ প্রতিশ্রুতি অনুসারে কোম্পানীর দাবী মিটাইতে পারিত না। ফলে কোম্পানীর কোন বৎসর কত আয় হইবে তাহা অনিশ্চিত থাকিত। ইহাতে শাসনকার্য্য পরিচালনার বিশেষ অসুবিধা

হইত। সুতরাং প্রচলিত ভূমি-রাজস্ব বিধির ফলে কোম্পানী, প্রজা ও জমিদার প্রত্যেকেরই ক্ষতি এবং অসুবিধা হইত।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে প্রথমে পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারগণের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত হইল। অতঃপর এক বৎসরের জন্য জমির ভার দেওয়া হইতে লাগিল এবং ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বাৎসরিক জমার ব্যবস্থাই চলিল। উপরোক্ত অসুবিধার জন্য রাজস্ব আদায়ে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়াতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে একটা স্থায়ী বন্দোবস্তের নির্দ্দেশ দিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসকে প্রেরণ করিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস ইংলণ্ডের জমিদার বংশের লোক ছিলেন। সেই স্থানে জমিদারই জমির প্রকৃত মালিক—প্রজার সুখ-দুঃখ এবং জমির উন্নতির সহিত তাহার স্বার্থ স্থায়ীভাবে জড়িত। সুতরাং জমিদারী প্রথা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া তিনি মনে করিলেন। কিন্তু জমির প্রকৃত মালিকানা স্বত্ব কাহার, জমিদারের না গভর্ণমেণ্টের, ইহা লইয়া ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে মতভেদ ছিল; সুতরাং তাহারা এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধানে থাকিয়া আপাততঃ কর্ণওয়ালিসকে দশবৎসরের জন্য জমিদারী প্রথা প্রবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন। কর্ণওয়ালিস স্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষ স্থায়ী বন্দোবস্তের সম্ভাবনা ঘোষণা করিয়া প্রথমতঃ দশবৎসরের জন্য জমিদারী প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হইলে কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের দশশালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করিলেন। কোম্পানীকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করার বিনিময়ে জমিদারকে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করা হইল এবং বংশানুক্রমে তাহার জমিদারী স্বত্ব স্বীকৃত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল :—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আপাততঃ জমিদারের লাভ এবং প্রজার ক্ষতি হইল। জমিদার জমির মালিকরূপে গণ্য হইলেন এবং তাহার দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত হইল। তিনি স্বেচ্ছানুযায়ী প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করা বা জমি হইতে প্রজাকে বঞ্চিত করার অধিকারী হইলেন। কৃষকের পরিশ্রমলব্ধ আয়ের অংশ তিনি বিনা পরিশ্রমে ও বিনা অর্থব্যয়ে পাইতেন। পরবর্ত্তীকালে প্রজার স্বার্থরক্ষার অনুকূলে কয়েকটি প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্ত্তিত হইলেও মোটের উপর জমিদার সম্প্রদায়ই নানা প্রকার সুবিধার অধিকারী রহিলেন। তৎকালীন কয়েকটি বিখ্যাত জমিদারবংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের অব্যবহিত পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে খাজনা না দেওয়ায় জমিদারী স্বত্ব হারাইয়াছিলেন। সূর্য্যাস্ত আইন অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট দিবস অতিক্রান্ত হইলে রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারী বাজেয়াপ্ত হইবে ইহা অনেকের নিকট বোধগম্য হয় নাই। ফলে এই অপরাধে দিনাজপুর, বিষ্ণুপুর, নদীয়া প্রভৃতি স্থানের জমিদার বংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গভর্ণমেণ্টের যেমন স্থায়ী রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া সুবিধা হইয়াছে এবং একদল রাজভক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়া গভর্ণমেণ্টের সহায়ক হইয়াছে অপরদিকে জমিদারগণের দেয় রাজস্ব চিরদিনের জন্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্টের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। ফলে গভর্ণমেণ্টের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয় মিটাইবার জন্য প্রজাশ্রেণীর উপর বিবিধ কর স্থাপন করিতে হইয়াছে।

(১) জমিদারের লাভ

(২) প্রজার ক্ষতি

(৩) তৎকালীন পুরাতন জমিদার বংশের ক্ষতি

(৪) গভর্ণমেণ্টের লাভ ও ক্ষতি

(খ) বিচার ব্যবস্থা :—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার যে দেওয়ানী লাভ করিলেন তাহাতে কোম্পানী কেবলমাত্র

রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন না, বিচার ব্যবস্থাও ইহার আয়ত্তে আসিল। রাজস্ব-বিভাগের মত বিচার বিভাগেও কোন সুশৃঙ্খলা ছিল না সুতরাং কোম্পানীকে বিচার বিভাগ হাতে লইয়া রাজস্ব-ব্যবস্থার অনুরূপ পরীক্ষামূলক ভাবে একের পর এক নূতন বিধি প্রবর্ত্তনের দ্বারা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে।

কোম্পানী ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিচার বিভাগের সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। প্রত্যেক জেলায় দেওয়ানী বিচারের জন্য একটি করিয়া দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী বিচারের জন্য একটি করিয়া ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদ্ব্যতীত কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে দুইটি উচ্চতর আদালত স্থাপিত হইল। জেলাস্থিত দেওয়ানী আদালতের ভার কালেক্টার নামে বৃটিশ কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত হইল। সদর দেওয়ানী আদালত কাউন্সিলের সভাপতি ও সদস্যগণের তত্ত্বাবধানে রহিল। যদিও ফৌজদারী বিভাগ দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে রহিল এবং দেশীয় বিচারপতিগণ ভারতীয় আইন-কানুন অনুযায়ী বিচার-পদ্ধতি নিষ্পন্ন করিতে লাগিলেন, কার্য্যতঃ ফৌজদারী বিভাগের উপর কালেক্টর বা কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ প্রভাব কম রহিল না।

১৭৭৩, ১৭৮১ ও ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব-বিধি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিচার বিভাগেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেলাস্থ কোর্টগুলি আমিল নামে দেশীয় বিচারকের হস্তে অর্পিত হইল। ইহাদের সিদ্ধান্ত হইতে প্রাদেশিক কাউন্সিল বা সদর দেওয়ানী আদালতের নিকট আপিল করার অধিকার রহিল।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সদর নিজামত আদালত কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ স্থানান্তরিত হইল এবং নায়েব-নাজিমের উপর ইহার ভার অর্পণ করা হইল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত ছয়টি প্রাদেশিক সভার হস্ত হইতে বিচারের ক্ষমতা ছয়টি দেওয়ানী আদালতের উপর ন্যস্ত হইল এবং এই সকল

আদালতের কার্য্য ছয়জন বৃটিশ কর্মচারীর কর্তৃত্বাধীনে স্থাপিত হইল। মোট কথা, জেলা আদালত সমুহ বৃটিশের তত্ত্বাবধানে রহিল এবং চারিটি জেলা ব্যতীত সর্ব্বত্র বিচারের ক্ষমতা কালেক্টরের হস্ত হইতে পৃথক জজের হাতে রাখা হইল। নবাবের আমলের কর্ম্মচারী ফৌজদার-পদ তুলিয়া দেওয়া হইল এবং ফৌজদারের অধিকার জিলা-জজকে দেওয়া হইল। মুর্শিদাবাদের নায়েব-নাজিমের অধীনস্থ দেশীয় বিচারক দ্বারা ফৌজদারী অপরাধের বিচার হইতে লাগিল।

কিন্তু ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুযায়ী একজন প্রধান বিচার-পতি ও তিনজন সাধারণ বিচারপতিসহ 'সুপ্রীম' কোর্ট স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই অসুবিধার সৃষ্টি হইল। ইংলণ্ডরাজের ভারতপ্রবাসী প্রজাগণ এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এই আদালতের বিচারাধীন হইল। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট সকল শ্রেণীর লোকের উপর তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলেন এবং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ের অধিকার অস্বীকার করিয়া এই সকল বিচারালয়ের বিচারকদিগকে পর্য্যন্ত অভিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। এই আধিপত্য সংক্রান্ত সংঘর্ষ কাশীজুরার রাজার ব্যাপারে অতি তীব্র আকার ধারণ করিল। সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক কাশীজুরার বিখ্যাত জমিদার রাজার বিরুদ্ধে শমন জারি করিলে কোম্পানীর সুপ্রীম কাউন্সিল এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে উপরোক্ত রাজা বৃটিশ-প্রজা বা কোম্পানীর কর্ম্মচারী নহেন বলিয়া সুপ্রীম কোর্টের এলাকাভুক্ত নহেন। এতৎসত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্টের কর্ম্মচারিগণ যখন রাজাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইল তখন কাউন্সিল সুপ্রীম কোর্টের কর্ম্মচারিগণকে গ্রেপ্তার করার জন্য সিপাহী প্রেরণ করিলেন। এই ব্যাপারে কর্ম্মবিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই বিরোধের মীমাংসার জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পেকে কাউন্সিলের অধীনে সদর দেওয়ানী আদালতের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

ইম্পেকে এইভাবে নিযুক্ত করা হেষ্টিংস-এর পক্ষে উৎকোচ প্রদানের সমতুল্য হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বাধীনভাবে বিচার করা। কিন্তু ইম্পেকে এইভাবে স-পারিষদ গভর্ণর জেনারেলের অধীনে চাকুরী প্রদান করায় উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। অবশ্য কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিল না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট একটি নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়া সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

কর্ণওয়ালিসের সময়ে বিচার ব্যবস্থা

কর্ণওয়ালিসের সময়ে শাসন ও বিচার বিভাগে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ ব্যতীত সর্ব্বত্র জিলা-আদালত সমূহ কালেক্টরের অধীনে আনীত হইল। কালেক্টরগণকে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা হইল এবং আংশিকভাবে তাহাদিগকে ফৌজদারী বিচারেরও অধিকার প্রদত্ত হইল।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে অধিকতর পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল। রাজস্ব সংক্রান্ত বিচারের ভার প্রত্যেক জেলার কালেক্টরগণের উপর ন্যস্ত হইল। ফৌজদারী বিচারের যথেষ্ট সংস্কার করা হইল। সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল এবং মুসলমান বিচারকের পরিবর্ত্তে ইহার ভার স-পারিষদ গভর্ণর জেনারেলের হস্তে অর্পিত হইল। ভারতীয় আইনে বিশেষজ্ঞের সাহায্যে গভর্ণর জেনারেল ইহার অধ্যক্ষতা করিবেন। জেলার ফৌজদারী আদালত সমূহ বাতিল করিয়া তৎস্থলে কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা এবং ঢাকায় চারিটি ভ্রাম্যমান বিচারালয় দুইজন কোম্পানীর কর্ম্মচারীর অধীনে থাকিল এবং ইহারা বাৎসরিক দুইবার তাহাদের অধীনস্থ এলাকা পরিভ্রমণ করিয়া দেশীয় আইন বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে বিচার করিবেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস একখানি বিরাট আইনগ্রন্থ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন—তাহা Cornwallis Code নামে খ্যাত। এই কোডের মূলনীতি অনুযায়ী কর্ণওয়ালিস শাসন ও বিচার বিভাগের আমূল সংস্কার করিলেন এবং ইহাকেই ভিত্তি করিয়া পরবর্ত্তী যুগের বৃটিশ শাসনের 'ইস্পাত কাঠামো' প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি কালেক্টরকে বিভিন্নমুখী

শাসন-পদ্ধতি

কার্য্যের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া তাহাকে কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত রাখিলেন। প্রত্যেক জেলায় জজ নামধারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। অতঃপর জজ বিচার-কার্য্য সম্পাদন ও জেলার শান্তিরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলেন। পুলিশ বিভাগ তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিল। পুলিশের কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জেলা কয়েকটি থানায় বিভক্ত হইল; প্রত্যেক থানার ভার একজন দারোগার উপর ন্যস্ত হইল।

কর্ণওয়ালিস ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিলেন। হেষ্টিংসের প্রতিষ্ঠিত সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত

বিচার-পদ্ধতি

আদালতের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। প্রত্যেক জেলার দেওয়ানী মোকদ্দমার ভার জেলা জজের উপর অর্পিত হইল। একজন হিন্দু পণ্ডিত এবং একজন মুসলমান কাজি জেলা জজের সহযোগিতা করিতেন। তেইশটি জেলাকোর্ট এবং পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের জন্য তিনটি সিটি কোর্ট ছাড়াও কর্ণওয়ালিস ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্ত 'রেজিষ্টার' ও 'মুন্সেফ'-এর অধীন বিচারালয় স্থাপন করেন।

সদর দেওয়ানী আদালতের নীচে ও জেলা আদালতের উপরে চারিটি প্রাদেশিক আদালত স্থাপিত হইল। প্রত্যেক প্রাদেশিক আদালতে তিনজন

প্রাদেশিক আদালত

ইংরেজ জজ থাকিতেন। হিন্দু-আইন এবং মুসলমান-আইন সম্বন্ধে তাহাদিগকে পরামর্শ দানের জন্য কয়েক-জন ভারতীয় কর্ম্মচারী থাকিতেন। প্রাদেশিক আদালতের বিচারকগণ

বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করিয়া ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। ভ্রাম্যমান বিচারকের কার্য্য ব্যতীত ইহারা জেলা জজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শ্রবণ করিতেন। অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমায় প্রাদেশিক আদালতের বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করা চলিত। কালেক্টারগণের অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতির জন্য কলেক্টারগণ এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারীবর্গকে পর্য্যন্ত এই সমস্ত প্রাদেশিক বিচারালয়ের অধীনে আনা হইল। এমন কি, সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন প্রজার সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইলে কোম্পানী পর্য্যন্ত এই সকল বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতেন।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় মুসলমান আইন অনুসারে অপরাধীর দণ্ডবিধান হইত, কিন্তু অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি বর্ব্বরোচিত শাস্তি দেওয়া হইত না।

দ্বিতীয়তঃ, কর্ণওয়ালিস এক ভ্রান্ত নীতির বশবর্ত্তী হইয়া তাহার বিবিধ সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভারতবাসীদিগকে তিনি অবিশ্বাস করিতেন বলিয়া তাহাদিগকে তিনি উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন না, বা কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পণ করিতেন না। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ভারতবাসী-গণকে ফৌজদারী বিচারের সমস্ত বিভাগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি জমিদারগণকে তাহাদের স্থানীয় এলাকার শান্তি রক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। জমিদারের সমস্ত শান্তিরক্ষককে বরখাস্ত করা হইল এবং শান্তি রক্ষার ভার দারোগার উপর অর্পিত হইল। এই সমস্ত দারোগা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে রহিলেন। কর্ণওয়ালিস জেলার সমস্ত শাসনভার দুইজন ইউরোপীয়ানের উপর অর্পণ করিলেন—জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট, (District Judge and Magistrate) এবং কালেক্টর (Collector)। কর্ণওয়ালিস বিশ্বাস ও দায়িত্বপূর্ণ সমস্ত কার্য্য হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভারতীয়-গণকে বঞ্চিত করিলেন।

বঙ্গদেশ—দ্বিতীয় পর্ব্ব (১৭৯৩—১৮২৮) :—ত্রিশ বৎসর যাবৎ কর্ণওয়ালিস প্রবর্ত্তিত শাসন ব্যবস্থাই বহাল ছিল—প্রয়োজনানুযায়ী

স্বল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইল মাত্র। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর বহু ত্রুটির ফলে শাসন-ব্যবস্থার আবশ্যক সংশোধনের প্রয়োজন হইল। জমিদারগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেয় অর্থ দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহাদের জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাইতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট যাহা প্রতাশা করিয়াছিলেন—নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের রাজস্ব এবং একদল রাজভক্ত জমিদার উভয় হইতেই বঞ্চিত হইলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম ত্রুটি ছিল—ইহাতে প্রজার স্বার্থ যথেষ্ট ভাবে রক্ষিত হয় নাই। প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিচারালয় থাকা সত্ত্বেও রীতিমত ভূমির জরিপ না হওয়াতে এবং কি সর্ত্তে প্রজা স্বত্ববান তাহা লিপিবদ্ধ না হওয়ার দরুণ উপযুক্তভাবে প্রজার স্বার্থ রক্ষায় বিঘ্ন ঘটিল। উপরন্তু, রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমা এত অসংখ্য পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল যে বর্ত্তমান বিচারালয় সমূহ সেই সব নিষ্পত্তি করিয়া উঠিতে পারিল না; বিলম্বিত বিচার প্রজাদের পক্ষে অস্বীকৃত বিচার হইয়া পড়িল। এতদ্ব্যতীত অপরাধ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় লোকের ধন সম্পত্তি বিপন্ন হইবার আশঙ্কা হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি সমূহ সংশোধন করার জন্য ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের সপ্তম বিধি অনুযায়ী ভূমিতে প্রজার কি স্বত্ব আছে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল। খাজনা রীতিমত আদায়ের জন্য জমিদারগণের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা প্রদত্ত হইল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাজনা দিতে অসমর্থ হইলে জমিদারকে কারারুদ্ধ হইতে হইত। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। অধিকন্তু নিম্ন আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অধিক সংখ্যক মুন্সেফ ও সদর আমিনের (ভারতীয় নিযুক্ত হইল) উপর দেওয়ানী বিচারের ভার অর্পিত হইল। কালেক্টরগণকেও নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর দেওয়ানী বিচার করিবার অধিকার প্রদত্ত হইল। প্রাদেশিক বিচারালয়ে বিচারকের সংখ্যা তিনজন হইতে চারিজন করা হইল। সদর দেওয়ানী আদালতও নূতনভাবে সংগঠিত হইল—স-পারিষদ গভর্ণর-জেনারেলের

হস্ত হইতে ইহার ভার তিন জন বিচারকের হস্তে প্রদত্ত হইল, বিচারকের সংখ্যা ক্রমশঃ পাঁচজন করা হইল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট আপিল করার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। মামলার বিষয় পাঁচ হাজার পাউণ্ডের উর্দ্ধে না হইলে এই আপিল চলিত না।

শান্তিরক্ষার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা সুবন্দোবস্ত করা হইল; অধিক সংখ্যক পুলিশ নিযুক্ত হইল এবং প্রতি সহরে ও জেলার সদরে পর্য্যাপ্ত পুলিশ রাখা হইল। কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে চারিজন পুলিশ সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট-এর পদ সৃষ্ট হইল।

বঙ্গদেশ—তৃতীয় পর্ব্ব (১৮২৯-'৫৮):—লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে কর্ণওয়ালিস প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। বেণ্টিঙ্ক কয়েকটি জেলা লইয়া একটি বিভাগের সৃষ্টি করেন এবং প্রত্যেক বিভাগে কমিশনার নামে একজন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। প্রাদেশিক আপীল আদালত ও পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্ট-এর পদ তুলিয়া দেওয়া হইল এবং ইহাদের কর্ত্তব্য কমিশনারের হস্তে ন্যস্ত হইল। এতদ্ব্যতীত কমিশনারকে জিলাস্থ কালেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতে হইত। ১৮৩১ ও ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সেসন জজের কর্ত্তব্য জেলা-জজের উপর অর্পিত হইল—বিনিময়ে জেলা-জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইলেন। সুতরাং প্রত্যেক জেলার শাসনভার জজ, কালেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট ও সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীদের হস্তে অর্পিত হইল—কমিশনার ইহাদের সকলের উপরে তত্ত্বাবধায়ক রূপে রহিলেন।

এই সময়ের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন—ভারতবাসীকে শাসনবিভাগে নিয়োগ। এই কার্য্যের জন্য কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ভারতবাসীর মধ্য হইতে নিযুক্ত হইতে লাগিল। বেণ্টিঙ্ক জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট পদ সৃষ্টি করিয়া মহকুমা-শাসনের ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের শাসন ব্যবস্থায় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। এযাবৎকাল গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিল সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যতীত বঙ্গদেশের শাসনের জন্যও দায়ী ছিলেন। ইহাতে স্বভাবতঃ বঙ্গদেশের স্বার্থ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশী রক্ষিত হইলেও বৃহত্তর ভারত-সাম্রাজ্যের স্বার্থ ব্যাহত হইত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে গভর্ণর জেনারেলকে বঙ্গদেশ শাসনের ভার হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল এবং তৎস্থলে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের জন্য একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হ্যালিডে প্রথম উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা (১৭৫৭—১৮৫৮)

মান্দ্রাজ ঃ—মান্দ্রাজের প্রধান সমস্যা ছিল ভূমি-রাজস্ব আদায় করা। মাদ্রাজ প্রদেশের সমগ্র অঞ্চল এক সময়ে অধিকৃত হয় নাই এবং বিভিন্ন শক্তির হস্ত হইতে বিভিন্ন সময়ে একটু একটু করিয়া অধিকৃত হইয়াছিল বলিয়া ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাচীন প্রথা মানিয়া চলিতে হইতেছিল।

মান্দ্রাজে প্রধানতঃ দুইটি প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—মিরাস্‌দারী ও রায়তওয়ারী। মান্দ্রাজের জায়গীর ও উত্তর সরকার অঞ্চলে গ্রাম্য-প্রধান মিরাসদারগণ জমির মালিক ছিল। ইংরেজ সরকার এই সকল মিরাস্‌দারের সঙ্গে প্রত্যেক গ্রামের রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করিলেন। মিরাস্‌দারগণ সংযুক্তভাবে গভর্ণমেণ্টকে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ-প্রদানের বিনিময়ে গ্রামের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল।

(১) মিরাস্‌দারী

মান্দ্রাজের বড় মহল অঞ্চলে রায়তওয়ারী প্রথা বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। রিড ও মন্‌রো এই প্রথাকে নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ করিয়া প্রবর্ত্তন করেন। এই প্রথানুযায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে প্রজা বা রায়তের সঙ্গে খাজনার চুক্তি করিতেন।

(২) রায়তওয়ারী

এই চুক্তি একটা নির্দ্দিষ্ট বছরের—সাধারণতঃ ত্রিশ বৎসরের জন্য হইত। এই চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট খাজনা প্রদানের বিনিময়ে প্রজা জমির সম্পূর্ণ স্বত্ব ভোগ করিত। এই সময়ের মধ্যে তাহাকে জমি হইতে উৎখাত করা হইত না, বা তাহাকে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হইত না।

এই দুই প্রথার মধ্যে প্রজার স্বার্থের পক্ষে অধিক উপযোগী হওয়ায় রায়তওয়ারী প্রথা জনপ্রিয় হইল। মিরাস্‌দারী প্রথায় মিরাস্‌দারের হস্তে প্রজা-উৎপীড়নের অধিক সুযোগ ছিল।

(৩) চিরস্থায়ী বা জমিদারী প্রথা

বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার পর এই প্রথা অধিকতর উপযোগী হওয়ায় মান্দ্রাজেও ইহা প্রবর্ত্তিত হইল। মান্দ্রাজে বঙ্গদেশের জমিদার-গণের অনুরূপ 'পলিগার' ছিল। সামন্তপ্রথার ভূস্বামীদের মত ইহাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। ইহাদের অধীনে বহু সৈন্য-সামন্ত থাকিত এবং ইহারা স্ব স্ব এলাকার শান্তিরক্ষা এবং বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ইংরেজ সরকার ইহাদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদানের বিনিময়ে রাজস্বের চুক্তি করিলেন। ইহাদের হস্ত হইতে সামরিক ও বিচার ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া হইল।

মান্দ্রাজে মোটামুটি এই তিন প্রথাই প্রবর্ত্তিত হইল—মিরাস্‌দারী, রায়তওয়ারী ও জমিদারী।

মান্দ্রাজের শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় বাঙ্গালাদেশের রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। সমগ্র প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় ও জেলাগুলিকে কয়েকটি তালুকে বিভক্ত করা হইল। প্রথমে জেলা জজকে শাসন ও শান্তি রক্ষার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল, পরিশেষে ইহা কালেক্টরের হস্তে অর্পিত হয়। ক্রমশঃ কালেক্টর জেলার প্রধান রাজপুরুষ হইলেন। বাঙ্গালাদেশের কালেক্টার অপেক্ষা তাহার হস্তে অধিকতর দায়িত্ব অর্পিত হইল।

বোম্বাই ও অন্যান্য স্থান :—বোম্বাই প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা বঙ্গদেশের অনুরূপ হইল, ভূমি-রাজস্ব রায়তওয়ারী প্রথার উপর ভিত্তি করিয়া

প্রবর্ত্তিত হইল। উত্তর-ভারতের প্রদেশ সমূহে রাজস্ব প্রথায় মিরাস্‌দারী বেশী লোকপ্রিয় ও সুবিধাজনক হওয়ায় এই রীতিই সেই সকল স্থানে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশে এলফিন্‌ষ্টোন এবং উত্তরভারতে টমসন ভূমি-রাজস্ব প্রথা সুবন্দোবস্তের জন্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

রাজস্ব-বিধি
[ক] বোম্বাই
[খ] উত্তর প্রদেশ

উত্তর ভারতের অনুরূপ মিরাস্‌দারী প্রথা সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে পাঞ্জাবে প্রবর্ত্তিত হইল। কোন প্রজা নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিয়া একাধিক্রমে দ্বাদশ বৎসর কোন জমিতে বাস করিলে সেই জমিতে তাহার স্থায়ী স্বত্ব জন্মিত। উভয় স্থানেই প্রজার স্বার্থ রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট যত্নবান হইয়াছিলেন—এ বিষয়ে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পাঞ্জাব প্রজাস্বত্ব আইন ও অযোধ্যা-প্রজাস্বত্ব আইন উল্লেখযোগ্য।

[গ] পাঞ্জাব

বঙ্গদেশের বিচার পদ্ধতি বারাণসী, অযোধ্যা এবং ়াাব অঞ্চলে যথাক্রমে ১৭৯৫, ১৮০৩ এবং ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে অনুসৃত হইল। কলিকাতা অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হওয়ার বিচার ব্যবস্থার সুবিধার জন্য ১৮৩১ খৃঃ-এ এলাহাবাদে একটি সদর দেওয়ানী আদালত ও একটি সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিচার পদ্ধতি
[ক] উত্তর ভারত

বোম্বাই প্রদেশেও বাংলাদেশের অনুরূপ বিচার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—কিন্তু ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই নূতন নিয়মে একজন বৃটিশ জজের অধীনে জেলাকোর্ট সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়—এবং জেলাকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানী আদালতে আপিল করা চলিত। ছোট খাটো মামলার বিচারের ভার ভারতবাসীর হস্তে অর্পিত হয়।

[খ] বোম্বাই

সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ

কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টই কোম্পানীর যুগে প্রথম সর্ব্বোচ ধর্ম্মাধিকরণ ছিল। ক্রমশঃ মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে একটি করিয়া সুপ্রীম কোর্ট

প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব সুপ্রীম কোর্টের ইংরাজ অধিকৃত অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেণীর বৃটিশ ও ভারতীয় প্রজার উপর কর্তৃত্ব ছিল। এই সকল সুপ্রীম কোর্টের কার্য্য ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের আইন অনুসারেই চলিত, পরিশেষে ভারতবর্ষের জন্য পৃথক আইন রচিত হইয়াছিল। উত্তরাধিকারের সম্বন্ধে ভারতে হিন্দু দায়াধিকার ও মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত রীতিনীতিই প্রতিপালিত হইত।

বিচার ব্যবস্থার দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য আইন লিপিবদ্ধ করা এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা এই সময়েই ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের প্রচলিত আইন ও প্রথা সমূহের সঙ্কলন ও সামঞ্জস্য বিধান ব্যতীত নিখিল ভারতের পক্ষে কোন আইন প্রণয়ন করা দুরূহ ছিল। কোম্পানী এই বিষয়ের জন্য দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াছিল এবং বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন বিধি ও রীতিনীতি সঙ্কলনের জন্য প্রচেষ্টা করিয়াছিল। পরিশেষে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত কার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যে একটি আইন কমিশন নিযুক্ত হয়। লর্ড মেকলে এই কমিশনের উল্লেখযোগ্য সভ্য হিসাবে 'ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের' একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রস্তুত করেন। মেকলের খসড়ার উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্ত্তী সময়েই ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন প্রণীত হয়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের সর্ত্তে ভারতবর্ষে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার জন্য উল্লেখ থাকে। পুরাতন সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত যুক্ত করিয়া ভারতের কয়েকটি স্থানে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করা হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত সুপারিশ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত বিলুপ্ত করিয়া কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। নব্বই বৎসর অস্তিত্বের পর উভয় বিচারালয় বিলুপ্ত হইল। পরবর্ত্তী সময়ে এলাহাবাদে একটি হাইকোর্ট ও পাঞ্জাবে একটি চীফ কোর্ট সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

———

অষ্টম অধ্যায়

শিল্প-বাণিজ্য ১৭৫৭—১৮৫৭

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

বৃটিশ শাসনের প্রথম শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতের একদা সমৃদ্ধশালী শিল্প ও বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হওয়া। কোন স্বাভাবিক নিয়মে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের অধঃপতন ঘটে নাই, শাসক বণিক জাতি ভারতীয় শিল্পোন্নতি নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়াতে ক্রমাগত বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া অবৈধ উপায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যকে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছে। বাণিজ্য-লোভী কোম্পানী সঙ্গে বৃটিশ জাতি যুক্ত হইয়া উভয়ে সম্মিলিতভাবে এই কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করিয়াছে।

ভারতে বাণিজ্যকামী ইউরোপীয় জাতি সমূহের মধ্যে ডাচ ও ইংরেজরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাণিজ্যে অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বঙ্গদেশ সকল জাতির পক্ষে লাভজনক ব্যবসা-ক্ষেত্র ছিল এবং ডাচ ও ইংরেজ ব্যতীত ফরাসী বা দিনেমারদের এই প্রদেশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল না বলিলেই চলে। বঙ্গদেশে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভের পর ইংরেজ তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ডাচ বণিক সম্প্রদায়কে বঙ্গদেশের বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করে। অতঃপর বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ইংরেজদের হস্তগত হয়। কেবল ইংরেজ জাতিই যে বঙ্গদেশের ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তাহা নহে বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে হিন্দু, মুসলমান এবং আর্ম্মেনিয়ানগণও নিযুক্ত ছিল এবং এই সকল বণিক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও বহির্ভারতের তুরস্ক, আরব, পারস্য এমন কি তিব্বতের সঙ্গে পর্য্যন্ত বাণিজ্য সংযোগ স্থাপন করিয়াছিল। এই সকল দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করার ফলে বঙ্গদেশের লাভের অঙ্ক সর্ব্বদাই মোটা রকমের ছিল এবং এই সময়ে বাণিজ্য-মুদ্রা স্বর্ণ হওয়ার জন্য প্রচুর স্বর্ণ বিদেশ হইতে বঙ্গদেশে আমদানী হইত।

বঙ্গদেশের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে তুলা, রেশম ও রেশম জাত-দ্রব্য, চিনি, লবণ, পাট, গন্ধক এবং আফিমই উল্লেখযোগ্য ছিল। ঢাকায় প্রস্তুত মসলিন বস্ত্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদৃত হইত এবং ইহার চাহিদাও অত্যধিক ছিল। ইউরোপীয় বণিকগণ বঙ্গদেশের তুলা-জাত দ্রব্যাদি স্থলপথে ইস্পাহানে এবং জলপথে বসরা, মোচা ও জেদ্দার বাজারে রপ্তানী করিত। কাশিমবাজারের কাঁচা রেশমের চাহিদা এত বেশী ছিল যে আলিবর্দ্দী খাঁর সময়েও দেখা যায় যে ইউরোপীয় ব্যসায়ীদের রপ্তানী ব্যতীত প্রায় সত্তর লক্ষ টাকার কাঁচা রেশম কাশিমবাজারের শুল্কবিভাগ বাহিরে রপ্তানী করার জন্য ছাড়পত্র দিয়াছে। রেশম ব্যতীত বঙ্গদেশে জাত চিনিও প্রচুর পরিমাণে ভারতের অভ্যন্তরে মান্দ্রাজ, মালাবার উপকূল, বোম্বাই, সুরাট, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানে এবং ভারতের বাহিরে মস্কট, পারস্যোপসাগর, মোচা এবং জেদ্দা-য় বাণিজ্যের জন্য রপ্তানী করা হইত। অষ্টাদশ শতাব্দী মধ্যভাগ হইতে বঙ্গদেশের পাট-শিল্পও স্বল্প-পরিমাণে গড়িয়া উঠিতেছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে বঙ্গদেশের শিল্প বাণিজ্য এতখানি সমৃদ্ধি ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে পণ্য দ্রব্যের প্রয়োজনে কেবল ভারতের অন্য প্রদেশ হইতে নহে, সুদূর লোহিত সাগর, আফ্রিকার উপকূল, ম্যানিলা, এবং চীন দেশ হইতে পর্য্যন্ত বণিক সম্প্রদায় বঙ্গদেশে আগমন করিত এবং এই সকল স্থানের সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময়ে বঙ্গদেশই সর্ব্বদা লাভবান হইত। কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষতা ও প্রাচুর্য্যের জন্যই বঙ্গদেশ এই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর

পলাশী যুদ্ধের পর 'রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজের হস্তগত হওয়ায় বঙ্গদেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। ক্ষমতা হস্তান্তরের গোলযোগে দেশের অশান্তি ও অরাজকতা সাময়িকভাবে শিল্প-বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের সমূহ সর্ব্বনাশ হইল নূতন শাসক জাতির উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিধি ব্যবস্থা

বঙ্গদেশের সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া ক্রমাবনতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিম্নোক্ত কারণের ফলে শিল্প বাণিজ্যের এই দুর্গতি সম্ভব হইল।

অর্থনৈতিক লুণ্ঠন

(১) ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক লুণ্ঠন—পলাশী যুদ্ধের পর হইতে অনধিক পঁচিশ বৎসর কাল যাবৎ বঙ্গদেশ হইতে যে অগণিত ধনসম্পদ ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়াছে তাহার ফলে বঙ্গদেশ প্রয়োজনীয় মূলধন হইতে বঞ্চিত হইয়া শিল্প-বাণিজ্যের সামর্থ্য একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। মীরজাফর ও মীরকাশিম বাংলার নবাবীর মূল্য-স্বরূপ ইংরেজকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর দেওয়ানী লাভের পর বঙ্গদেশের অর্থ প্রত্যক্ষভাবে ইংলণ্ডের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে। রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত অর্থ বঙ্গদেশের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করার ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়। মোট কথা, এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রায় বা পণ্যদ্রব্যে ইংলণ্ড বঙ্গদেশ হইতে প্রায় ষাট কোটি টাকা স্বদেশে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের ফল বঙ্গদেশের পক্ষে অত্যন্ত শোচনীয় হয়—এবং বঙ্গদেশ ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া মূলধনের অভাবে শিল্প-বাণিজ্যের প্রেরণা হারাইয়া ফেলে। ভারত হইতে লুণ্ঠিত অর্থের সাহায্যে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হয়।

(২) 'দস্তক'-এর অপব্যবহার—১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী তদানীন্তন বাংলার সুবাদার সুজার নিকট হইতে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা প্রদানের বিনিময়ে নিঃশুল্ক ব্যবসায়ের অনুমতি প্রাপ্ত হন। মুর্শিদকুলি খাঁ-র সময় পর্যান্ত সম্রাট ফেরোকসিয়ারের অনুমতিক্রমে কোম্পানী এই সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু সেই সময়ে ইংরেজের সঙ্গে নবাবের এই সর্ত্ত হয় যে এই দস্তক বা নিঃশুল্ক বাণিজ্যের ছাড়পত্র বহির্বাণিজ্য অর্থাৎ রপ্তানী ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হইবে—অন্তর্বাণিজ্যে ব্যবহার করা চলিবে না। কোম্পানী ইহাতে সম্মত হয়। কিন্তু কোম্পানী বিবিধ উপায়ে এই দস্তকের অপব্যবহার করিতে আরম্ভ

করিল। প্রথমতঃ কোম্পানীকে প্রদত্ত এই দস্তকের সুবিধা লইয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ব্যক্তিগত ব্যবসা আরম্ভ করিল। দ্বিতীয়তঃ, অর্থের বিনিময়ে ভারতীয় বণিকদের নিকট এই দস্তক বিক্রীত হইতে লাগিল--অর্থাৎ এই দস্তকের বলে ভারতীয় বণিকগণ পর্য্যন্ত নবাবের প্রাপ্য শুল্ক ফাঁকি দিতে সক্ষম হইল। বহু চেষ্টা করিয়াও মুর্শিদকুলি খাঁ বা আলীবর্দ্দী খাঁ এই অবৈধ কার্য্য বন্ধ করিতে সক্ষম হন নাই। সিরাজদ্দৌলা দস্তকের এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ইংরেজের নিকট যথেষ্ট অভিযোগ করিয়াও কোন ফল পান নাই। মীরজাফরও কলিকাতার ইংরেজ গভর্ণরের নিকট দস্তকের অবৈধ প্রয়োগ বন্ধ করিবার জন্য বহুবার আকুল আবেদন জানাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও ফলোদয় হয় নাই। অধিকন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পর্য্যন্ত নিঃশুল্ক অধিকার দাবি করিল। এই দস্তক ব্যবহারের সুযোগে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অপরিমিত অর্থ-উপার্জ্জন করিতে লাগিল, পক্ষান্তরে নবাব প্রাপ্য শুল্ক হইতে বঞ্চিত হইলেন। দেশীয় ব্যবসায়িগণ এই অবৈধ প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। মীরকাশিমের আমলে দেশীয় বণিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য নবাব উদ্যোগী হইয়া প্রথমে কোম্পানীর নিকট অভিযোগ করিলেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি বাণিজ্য-শুল্ক একেবারে তুলিয়া দিলেন এবং দেশীয় এবং বিদেশীয় বণিকগণকে সম-অবস্থায় স্থাপিত করিলেন। বিশেষ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া ইংরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল—ফলে মীরকাশিমকে নবাবীচ্যুত হইতে হইল।

(৩) বাণিজ্যক্ষেত্রে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার—নিঃশুল্ক বাণিজ্যের সুবিধার ফলে একদিকে যেমন দেশীয় বণিকগণের দুরবস্থা হইতে লাগিল—অন্যদিকে রাজনৈতিক আধিপত্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কোম্পানী তূলাজাত দ্রব্যে তাহাদের একচেটিয়া ব্যবসায় বজায় রাখার জন্য দেশীয় বয়নশিল্পীদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। কোম্পানী বয়নশিল্পীদিগকে অগ্রিম অর্থ দাদন দিয়া কেবলমাত্র কোম্পানীর জন্য মাল সরবরাহ করিতে বাধ্য করিল।

অনিচ্ছুক শিল্পীরা দৈহিক শাস্তির ভয়ে কোম্পানীর প্রার্থিত চুক্তিতে সম্মত হইল। ইহার ফলে কোম্পানী বাজার দর অপেক্ষা সস্তায় মাল পাইতে লাগিল এবং কোম্পানী ব্যতীত অপর কাহারও নিকট মাল বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হওয়ায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল।

প্রচলিত কাহিনী আছে যে কোম্পানীর দাবি এবং তাহা পূরণে অসমর্থ হইলে দৈহিক শাস্তি প্রদানের মাত্রা এত অত্যধিক হইয়াছিল যে কোম্পানীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য বহু তাঁতি তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-স্বেচ্ছায় কাটিয়া ফেলিয়াছিল। সত্য বা মিথ্যা হউক, এই কাহিনীর মধ্যে কোম্পানীর বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকারের জন্য উগ্র প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরোক্ত অত্যাচারের ফল এই হইল যে ক্রমশঃ বাংলার দুইটি বিখ্যাত রেশম ও বস্ত্র-শিল্প একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অত্যাচার বন্ধ করিয়া এই দুইটি শিল্পকে পুনরুজ্জীবনের জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছিল তাহাতে আর ইহাদের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা ছিল না।

(৪) ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা—বঙ্গদেশের বস্ত্রশিল্পের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় বিলাতী বস্ত্রের আমদানী ও বিলাতী বস্ত্রের অবৈধ প্রতিযোগিতায়। বঙ্গদেশে প্রস্তুত তূলাজাত ও রেশমজাত বস্ত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা বিলাতে আমদানী হইলে এই সকল দ্রব্য অত্যন্ত সমাদৃত হয়। ইহাতে ইংলণ্ডের বস্ত্র প্রস্তুতকারিগণ অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হয় এবং উৎকর্ষতায় অথবা মূল্যের দিক দিয়া বঙ্গদেশীয় দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে অক্ষম হইয়া তাহারা বঙ্গদেশের দ্রব্য বিলাতে আমদানী বন্ধ করার নিমিত্ত আইনের সাহায্য গ্রহণ করে। ১৭০০ এবং ১৭২০ খৃষ্টাব্দে এই সম্পর্কে পার্লামেণ্ট দুইটি আইন প্রণয়ন করে—যাহার ফলে ভারতের আমদানীকৃত তূলা বা রেশমে প্রস্তুত কোন দ্রব্য বিলাতে ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে বিলাতের বাজার হস্তচ্যুত হইলেও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ভারতীয় বস্ত্র-দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা

থাকে এবং কোম্পানী এই সকল দেশে রপ্তানী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে এবং নেপোলিয়নের আধিপত্যের যুগে ইংলণ্ডের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বৈরিতা বর্ত্তমান থাকায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সকল দেশে ভারতীয় বস্ত্রাদি রপ্তানী করিতে অসমর্থ হয় এবং ফলে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

ইতিমধ্যে যান্ত্রিক উন্নতি হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের ক্রমশঃ উন্নতি হয়। অধিকন্তু আইনতঃ ভারতীয় বস্ত্রের পক্ষে বিলাতের বাজার রুদ্ধ হওয়ায় বিলাতের বস্ত্র প্রস্তুতকারীরা সুবিধা প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতশ্রেণীর বস্ত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়। অতঃপর বিলাতী বস্ত্র প্রস্তুতকারকদের প্রয়োজন হইল ভারত হইতে কাঁচা তুলা আমদানী করা এবং ভারতীয় তুলায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা ভারতের বাজারে প্রেরণ করা। বাষ্পীয়-যন্ত্রের সাহায্যে ল্যাঙ্কাসায়ার বস্ত্রশিল্পে অভাবনীয় উন্নতি করিল এবং স্বল্প মূল্যের বস্ত্রে ভারতের বাজার প্লাবিত করিয়াছিল। ১৭৭৬ হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে প্রায় বার লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিলাতী বস্ত্রের আমদানী হইয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যে বস্ত্র আমদানী হয় তাহার মূল্য ছিল এক কোটি চুরাশি লক্ষ পাউণ্ড। ক্রমশঃ এই অঙ্ক অসম্ভবরূপে স্ফীত হইয়া হইয়া উঠে।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ অথবা নেপোলিয়নের যুদ্ধের অবসানে পুনরায় ভারতীয় বস্ত্রের বাণিজ্য ইউরোপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল বাষ্পচালিত যন্ত্রের সাহায্যে সুতা ও বস্ত্র প্রস্তুতের আবিষ্কার হওয়াতে সে প্রত্যাশা সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইল। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন অথবা যান্ত্রিক-সুবিধা প্রবর্ত্তনের জন্য কেহই উদ্যোগী হইল না। ফলে বস্ত্র-শিল্প ও বাণিজ্যের অপমৃত্যু ঘটিতে বিলম্ব হইল না।

এই প্রকারে পলাশী যুদ্ধের অনধিক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া প্রাচীন কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইল।

কেবল যে বাংলার বিখ্যাত শিল্পসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল তাহা নহে, রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে বাণিজ্যিক অধিকারও ভারতীয়দের হস্ত হইতে ইংরেজের আয়ত্তে আসিল এবং দেশীয় শিল্পী ও বণিককুল ইহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার উদ্যম ও প্রেরণা পর্য্যন্ত হারাইল। ভারতীয় ধন সম্পদ বিদেশে চলিয়া যাওয়ায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের যেমন মুলধনের অভাব ঘটিল তেমনি বৃটিশ অধিকারের প্রথম পর্য্যায়ে বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার জন্য হৃত বাণিজ্য শক্তি পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হওয়ায় দেশের জনসাধারণ অনিশ্চিত বাণিজ্যে মূলধন নিয়োগ করা অপেক্ষা জমিতে মূলধন নিয়োগ করা অধিকতর লাভজনক মনে করিল। বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগের উদ্যম ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইল। দেশের বাণিজ্য ক্রমশঃ বিদেশী বণিকদের হস্তগত হইল—দেশের বা দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগ রহিল না।

যে যে কারণে বঙ্গদেশের শিল্পবাণিজ্যের অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহা ভারতের অপরাপর অঞ্চলের পক্ষেও প্রযোজ্য। ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের অবনতির সূত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পার্লামেণ্টের ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের প্রতি বিদ্বিষ্ট-নীতি, কলে প্রস্তুত সস্তা বিলাতী দ্রব্যের প্রতিযোগিতা এবং দেশীয় শিল্পবাণিজ্যকে রক্ষার প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের অনিচ্ছা বা অক্ষমতা-জনিত ঔদাসীন্য—সমস্ত মিলিয়া ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।

ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বের পরিমাণ কতটুকু সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। বিখ্যাত অর্থনৈতিক রাসব্রুক উইলিয়মস্ এ সম্বন্ধে বৃটিশের দায়িত্ব অস্বীকার করেন। তাহার মতে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবই এই ধ্বংসের জন্য দায়ী। যান্ত্রিক শিল্পোন্নতির ফলে স্বল্প ব্যয়ে প্রস্তুত অথচ পরিমাণে অত্যধিক বস্ত্র-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না এবং ভারতীয় তদানীন্তন শাসকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও বাষ্পীয় যন্ত্রজাত এবং ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত বস্ত্র-ব্যবসায়ের আভ্যন্তরীণ লাভ ক্ষতির তারতম্য ঘুচাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। আইনের সাহায্যে ভারতীয় শিল্পের রক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন—ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের উদ্ভাবিত অর্থনৈতিক নীতি, সেই যুগে ইহার প্রয়োগ প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক।

উপরোক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে দেশী এবং বিদেশী উল্লেখযোগ্য লেখকগণ বলেন যে—ইংলণ্ডের যে শিল্প-বিপ্লব ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছে তাহা ভারত হইতে লুণ্ঠিত ধনের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। ইংরেজ যে কেবলমাত্র ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য রক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল তাহা নহে, ভারতের বাণিজ্যাদি যাহাতে প্রসার লাভ করিতে অসমর্থ হয় তজ্জন্য বিভিন্ন প্রকারে তাহারা প্রতিবন্ধকের পর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উৎসাহ নষ্ট করিয়া পরোক্ষভাবে ইংলণ্ডের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির কাজে সাহায্য করিয়াছে। আইনের সাহায্যে শিল্প বাণিজ্য রক্ষা করা যে আধুনিক যুগের নীতি রাসব্রূকের এই মন্তব্যের উত্তরে ইহারা বলেন যে—এই নীতি ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের চিন্তাশীলদের অজ্ঞাত ছিল না এবং বাস্তবপক্ষে পার্লামেণ্ট ভারতীয় প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে বিলাতের শিল্পবাণিজ্য রক্ষার জন্য একাধিকবার আইনের সাহায্যে রক্ষণ-ব্যবস্থা করেন। ভারতের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারিত। ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য রক্ষণের প্রচেষ্টা করিলে ইংলণ্ডের শিল্প-বাণিজ্য অগ্রসর হইতে পারিবে না—এই মনোভাবের জন্যই ভারতে এই নীতি প্রযুক্ত হয় নাই, ইহাই প্রকৃত সত্য। ভুয়োদর্শিতার অভাবে নহে, ইচ্ছার অভাবেই এই নীতি কার্য্যকরী হয় নাই।

নবম অধ্যায়

নব ভারতের সূচনা

(ক) নব-ভারত ও রাজা রামমোহন রায়

ইংরেজ অধিকারের প্রথম শতাব্দী (১৭৫৮-১৮৫৮) রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দিক দিয়া ভারতের জীবনে ক্ষতিকর বিপর্য্যয় আনয়ন করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের নব উন্মেষশালিনী প্রতিভাকে নষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। এই সময়ে ভারতীয় মনীষা বহুক্ষেত্রে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ভারতের সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে বিপ্লবী পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন করিয়াছে। এই মানসিক বিপ্লবের ফলেই ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগে উন্নীত হইতে সক্ষম হইল।

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের ফলে এই পরিবর্ত্তন সূচিত হইল। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবাদর্শ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল এবং এই সকল ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া বিশিষ্ট চিন্তানায়কগণ ভারতীয় ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজকে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের বিচারের মানদণ্ড হইল বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে যুক্তি, কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞান এবং জড়ত্বের পরিবর্ত্তে প্রাণস্পন্দন। চিরাচরিত শাস্ত্রবিধির নূতন ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল এবং ইহার ফলে নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের নব রূপান্তর সম্ভব হইল।

এই নূতন ভাবধারায় দীক্ষিত স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন ব্যক্তি পাশ্চাত্যের যুক্তিমূলক শিক্ষাকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করিলেন এবং দেশের জনগণের মধ্যে ইহা সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করিলেন। জনসাধারণের কুসংস্কারের ভিত্তিকে অল্প সময়ে বিচলিত করা অবশ্য সম্ভব ছিল না। সুদীর্ঘকাল প্রচেষ্টার পর দেশ এই নবধর্ম্মকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথম উপাদেয় ফল রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার উপযোগিতা প্রচার করিবার এবং দেশবাসীর নিকট তাহার যৌক্তিকতা উপস্থাপিত করিবার জন্যই যেন উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। ঈশ্বরের 'একেশ্বরবাদ' প্রচার করিয়া হিন্দুর প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসে রামমোহন প্রথম আঘাত করেন। তিনি শাস্ত্র হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে পৌত্তলিকবাদ হিন্দুধর্ম্মের মূলে ছিল না, পরে তাহা হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। রামমোহন স্বীয় মতবাদকে জনসাধারণের গোচরীভূত করার জন্য বাংলা ভাষায় হিন্দু শাস্ত্র সমূহ অনুবাদ করিতে লাগিলেন এবং এ সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত করিলেন। মুখ্যতঃ তাহার আন্দোলনের ফলেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি হয়। অধিকন্তু তাহার এই সমস্ত প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে বাংলা গদ্য এবং সাংবাদিকতার জন্ম হয়। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে উনবিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতেই তিনি একক প্রচেষ্টার বলে বাংলাভাষার জন্য সংস্কৃত হইতে মুক্ত একখানা স্বাধীন ব্যাকরণ লেখার প্রয়াস করিয়াছিলেন।

সংস্কার ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রচেষ্টা বহুমুখী ছিল। হিন্দু সমাজের মধ্যে যথেষ্ট অবিচার ও অযৌক্তিকতা ছিল—তিনি এই সকল অন্যায় অবিচারের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন; কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার সময়েই সেই সকল অনাচার দূরীভূত হইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার পরবর্ত্তী যুগে জনমত তীব্র হইয়া সামাজিক অনাচার দূর করিতে বাধ্য করিয়াছে। হিন্দু সমাজের অনিষ্টকর জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ, বৈধব্য প্রভৃতি সকল কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করিয়া ছিলেন। হিন্দুনারী যাহাতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার উত্তরাধিকারিত্বের দাবি স্বীকৃত হয় তজ্জন্য তাহার প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না। জাতিভেদ ও হিন্দুনারীর তৎকালীন দুরবস্থা এই দুইটির বিপক্ষেই তিনি মুখ্যতঃ তাঁহার আন্দোলনকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও রামমোহন পরবর্ত্তী যুগের জাতীয়তাবাদীদের চিন্তাধারার অগ্রনায়ক ছিলেন এবং তাহার অনুমোদিত নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজনীতিক আন্দোলন অর্দ্ধশতাব্দী পরে 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' নীতি হিসাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাহাকে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহাপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রামমোহন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাহায় অসামান্য প্রতিভার স্পর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং তিনি কয়েকটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড হেষ্টিংস সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করেন তখন তিনি সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সম্রাটের সমীপে আবেদন করেন। এই বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলেও তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম প্রচেষ্টাকারী বলিয়া খ্যাত।

তৎকালে মাত্র খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী লোক জুরীর বিচারে জুরীর সভ্য হইতে পারিত। ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও মুসলমানকে জুরী হইতে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেন। জমিদারী প্রথার ফলে প্রজার স্বার্থ যে একেবারে অবহেলিত হইয়াছে তাহার প্রতিও রামমোহনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং প্রজার স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি যথেষ্ট আন্দোলন করেন। তৎকালীন শাসনপদ্ধতির ফলে ভারতবাসীর দাবী যে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছিল তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন এবং এই সম্পর্কে ভারতবাসীর বক্তব্য পার্লামেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করাও তাহার বিলাত গমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের নিকট এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র পর্য্যন্ত প্রেরণ করেন। ঐ সকল আবেদনপত্রের মর্ম্ম হইতে সমসাময়িক ভারত-মানসের চিন্তাধারার উৎকর্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিলে রাজা রামমোহন রায়কে উনবিংশ শতাব্দীর যাবতীয় সংস্কারপন্থী 'আন্দোলনের জনক' বলা যাইতে পারে। বিচার বিভাগ ও কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের পৃথকীকরণ, সমরবিভাগ

ভারতীয়করণ, লিপিবদ্ধ আইন সঙ্কলন, সতীদাহ নিবারণের যৌক্তিকতা, ফার্সীর পরিবর্ত্তে ইংরেজী প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ে তিনি সুচিন্তিত মতামত প্রচার করেন। নব ভারতের জাতীয় জাগরণের তিনিই ছিলেন প্রভাতী শুকতারা।

(খ) ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন

ইংরেজ আধিপত্যের প্রাথমিক যুগে ভারতবর্ষের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রাচীন প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দুর পক্ষে গুরুগৃহে 'টোলে' এবং মুসলমান-গণের মক্তব বা মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ হইত এবং এই শিক্ষায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বা আরবী ও ফার্সী ব্যতীত মাতৃভাষার কোন স্থান ছিল না। প্রাচীনপন্থী শিক্ষা গ্রহণের ফলে ভারতবর্ষের মন মধ্যযুগীয় ইউরোপের মত স্বল্পগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল ; পরিবর্ত্তনশীল বহির্জগতের সঙ্গে তাহার সংযোগ-সূত্র একেবারেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ দেশীয় শিক্ষার প্রতি উদাসীন থাকেন। ওয়ারেণ হেটিংস ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশীয় শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্যার উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর রেসিডেণ্ট জোনাথান ডাঙ্কান বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্যার জন গ্রাণ্ট নামে একজন সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারী প্রথম উপলব্ধি করেন। ভারতবাসীর সামাজিক দুরবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে যে তাহাদের অ-শিক্ষা দূর করা প্রাথমিক প্রয়োজন এবং ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত তাহা সম্ভব হইতে পারে না তাহা গ্রাণ্ট ব্যক্ত করেন। কিন্তু কর্ত্তপক্ষের সহানুভূতির অভাবে গ্রাণ্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

সরকারী কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইলেও খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় এবং কয়েকজন মহাপ্রাণ শিক্ষাব্রতীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে বঙ্গ ও মাদ্রাজ

প্রদেশে বহু ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতীয় শিক্ষার সূত্রপাত হইল। যে সকল মহাপুরুষের নিকট ভারতবর্ষ ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাতের জন্য ঋণী উইলিয়ম কেরী তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। শুধু ইংরেজী শিক্ষা নহে, বাংলা গদ্যের সূত্রপাতও এই সকল মিশনারীদের প্রচেষ্টার ফলে হয়। অতঃপর ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায় ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হন এবং তাহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে হিন্দু কলেজ, —যাহা পরবর্ত্তী যুগে প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়—প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রমশঃ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টেরও ভারতবাসীদের শিক্ষার ব্যাপারে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর সনন্দ পুনর্মঞ্জুর করিবার সময় পার্লামেণ্ট নির্দ্দেশ দিলেন যে অতঃপর কোম্পানীকে ভারতবাসীর মধ্যে দেশীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রসারের জন্য বাৎসরিক অন্যূন এক লক্ষ টাকা পৃথকভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য হইয়া উঠে নাই। উক্ত বৎসরে একটী কমিটি অফ্ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসান বঙ্গদেশে গঠিত হয় এবং এই কমিটির উদ্যোগে কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। উপরোক্ত সরকারী অর্থ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত, অথবা আরবী বা ফার্সী শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যয়িত হইতে দেখিয়া রাজা রামমোহন রায় এই উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত প্রতিবাদপত্রে রামমোহন দেশীয় শিক্ষায় সরকারী অর্থব্যয় করিতে নিষেধ করিয়া ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য আবেদন জানান; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট রামমোহন এবং তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতানুসারী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল না। ইতিমধ্যে বে-সরকারী প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা অগ্রসর হইতে লাগিল। খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় ও কতিপয় দেশীয় ব্যক্তি ইংরেজী শিক্ষার জন্য কেবল বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না, ইহারা উদ্যোগী হইয়া ইংরেজীতে লিখিত পুস্তক বিক্রয় করার জন্য 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন।

দেশীয় শিক্ষার জন্য অথবা ইংরেজী শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহা লইয়া তুইটি দলের সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে উভয় পক্ষে এত বাদানুবাদ উপস্থিত হয় যে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মনঃস্থির করা শক্ত হইয়া উঠে। আলেকজাণ্ডার ডাফ্ কমিটি অফ পাব্লিক ইনষ্ট্রাকসানের সভ্য হওয়াতে পাশ্চাত্যপন্থীদের সুবিধা হয়। বেণ্টিঙ্কের সময়ে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহাতেও পাশ্চাত্যপন্থীদের জয় হইল। শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দেশের যে কুসংস্কার ছিল তাহাও দূরীভূত হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলে আইন-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিলে ভারতীয় শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট পন্থা গৃহীত হইল। প্রাচ্য শিক্ষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে মেকলের বিখ্যাত উক্তির ফলে প্রাচ্য শিক্ষার মূল্য কমিয়া গেল এবং মেকলের সমর্থনের বলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই মার্চ্চ সিদ্ধান্ত হইল যে অতঃপর গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় অর্থ ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ পদ্ধতিতেও ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের দাবি অগ্রগণ্য হইবে বলিয়া স্থির করা হইল। ইংরেজী শিক্ষা এইভাবে সরকরী আনুকূল্য পাওয়াতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আদৃত হইল এবং ইহার প্রসার পরিণামে অবশ্যম্ভাবী হইল।

ইংরেজী শিক্ষার ত্রুটি

অবশ্য ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনে দেশীয় শিক্ষা সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পুরাতন দেশীয় শিক্ষায় 'বিষয়গত ত্রুটি' ছিল সত্য এবং আধুনিক যুগোপযোগী ছিল না। কিন্তু তাহাতে জনসাধারণকে স্বল্পব্যয়ে প্রকৃত শিক্ষিত করিয়া তুলিবার অবকাশ ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা মুষ্টিমেয় উচ্চ সম্প্রদায়ের বস্তু হইল; তাহাতে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার রহিল না। এই অসুবিধা প্রধানতঃ বঙ্গদেশেই হইল; কেননা এই প্রদেশেই ইংরেজী শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা অত্যধিক ছিল, অন্যত্র পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতিই বহাল রহিল। দ্বিতীয়তঃ প্রথমাবধি ইংরেজী শিক্ষা সাহিত্য-সম্পৃক্ত হইয়া রহিল এবং ইংরেজী শিক্ষা বিধির সঙ্গে ধর্ম্ম বা নীতি-ধর্ম্মের কোন যোগ রহিল না। এই ধর্ম্ম ও নীতি-বর্জ্জিত এবং সাহিত্য-বিলাসী ইংরেজী শিক্ষা

অভিপ্রেত ফল প্রসব করে নাই সত্য, কিন্তু এই ইংরেজী শিক্ষার বলেই ভারতবাসীরা শাসন কার্য্যের অংশ গ্রহণে অধিকার প্রাপ্ত হইল এবং ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই তাহারা ইংলণ্ডের তৎকালীন উদার ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় শিক্ষা-পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেও প্রধানতঃ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস উডের ডেস্‌পাচের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী যুগের শিক্ষানীতির পরিচালনা হইয়াছিল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনায় এদেশীয় শিক্ষা নীতি বিচ্ছিন্ন-ভাবে অনুসরণ না করিয়া শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ স্তর হইতে সর্ব্বনিম্ন স্তর পর্য্যন্ত প্রতি স্তর উত্তমরূপে গঠনের ব্যবস্থা হইল। গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা প্রসারের জন্য শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করিলেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক পরিদর্শক নিযুক্ত হইল। উচ্চতম শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হইল এবং এই সুপারিশক্রমে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এবং ১৮৫৭ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাইতে, মাদ্রাজে, লাহোরে এবং এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ডেস্‌পাচে ইংরেজী শিক্ষার উপর জোর দিলেও ভারতীয়শিক্ষার মাধ্যম যে ভারতীয় ভাষা হওয়া উচিত এবং কোম্পানীর উদ্দেশ্যও তাহাই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছিল।

(গ) সমাজ সংস্কার

প্রথমদিকে ইংরেজগণ ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন বা সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। বরঞ্চ তাঁহারা দেশীয় সামাজিক প্রথা এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া সমালোচনার পাত্র হইয়াছিল। শিক্ষা প্রচারের সুযোগ লইয়া পাছে খৃষ্টান মিশনারীরা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া শিক্ষা প্রসারের হন্তারক হন—এই বিষয়ে পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন এবং শিক্ষা নীতিতে এই জন্যই ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কিন্তু কালক্রমে গভর্ণমেণ্ট সমাজ ও ধর্ম্ম ব্যাপারে উদাসীন থাকিতে

পারিল না। ১৮৩২ ও ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আইনে ধর্ম্মান্তরিত ব্যক্তির পক্ষে সম্পত্তি বা চাকুরীর ব্যাপারে যে প্রতিবন্ধকতা ছিল তাহা সম্পূর্ণ উঠিয়া গেল। ক্রমশঃ ইংরেজকে সমাজ সংস্কারের জন্য সক্রিয় নীতি গ্রহণ করিতে হইল। ভারতবর্ষের প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের অনুরোধে এবং মানবতার কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ইংরেজ বহু অনিষ্টকর সামাজিক বিধি রহিত করে। গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথা, রাজপুতনায় শিশুকন্যা হত্যা, সতীদাহ প্রথা, ক্রীতদাস প্রথা, উড়িষ্যায় খন্দ জাতির মধ্যে নরবলি প্রথা ইত্যাদি বহু প্রচলিত সামাজিক ও ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট কুপ্রথা ক্রমশঃ আইনের সাহায্যে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। লর্ড বেন্টিঙ্ক ও লর্ড হাডিঞ্জের সময়েই প্রধানতঃ উপরোক্ত সমাজ সংস্কার সাধিত হয়। এই সকল অনিষ্টকর ও নিষ্ঠুর প্রথা উচ্ছেদ কার্য্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দেশীয় শিক্ষিত সমাজের সমর্থন প্রাপ্ত হন। সংরক্ষণপন্থী এক শ্রেণীর হিন্দু বহু ক্ষেত্রেই সমাজ-সংস্কার কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিরা প্রগতিমূলক পরিবর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বেন্টিঙ্কের সংস্কার কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'ঠগী' সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ঠগী নামে দস্যু সম্প্রদায় ছদ্মবেশে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালাইত। ঠগীরা প্রধানতঃ নিরীহ পথিকদিগকে অনুসরণ করিত এবং সুযোগমত নির্জ্জনস্থানে তাহাদের গলায় রুমাল বা দড়ির ফাঁস লাগাইয়া হত্যা করিত। ঠগী দলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল এবং ইহারা কালীর উপাসক বলিয়া পরিচিত ছিল। কালীর নির্দ্দেশমত ঠগীরা তাহাদের এই নিষ্ঠুর বৃত্তি অনুসরণ করিত বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত। ইহারা লুণ্ঠন বৃত্তিতে সর্ব্বত্র স্থানীয় জমিদার বা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইত। বেন্টিঙ্ক ঠগী দমনের জন্য স্যার উইলিয়ম শ্লীম্যান নামক সুযোগ্য ব্যক্তির উপর ভার অর্পণ করেন। শ্লীমানের চেষ্টায় ১৮৩১-'৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিন সহস্রাধিক ঠগী ধৃত হয়। অতঃপর ভারতবর্ষ হইতে ঠগীর উপদ্রব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ

(আধুনিক ভারত)

১৮৫৮—১৯৩৭

নির্ব্বিবাদ শাসন ও স্বায়ত্তাধিকার প্রদানের ক্রম-বিকাশ

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক, ১৮৫৮—১৯০৫

(ক) আফগানিস্থান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সকল ক্ষেত্রেই যে ভারতীয় পর-রাষ্ট্রনীতি ভারতের স্বার্থে অনুসৃত হইয়াছিল তাহা নহে, বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হইতে লাগিল। লণ্ডনের হোয়াইট হল প্রকৃত প্রস্তাবে বহির্ভারতীয় নীতি পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

আফগান-নীতি :—প্রথম আফগান যুদ্ধের পর ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে কিছুকাল সম্প্রীতি বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরাজয়ের পর রাশিয়ার অগ্রসর-নীতি দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে প্রতিহত হইলে তাহার দৃষ্টি পুনরায় মধ্য এশিয়ায় পতিত হইল। আফগানিস্থানের সীমান্তের দিকে রাশিয়ার ক্রমাগ্রসর-নীতি ইংলণ্ডকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল এবং ইংলণ্ড রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য সক্রিয় হইল।

প্রথম আফগান যুদ্ধের পর আমীর দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে ইংরেজের মৈত্রীভাব দৃঢ় হইয়াছিল পারস্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় দোস্ত মহম্মদ আত্মরক্ষার জন্য ইংরেজের শরণাপন্ন হন। ইংরেজের হস্তক্ষেপে পারস্যের আক্রমণ হইতে দোস্ত মহম্মদ রক্ষা পান, কিন্তু দোস্ত মহম্মদ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের আপত্তি সত্ত্বেও হিরাট বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। ইহাতে ইঙ্গ-আফগান মৈত্রী কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়।

দোস্ত মহম্মদের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার লইয়া তাহার ষোল পুত্রের মধ্যে সুদীর্ঘ পাঁচবৎসরব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ চলে এবং পরিশেষে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে

মৃত আমীরের তৃতীয় পুত্র শের আলি সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী সমূহকে পরাজিত করিয়া কাবুলের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই গৃহবিবাদের সময় ইংরেজ বিবদমান পক্ষ সমূহের কাহাকেও সমর্থন করে নাই এবং এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া নিষ্ক্রিয় থাকে। শের আলি তিনবার এবং অন্যান্য ভ্রাতৃগণও কয়েকবার ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করে; কিন্তু তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল স্যার জন লরেন্স (১৮৬৪-'৬৯) সকল প্রার্থীকেই প্রত্যাখ্যান করেন। পরিণামে শের আলি আমীর পদ লাভ করিলে লরেন্স স্বীকৃতি জানাইয়া তাহার সাহায্যার্থ অর্থ প্রদান করেন।

লরেন্সের 'Masterly inactivity নীতি

লরেন্স অনুসৃত আফগান নীতিকে 'masterly inactivity' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত কোন পক্ষকে সমর্থন না করিয়া বিবাদের অবসানে জয়ী পক্ষকে স্বীকার করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। অনেকে লরেন্সের এই নীতির সমর্থন করেন, কেননা উপরোক্ত অবস্থায় বৃটিশ কোন পক্ষকে সাহায্য প্রদান করিলে রাশিয়া বা পারস্য অন্য কোন পক্ষকে সমর্থন করিয়া আফগানিস্থানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। কিন্তু বৃটিশ নিরপেক্ষ থাকিলে ন্যায়সঙ্গতভাবে অপর কোন বৈদেশিক শক্তির পক্ষে আফগান ব্যাপারে সক্রিয় হওয়া অসুবিধাজনক। ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা কম ছিল।

সমালোচনা

পক্ষান্তরে লরেন্সের এই 'নিষ্ক্রিয়' নীতির ত্রুটিও ছিল। বৃটিশের সাহায্য বিমুখ কোন পক্ষ নিরুপায় হইয়া রাশিয়া বা পারস্যের সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারে; বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে এই সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্র আফগানিস্থানে প্রভাব বিস্তারের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে তাহারা বৃটিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে অগ্রসর হইয়া আসিবেই। এই নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্ত্তে যদি বৃটিশ উদ্যোগী হইয়া আফগান ব্যাপারে হস্ত প্রসারণ করিত তাহা হইলে তাহাদের সমর্থন

পুষ্ট পক্ষ জয়ী হইয়া আফগানিস্থানকে বিদেশী রাষ্ট্রের ক্রীড়নক হওয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিত। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল শের আলি ইংরেজের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া স্বীয় ক্ষমতা রক্ষার জন্য রাশিয়ার দিকে ক্রমশঃ ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিলেন।

আফগানিস্থানের গোলযোগের সুযোগে রাশিয়া মধ্য এশিয়ায় তাহার সাম্রাজ্য প্রসারিত করিত লাগিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বোখারা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সমরখন্দ এবং পাঁচ বৎসর পরে খিবা রাশিয়ার হস্তগত হইল। রাশিয়ার এই কর্ম্মব্যস্ততায় বৃটিশ শঙ্কিত হইয়া আফগানিস্থানের আমীরকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিল। রাশিয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত আমীরও বৃটিশের মৈত্রীলাভের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবে ইঙ্গ-আফগান মৈত্রীর সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়া গেল। লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-'৭২) আম্বালায় বহু আড়ম্বরে শের আলিকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু শের আলি বৃটিশ সাহায্যের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি কামনা করিলে মেয়ো তাহাকে নিরাশ করিলেন—নিছক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা ব্যতীত অন্য কিছু আশ্বাস বাণী দিলেন না। পরবর্ত্তী গভর্ণর জেনারেল নর্থব্রুক-এর (১৮৭২-'৭৬) সময়েও একই আফগান নীতি অনুসৃত হইল। ইংলণ্ডের উদারনৈতিক প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন রাশিয়ার অগ্রসর নীতির পশ্চাতে কোন দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে বলিয়া মনে করিলেন না। শের আলি ইংরেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টায় বারংবার ব্যর্থ হইয়া ইংরেজদের প্রতি বিরূপ এবং রাশিয়ার সহিত মিত্রতা-স্থাপনে আগ্রহশীল হইয়াছিলেন। রাশিয়ার আফগানিস্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে উৎসুক হইয়া শের আলির সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করিল।

লর্ড মেয়ো

লর্ড নর্থব্রুক-এর সময়ে আফগান নীতি

দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধঃ—ইতিমধ্যে বিলাতে মন্ত্রিসভার পতন ঘটিল এবং উদারনৈতিক গ্লাডষ্টোনের পরিবর্ত্তে রক্ষণশীল এবং উৎকট

সাম্রাজ্যবাদী ডিসরেলী প্রধান মন্ত্রী হইলেন লর্ড সেলিসবারি ভারতসচিবের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ডিসরেলীর সময়ে আফগান নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি রাশিয়ার ক্রমাগ্রসরকে ভারত সাম্রাজ্যের পক্ষে আশঙ্কাজনক মনে করিলেন। নর্থব্রুকের পরবর্ত্তী গভর্ণর জেনারল লর্ড লিটন (১৮৭৬-'৮০) ডিসরেলীর নির্দ্দেশে আমীরের উপর বৃটিশের প্রভাব বিস্তার করিতে যত্নবান হইলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিল। আমীর শের আলি ইতিপূর্ব্বে লর্ড নর্থব্রুকের নিকট সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না পাইয়া রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। লর্ড লিটন যদি আমীরের প্রতি আন্তরিক বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে হয়তো আমীর পুনরায় ইংরেজের প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন হইতেন। কিন্তু লর্ড লিটন ইহার পরিবর্ত্তে আমীরকে নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন করিয়া এবং কালাতের খাঁনের নিকট হইতে কোয়েটা গ্রহণ করার পর সেই স্থানে বৃটিশ সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া শের আলীর সন্দেহ বৃদ্ধি করিলেন। লর্ড লিটনের মনে হিরাট ও কান্দাহার জুড়িয়া একটি বৃটিশ আশ্রিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প উদিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে রুশিয়া বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিমূলক এক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া কাবুলে রুশ-দূত প্রেরণ করিল এবং রাশিয়ার সঙ্গে উক্ত মর্ম্মে সন্ধি হইল। লর্ড লিটনও কাবুলে বৃটিশ দূত প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু বৃটিশ দূত কাবুলে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল না। রাশিয়ার সহিত শের আলীর এই প্রকাশ্য মিত্রতার পরিচয় পাইয়া লর্ড লিটন শের আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শের আলী রাশিয়ার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া নিস্ফল হইলেন। বার্লিনের সন্ধিতে রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হওয়ায় রাশিয়া পুনরায় ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হইল না। সুতরাং শের আলীকে একাকীই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল (১৮৭৮ খৃঃ)।

অল্প দিনের মধ্যেই তিনটি পৃথক পথে তিন দল ইংরাজ সৈন্য আফগানিস্থানে প্রবেশ করিল। শের আলী রাজ্য রক্ষায় অসমর্থ হইয়া তুর্কীস্থানে পলায়ন করিলেন ; তথায় তাহার মৃত্যু হইল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাহার পুত্র ইয়াকুব খাঁ গণ্ডামকের সন্ধি দ্বারা ইংরেজদের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাহাদের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে অঙ্গীকার করিলেন। ইংরেজরা তাঁহাকে কাবুলের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিল এবং কাবুলে একজন ইংরেজ দূত রাখিবার ব্যবস্থা হইল। স্বাধীনতাপ্রিয় আফগান জাতি এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইল না। প্রথম আফগান যুদ্ধে ইংরেজদের আশ্রিত শাহ সুজার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে ইয়াকুব খাঁর প্রায় সেই অবস্থা ঘটিল। কাবুলে ইংরেজ দূত স্যার লুই কাভানরী (Cavagnari) নিহত হইলেন। ফলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেনাপতি রবার্টস্ চরসিয়াতে আফগানদিগকে পরাভূত করিয়া ইয়াকুবকে নির্ব্বাসিত করিলেন এবং লর্ড লিটন আফগানিস্থানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কাবুলে একটি এবং কান্দাহারে একটি রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করিলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে রক্ষণশীল দলের পরাজয় হওয়াতে ডিস্‌রেলী পদত্যাগ করিলেন এবং উদারনৈতিক দলের গ্লাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রী হইলেন। গ্লাডষ্টোন আফগান যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। তিনি রক্ষণশীল দলের আফগান নীতি পরিহার করাতে লর্ড লিটন পদত্যাগ করিলেন (১৮৮০) এবং লর্ড রিপণ বড়লাট হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। শান্তিপ্রিয় লর্ড রিপণ আফগান যুদ্ধের অবসান করিয়া এবং আফগান জাতির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন।

লর্ড রিপণের কার্য্যভারের প্রারম্ভেই আফগানিস্থান সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইল। ইয়াকুব খাঁ নির্ব্বাসিত হইলে শের আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমান ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। লর্ড রিপণ এই নূতন আমীরের সহিত সন্ধি করিলেন। আবদুর রহমান ইংলণ্ড

ব্যতীত অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবেন না এবং পিষিণ জেলা ইংরেজদিগকে সমর্পণ করিবেন এই দুই সর্ত্তে বৃটিশের সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ হইলেন। এই সময়ে শের আলীর পুত্র আয়ুব খাঁ পৈত্রিক সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে আবদুর রহমানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন এবং মাইওয়াণ্ড নামক স্থানে একদল বৃটিশ সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। কিছুদিন পরে সেনাপতি রবার্টস কাবুল হইতে কান্দাহারে গমনপূর্ব্বক আয়ুবের সৈন্যদিগকে নগরের বাহিরে পরাজিত করিয়া পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর আবদুর রহমান আয়ুবকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিয়া আফগানিস্থানের অবিসংবাদিত অধিপতি হইয়া বসিলেন। লর্ড রিপণ এই সময়ে ঐ দেশ হইতে বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া আনিবার নির্দ্দেশ দিলেন।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে অত্যন্ত লোকক্ষয় ও অর্থনাশ হইলেও ইহা একেবারে নিস্ফল হয় নাই। কালাতের খাঁ বৃটিশের অধীনে আসিল বৃটিশ বেলুচিস্থান নামে একটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি হইল, কোয়েটাতে সৈন্য রাখিবার স্থায়ী ব্যবস্থা হইল, বোলান গিরিপথ ইংরেজের দখলে আসিল এবং সর্ব্বোপরি আফগানিস্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার চক্রান্ত নিস্ফল হইল।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের পর ঃ—রাশিয়া এবং ইংলণ্ডের আফগান নীতি সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই অনুসৃত হইয়াছে—আফগানিস্থানের স্বার্থের প্রতি কাহারও লক্ষ্য ছিল না। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের পর কিছুকালের জন্য আফগানিস্থানে বৃটিশ প্রভাব প্রবল থাকায় রাশিয়া নিরুৎসাহিত হইয়া পড়ে। কিন্তু আফগানিস্থানে কোন সুবিধা স্থাপন করিতে না পারিয়া রাশিয়া আফগানিস্থানের সন্নিহিত অঞ্চলে ক্রমশঃ তাহার রাজ্যসীমা প্রসারিত করিতে আরম্ভ করে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া মার্ভ অধিকার করিলে ইংলণ্ড প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং ইংলণ্ড, রুশ-আফগান সীমা নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করিলে রাশিয়া তাহাতে অসম্মত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া আফগানিস্থানকে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জদে (Panjdeh)

অধিকার করিলে ইংলণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ধীর মস্তিষ্ক গ্লাডষ্টোন পর্য্যন্ত রাশিয়ার এই আচরণে উত্তেজিত হইয়া সৈন্য সমাবেশের আদেশ দেন। পার্লামেণ্ট যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ব্যয় মঞ্জুর করিতে বিলম্ব করিল না।

পাঞ্জদে ঘটনা ১৮৮৫

যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত নিবারিত হইল—উভয় দেশের মধ্যে আপোষ মীমাংসা হইয়া গেল। রাশিয়া পাঞ্জদের অধিকার প্রাপ্ত হইল—জুলফিকার পাস আমীরকে অর্পিত হইল। অতঃপর রুশ আফগান সীমানা নির্দ্ধারক কমিটি গঠিত হইয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উভয় রাষ্ট্রের রাজ্যসীমা স্থায়ীরূপে নির্দ্ধারিত হইলে রুশ-ভীতি নিবারিত হইল। আফগানিস্থানে ইংলণ্ডের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে রাশিয়া অন্যত্র তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইল।

ইংরেজের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

দীর্ঘকাল যাবৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা ইংরেজকে চিন্তাকুল করিয়া রাখিয়াছিল। আফগানিস্থান ও বৃটিশ ভারতের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে আফ্রিদী, বারকজাই, গিরঘিজ, মোমন্দ প্রভৃতি বহু উপজাতি অবস্থান করে; ইহারা ইংরেজ বা আফগানিস্থান কাহারও বশ্যতা স্বীকার করে না এবং কার্য্যতঃ ইহারা স্বাধীন। সুযোগ পাইলেই ইহারা সন্নিকটবর্ত্তী ভারতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ বা নরহত্যা করিয়া পলায়ন করে। স্বাধীনতাপ্রিয় এবং দুর্দ্ধর্ষ জাতি বলিয়া সহজে ইহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করানো অসম্ভব। অথচ এই উপজাতি অঞ্চলের উপর বৃটিশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের সীমান্ত-রেখা সিন্ধুনদ অপেক্ষা সামরিক দিক দিয়া দৃঢ়তর হইতে পারে এবং পশ্চিম হইতে সম্ভাব্য শত্রু আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক রক্ষা-প্রাকারের কাজ করিতে পারে। উপজাতি অঞ্চলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নীতি—যাহা Forward policy বলিয়া খ্যাত, গ্রহণ করার বিপদও যথেষ্ট ছিল। প্রথমতঃ, এই সকল অপরাধপ্রবণ পার্ব্বত্য জাতিকে

স্থায়ীভাবে বশে রাখা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। ইহাদের অশান্তি নিবারণের জন্য শান্তিমূলক অভিযান মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, কোন সময়ে ভারতবর্ষ বিদেশী দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদেশীকে সাহায্য করিতে পারে।

এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট 'অগ্রসর নীতি' অনুমোদন করিয়া সীমান্ত ব্যাপারের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে উদ্যোগী হইলেন। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সীমা রেখা স্পষ্টভাবে নির্দ্ধারণের প্রয়োজন হইল। স্যার মার্টিমার ডুরাণ্ডের নেতৃত্বে আফগান-সীমা-কমিশন উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে দুই রাষ্ট্রের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আমীরকে প্রদত্ত বাৎসরিক বৃত্তির টাকা বারো লক্ষ হইতে আঠারো লক্ষ করা হইল। আমীর ডুরাণ্ড লাইনের ভারতবর্ষের দিকে অবস্থিত উপজাতিদের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ না করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ডুরাণ্ড লাইন

দ্বিতীয়তঃ, উপজাতিদের আক্রমণ নিবারণ করার জন্য উপজাতি অঞ্চলে বহু রাস্তা নিম্মিত হইল এবং গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ প্রস্তুত হইল। স্থানে স্থানে সেনাসমাবেশ করিয়া সামরিক ঘাঁটির বন্দোবস্ত হইল। সীমান্ত অঞ্চলের জেলাগুলিকে পাঞ্জাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একজন চীফ কমিশনারের দায়িত্বে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সৃষ্টি করা হইল। এই নূতন প্রদেশ প্রথম দিকে বড়লাটের অধীনে রাখা হইয়াছিল, পরে একজন গভর্ণরের শাসনাধীনে আনয়ন করা হয়।

উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত সম্বন্ধে এত সতর্কতা ও অর্থব্যয় করা সত্ত্বেও উপ-জাতিদের অশান্তি হইতে ভারতবর্ষ নিষ্কৃতি পায় নাই। পরবর্ত্তী যুগে উৎ-কোচের দ্বারা ইহাদিগকে শান্ত রাখার চেষ্টা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্য হইতে বেতনভোগী 'লম্বরদার' বা শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করা হইত এবং মধ্যে মধ্যে অর্থপ্রদানের দ্বারা বিভিন্ন উপজাতিকে হস্তগত করার প্রয়াস করা হইত।

কোন ভারতবাসী বা ইংরেজ ইহাদের হস্তে আটক হইলে উপরোক্ত লম্বরদারের মারফৎ উপযুক্ত মুক্তি-পণ প্রদানের বিনিময়ে আটক ব্যক্তিরা মুক্তি পাইত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়া ইহাদিগকে স্থির ও সুবোধ নাগরিকে পরিণত করার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু কিছুতেই ইহারা ইহাদের সনাতন জীবনযাত্রা ও রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইহাদের অবিরত আক্রমণ বন্ধ করার জন্য ইংরেজকে বিমানপোতের সাহায্যে ইহাদের উপর বোমাবর্ষণ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। তথাপি ইহারা লুণ্ঠনাদি কার্য্যে নিরস্ত হয় নাই। মোট কথা, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ব্যাপারে 'অগ্রসর নীতি' অনুসরণ করিয়া লাভবান হন নাই। সম্ভাবিত শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য এই নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ উক্ত অঞ্চল দিয়া কোন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত তো হইল না, কেবল উপজাতিদের আক্রোশ ও বিরুদ্ধতা অর্জ্জন করিল মাত্র।

(২) তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ ও উত্তর ব্রহ্ম অধিকার, ১৮৮৫

প্রথম ও দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে দক্ষিণ ব্রহ্ম ইংরেজের হস্তগত হইলেও উত্তর ব্রহ্ম স্বাধীন ছিল এবং পুরাতন রাজবংশের দ্বারা শাসিত হইতেছিল। উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী মান্দালয়ে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে স্বাধীন ব্রহ্মরাজের মনোমালিন্য নানা কারণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মরাজ মিণ্ডনের সময়ে বৃটিশ রেসিডেণ্ট ব্রহ্মরাজের সম্মুখে নগ্নপদ ও নতজানু হওয়ার রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ব্রহ্মের রাজদরবারে উপস্থিত হওয়াই বন্ধ করিলেন। মিণ্ডনের পরবর্ত্তী রাজা থিবো-র সময়েও বৃটিশের সঙ্গে ব্রহ্মরাজের মনান্তর দূরীভূত না হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। থিবো সিংহাসনে আরোহণের প্রাক্কালে নিষ্কণ্টক হইবার জন্য রাজবংশীয় আশি জন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই

নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে ইংরেজ প্রতিবাদ জানাইলে থিবো ইংরেজকে জানাইয়া দিল যে স্বাধীন রাষ্ট্রের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ইংরেজের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। ইংরেজরা প্রথমতঃ রেসিডেণ্ট প্রত্যাহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে ; পরে এই সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়।

ইতিমধ্যে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের মত পূর্ব্ব-সীমান্তেও বিদেশী রাষ্ট্রের প্রভাবাধীন হওয়ার সম্ভাবনা হইল। ফ্রান্স এই সময়ে কোচিন-চীন ও টঙ্কিন অধিকার করিয়া উত্তর ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ব্রহ্মরাজও ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের জন্য উদগ্রীব হইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে টঙ্কিনের মধ্য দিয়া অস্ত্র শস্ত্র আমদানীর বিনিময়ে ফ্রান্সের সঙ্গে এক বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। মান্দালয়ে একজন ফরাসী কন্সাল নিযুক্ত হইল। অধিকন্তু ফরাসীদের উপর রেলপথ নির্ম্মাণ ও ব্রহ্মরাজের একচেটিয়া ব্যবসাদির তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। ইংরেজরা ব্রহ্মদেশে ফরাসী প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইলেও প্রত্যক্ষ কোন কারণের অভাবে আপাততঃ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু অচিরেই ব্রহ্মরাজের এক নির্ব্বোধ আচরণে ইংরেজের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন উপস্থিত হইল। ব্রহ্মরাজ কাষ্ঠ ব্যবসায়ী এক বৃটিশ বণিক-কোম্পানীকে এক সামান্য ত্রুটির জন্য দুইলক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড জরিমানা করিলেন। অবশ্য ব্রহ্মরাজের উদ্দেশ্য ছিল উক্ত বণিক কোম্পানীর হস্ত হইতে কাষ্ঠব্যবসা একটি ফরাসী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হস্তে অর্পণ করা। ভারত গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মরাজের উক্ত আচরণে প্রতিবাদ জানাইলেন এবং বিবাদের মধ্যস্থতার ভার বড়লাটের উপর অর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মরাজ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইতিমধ্যে ফরাসীরা টঙ্কিনে পরাজিত হইয়া উত্তর ব্রহ্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। ফরাসী গভর্ণমেণ্টও ব্রহ্মদেশের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করিল না। ইংরেজরা ইহাতে সুবিধা পাইয়া থিবো-র নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করিল। এই চরমপত্রে যে সকল সর্ত্ত ছিল—যেমন, মান্দালয়ে

একজন স্থায়ী রেসিডেণ্ট রাখার অনুমতি প্রদান করিতে হইবে এবং ব্রহ্মের পররাষ্ট্রনীতি বৃটিশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে—সেই সকল মানিয়া লইলে ব্রহ্মের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া যাইবে বলিয়া ব্রহ্মরাজ চরমপত্রানুযায়ী কাজ করিতে সম্মত হইলেন না। ইংরেজগণ থিবো-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং কুড়িদিনের মধ্যে মান্দালয় ইংরেজের হস্তে পতিত হইল ও ব্রহ্মরাজ বন্দী হইলেন। উত্তর ব্রহ্ম বৃটিশের অধিকারভুক্ত হইল এবং উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্ম যুক্তভাবে ব্রহ্মদেশ নামে এক নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিল।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব্ব সীমান্তে একই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। উভয় সীমান্তেই রাশিয়া বা ফ্রান্সের মত প্রথম শ্রেণীর কোন ইউরোপীয় শক্তির প্রভাব বৃদ্ধির আশঙ্কাকে ভিত্তি করিয়া বৃটিশের সীমান্ত নীতি পরিচালিত হইয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রেই সীমান্ত-পারের রাষ্ট্র বিদেশী শক্তির সাহায্য ভরসা করিয়া বৃটিশকে অগ্রাহ্য করিল, কিন্তু কার্য্যকালে বিদেশী রাষ্ট্রের প্রত্যাশিত সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ফল ভিন্নরূপ হইল। ব্রহ্মদেশ বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইল, কিন্তু পর্ব্বত-সঙ্কুল আফগানিস্থান ও সমরপ্রিয় পাঠানজাতিকে বৃটিশের আয়ত্তাধীন করা অযৌক্তিক মনে হওয়ায় আফগানিস্থানের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রহিল।

(৩) দেশীয়-রাজ্যনীতি

কোম্পানীর অধিকারের সময়ে বৃটিশের দেশীয় রাজ্যনীতি মোটেই সুনির্দ্দিষ্ট এবং সন্তোষজনক ছিল না। ইহার অবশ্য কারণও ছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য, বিভিন্ন রকম সন্ধি সর্ত্তের দ্বারা বৃটিশের সঙ্গে মৈত্রীযুক্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনানুরোধে বা গভর্ণর জেনারেলদের ব্যক্তিগত রুচির জন্যও সময়ে সময়ে দেশীয় রাজ্যনীতি কোন সুনির্দ্দিষ্ট পন্থার বদলে ভিন্ন জাতীয় হইয়া পড়িতে বাধ্য হইত। গভর্ণর জেনারেলদের মধ্যে ওয়েলেসলী, লর্ড হেষ্টিংস ও ডালহৌসী যেমন আগ্রাসী মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন, অপর গভর্ণর জেনারেলগণ অতটা ছিলেন না। সুতরাং কোম্পানীর যুগে দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ইংরেজের আচরণ স্পষ্ট ও একপন্থী হইয়া উঠিতে পারে নাই।

চক্ষ দেশীয় রাজ্যনীতি অস্পষ্ট হওয়ার জন্য দেশীয় রাজ্যের পক্ষে উদ্বেগের ও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা ঠিক কোথায় দাঁড়াইয়া আছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। বাহ্যতঃ ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি অনুযায়ী তাঁহাদের স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হইয়াছিল—সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতীত সর্ব্বকার্য্যে তাহারা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদের প্রতি ইংরেজের আচরণ ভিন্নরূপ ছিল। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল ইংরেজরা যেমন অকুণ্ঠিত-ভাবে অযোধ্যা, সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য বৃটিশের অন্তর্ভুক্ত করিল তেমনি ভরতপুর, মহীশূর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে নিম্ন মর্য্যাদায় অবনত করিতে দ্বিধা করিল না। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারস্‌গণের নির্দ্দেশ ছিল যে কোন রাজ্য অন্তর্ভুক্তির যথেষ্ট কারণ পাওয়া গেলে তাহার সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। ডালহৌসী বিশ্বস্তভাবে এই নির্দ্দেশানু-যায়ী কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই রাজ্য-অন্তর্ভুক্তির নীতির ফল যে ভাল হয় নাই তাহা সিপাহী বিদ্রোহের সময়েই প্রমাণিত হইয়াছে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পর নূতন নীতি

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী যখন স্বয়ং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখন হইতে দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে নূতন নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। এই নূতন নীতি পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্টভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। মহা-রাণীর ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হইল যে ইংরেজের অতঃপর ভারতের রাজ্য বৃদ্ধির কোন অভিপ্রায় নাই—দেশীয় রাজগণ নিরাপদে স্ব-স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। শুদ্ধ এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা দেশীয় রাজগণকে আশ্বাস দেওয়া যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে যে দুইটি কারণে অর্থাৎ অপুত্রক রাজাদের উত্তরাধিকারের বিলুপ্তিতে ও কুশাসনের অজুহাতে দেশীয় রাজ্যসমূহ বৃটিশের কবলিত হইত সেই দুইটি কারণ যাহাতে উপস্থিত না হইতে পারে তজ্জন্যও ইংরেজরা যত্নবান

হইল। উত্তরাধিকার বিলুপ্তি সম্বন্ধে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দেশীয় রাজগণকে প্রদত্ত এক সনদে জানাইয়া দেওয়া হইল যে অপুত্রক হিন্দু রাজগণ দত্তক গ্রহণের দ্বারা সিংহাসনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন—মুসলমান নরপতিগণ মুসলিম দায়াধিকার বিধি অনুযায়ী উত্তরাধিকার স্থির করিবেন। কিন্তু কোন রাজ্যে কুশাসন উপস্থিত হইলে সেই রাজ্য সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহার সম্বন্ধে কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি স্থির করা গেল না। তবে এ সম্বন্ধে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী বৃটিশের কার্য্য কলাপ হইতে বোঝা গেল যে কুশাসনের জন্য দেশীয় রাজগণ পদচ্যুত হইবেন, কিন্তু তাহাদের রাজ্য বৃটিশের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। এই রূপান্তরিত দেশীয় রাজ্যনীতির ফলে দেশীয় রাজ্যসমূহ আশ্বস্ত ও নিরাপদ বোধ করিল। তাহারা তাহাদের রাষ্ট্রীয় সত্তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি ও নিরাপত্তার স্থায়ী অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইল।

কুশাসক দেশীয় নরপতি সিংহাসনচ্যুত হইতে পারিবেন এই নীতি কার্য্যক্ষেত্রে অনুসৃত হওয়ার ফলে অবশ্য দেশীয় নরপতিদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল না। কেননা কোন রাজ্যের শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলেই যাহাতে শৃঙ্খলাবিধান হয় তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী হইল। শাসনের ত্রুটি সংশোধনের জন্য সিংহাসনচ্যুতির পূর্ব্বে বারংবার সতর্ক না করিয়া প্রথমেই পদচ্যুত করা অবশ্যই অন্যায়। সেই ক্ষেত্রে পুরাতন যুগের ন্যায় দেশীয় রাজাদের আন্তঃ-স্বাধীনতা অটুট রহিল না। বরোদা ও মণিপুরের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

বরোদার গাইকোয়াড়ের সিংহাসন চ্যুতি

লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে (১৮৭২-'৭৬) বরোদার গাইকোয়াড় মলহার রাও গাইকোয়াড়-এর বিরুদ্ধে বরোদার রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফিয়ারী কর্ত্তৃক কুশাসনের অভিযোগ আনয়ন করা হয়। গাইকোয়াড় নাকি রেসিডেণ্টকে খাদ্যের সঙ্গে হীরক চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া হত্যা করার চেষ্টা করেন। লর্ড নর্থব্রুকের আদেশে গাইকোয়াড় বন্দী হইলেন (১৮৭৫) এবং তাহার বিরুদ্ধে

অভিযোগের বিচার করিবার জন্য সমসংখ্যক ভারতবাসী ও ইংরেজ লইয়া এক কমিশন নিযুক্ত হয়। বিচারের ফল সম্বন্ধে কমিশনের সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ হয়—কমিশনের তিনজন ভারতীয় সভ্য গোয়ালিয়র ও জয়পুরের রাজা এবং দিনকর রাও গাইকোয়াড়কে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু তিনজন ইংরেজ সভ্য গাইকোয়াড়কে দোষী সাব্যস্ত করিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট অতঃপর গাইকোয়াড়কে প্রমাণাভাবে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই দুশ্চরিত্রতা, কুশাসন ও সংস্কারাদি প্রবর্ত্তনে অক্ষমতার অজুহাতে গাইকোয়াড়কে পদচ্যুত করিয়া রাজবংশের এক নিকট আত্মীয় বালক সয়াজী রাওকে গাইকোয়াড় মনোনীত করা হইল।

মণিপুর

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের তদানীন্তন রাজা সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের চক্রান্তে সিংহাসনচ্যুত হন এবং একজন নূতন রাজা তৎস্থলে উপবিষ্ট হন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই নূতন রাজাকে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু সেনাপতিকে নির্ব্বাসিত করা প্রয়োজন মনে করিলেন। তদনুসারে আসামের চীফ কমিশনার মিঃ কুইণ্টন এক ক্ষুদ্র সৈন্যদল সহ মণিপুরে প্রেরিত হইলেন। সেনাপতিকে বন্দী করার চেষ্টা করাতে মণিপুরীরা উত্তেজিত হয় ও ইংরেজ সৈন্যদলকে আক্রমণ করে। পরিশেষে সেনাপতি ও মিঃ কুইণ্টনের মধ্যে এক আলাপ আলোচনার বন্দোবস্ত হয়; এই আলোচনায় যোগদানেব পথে মিঃ কুইণ্টন ও তাহার চারিজন সহকারী মণিপুরীদের হস্তে ধৃত হন। ইহাদের মধ্য হইতে একজন ব্যতীত অন্য সকলকেই হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভারত হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল। এই সৈন্যদল যাইয়া মণিপুর অধিকার করিল, সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ এবং নূতন রাজা ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। একজন বালককে সিংহাসনে উপবিষ্ট করান হইল নূতন রাজার সাবালকত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মণিপুরের শাসনভার পলিটিকেল এজেণ্টের হস্তে অর্পিত হইল।

কিন্তু বৃটিশের যে কোন দেশীয় রাজ্য গ্রাস করার উদ্দেশ্য নাই তাহা মহীশূরের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মহীশূর রাজ্য বৃটিশ শাসনের অধীনে আনীত হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর বৃটিশ শাসনের পর পুনরায় মহীশূর রাজ্য ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার পূর্ব্বতন রাজবংশের হস্তে প্রত্যর্পিত হইল। এই নব-নীতি সর্ব্বত্র দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে অতঃপর অনুসৃত হইতে লাগিল। কুশাসন বা উত্তরাধিকার বিলোপ হইলে পূর্ব্ববৎ দেশীয় রাজাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তা বিলুপ্ত হইবার কোন আশঙ্কা রহিল না। বরঞ্চ কোম্পানীর আমল অপেক্ষা ইংলণ্ডেশ্বরের আধিপত্যের যুগে ইহারা অধিক নিরাপত্তা ও আশ্বাস প্রাপ্ত হইল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে মর্য্যাদার ব্যবধান ছিল তাহা বিলুপ্ত হইল

পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের বিনিময়ে দেশীয় রাজগণের স্বাধীনতার অপহ্নব ঘটিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রায় ছয়শত দেশীয় রাজ্য ছিল; ইহাদের মধ্যে প্রায় পাঁচ শতাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃটিশের সম্পর্ক কোন সময়েই স্পষ্টীকৃত হয় নাই। অবশিষ্ট রাজ্যের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যে সন্ধি সর্ত্ত সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাও এক ধরণের ছিল না। রাষ্ট্রের গুরুত্ব অনুসারে স্থানকাল অনুযায়ী চুক্তি-নামা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হায়দ্রাবাদের মত বিশাল রাষ্ট্র কোম্পানীর সঙ্গে সমাধিকারের সর্ত্তে সন্ধিবদ্ধ হইয়াছিল; অবশ্য কালক্রমে তাহাকে তাহার পররাষ্ট্র নীতির অধিকার বৃটিশের হস্তে অর্পণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য সকল ব্যাপারে নিজাম সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। রাজপুত রাজ্য সমূহও বৈদেশিক-নীতির অধিকার ব্যতীত সর্ব্ব-ব্যাপারে স্বাধীন থাকিবে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। অবশ্য যুদ্ধাদি কার্য্যে তাহাদিগকে সৈন্য প্রেরণ করিয়া বৃটিশের সাহায্য করিতে হইত। সদ্যোক্ত রাজ্য সমূহের সঙ্গে মহীশূর, বরোদা ও অযোধ্যার পার্থক্য ছিল। ইহাদের সঙ্গে সন্ধি-সর্ত্তের বলে ইহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বৃটিশের হস্তক্ষেপ স্বীকৃত হইয়াছিল। তথাপি সম-অধিকারের

ভিত্তিতেই ইহাদের সঙ্গে বৃটিশের চুক্তি-পত্র সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পর বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে মর্য্যাদার ব্যবধানটুকু ছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং বৃটিশ সার্ব্বভৌম-শক্তি হিসাবে সমস্ত রাজ্যকে সামন্ত রাজ্যের মত দেখিতে আরম্ভ করিল।

বৃটিশের নিকট দেশীয় রাজ্যের পৃথক মর্য্যাদার বিলুপ্তি ও অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য রূপে রূপান্তর-নীতি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়ার 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণে আরও স্পষ্টীকৃত হইল। ইহার ফলে দেশীয় রাজ্যগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইল এবং ইংলণ্ডের অধিপতি অতঃপর দেশীয় রাজাদের উচ্চতম প্রভু বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাপত্রে দেশীয় প্রজাদের যে স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণে তাহা প্রকারান্তরে বিলুপ্ত হইয়া গেল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মহীশূর রাজ্য পূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশের হস্তে অর্পণের সময় হস্তান্তর কার্য্যের ঘোষণা পত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ঘোষণা পত্র ওয়েলেসলীর সময়ের শ্রীরঙ্গপত্তমের ঘোষণা পত্রের সঙ্গে তুলনীয়। হিন্দু রাজবংশের হস্তে মহীশূর অর্পণের প্রাক্কালে মহীশূরের মর্য্যাদা সম-শক্তি হিসাবে ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ঘোষণায় মহীশূরকে সর্ব্ব প্রকারে বৃটিশের অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকার কথা উল্লেখ করা হইল। কোম্পানীর আমলে যাহা সহযোগিতা ছিল ইংলণ্ডেশ্বরের অধীনে তাহা আনুগত্য বলিয়া রূপান্তরিত হইল। এতদ্ব্যতীত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারেও বৃটিশের প্রাধান্য সর্ব্বময় হইল। কোম্পানীর যুগে ইংরেজ কেবল মাত্র অপুত্রক উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিত; বর্ত্তমানে ১৮৮৪ ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ঘোষণার দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত দেশীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। অধস্তন সামন্ত রাজ্যের উপযুক্ত আচরণ দেশীয় রাজ্যের প্রতি ক্রমশঃ প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

অধিকন্তু, বৃটিশের সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব ঘোষিত হওয়ার পরে স্বতঃসিদ্ধভাবে দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপের অধিকার বৃটিশের আয়ত্তাধীন হইল। পূর্ব্বে দেশীয় রাজগণ বৃটিশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিলেই যথেষ্ট হইত কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদিগকে বিশ্বস্ত ব্যতীত সুশাসক হইতে হইল। সার্ব্বভৌম শক্তি হিসাবে ভারতের সর্ব্বত্র সুশাসনের ব্যবস্থা করা বৃটিশের দায়িত্ব ; সেই দায়িত্ব দেশীয় রাজ্য অবহেলিত হইলে ন্যায়তঃ বৃটিশ দেশীয় রাজাকে সেই দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য চাপ দিতে পারে, বা যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। এই মূলসূত্র অনুসরণ করিয়া বৃটিশ পরবর্ত্তী সময়ে বরোদা বা মণিপুর ব্যতীত হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর ও আলোয়ারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্র দায়িত্বহীন কুশাসক নরপতিগণ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। 'কোম্পানীর যুগে দেশীয় রাজ্যের যে সামান্য স্বাধীনতার অভিনয়টুকুও ছিল তাহাও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পর ক্রম-পরিবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একেবারে বিলুপ্ত হইল। দেশীয় রাজ্যে নিযুক্ত বৃটিশ রেসিডেণ্ট বৃটিশের ইচ্ছানুযায়ী দেশীয় নরপতিবর্গকে বৃটিশের সম্পূর্ণ বশংবদ করিয়া রাখিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আভ্যন্তরীণ শাসন, ১৮৫৮—১৯০৫

(ক) সরকারী কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন।

(খ) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন।

(গ) আর্থিক বন্দোবস্ত।

(ঘ) রাষ্ট্র শাসনের উন্নতি।

(ঙ) সামরিক শাসন-বিন্যাস।

(ক) সরকারী কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন

সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীরাই সাধারণতঃ ভারত সরকারের সাধারণ দৈনন্দিন শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ভারতের এই সিভিল সার্ভিসের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রথম যুগে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এই সিভিল সার্ভিস প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদ-ঘোষণা অনুযায়ী ভারতবাসীকে উচ্চপদে নিয়োগ করার নীতি গৃহীত হইলেও কার্য্যতঃ নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য সিভিল সার্ভিসে ভারতবাসীকে গ্রহণ করা বিলম্বিত হইতে লাগিল। কোম্পানীর অধিকার স্খলিত হইলে কোম্পানীর মনোয়ন প্রথার পরিবর্ত্তে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ইংলণ্ডের অধীন যে কোন নাগরিক এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকারী ছিল। এই পরীক্ষায় প্রবেশের উপযুক্ত বয়স প্রথমে অনধিক তেইশ, পরে ক্রমশঃ বাইশ এবং একুশে পরিণত হয় (১৮৬৬)। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য প্রার্থীদিগকে বিলাতের অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর শিক্ষাধীন থাকিয়া পরে চাকুরী গ্রহণ করিতে হইত। এই সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়গণের প্রবেশ করা অত্যন্ত দুরূহ ছিল।

প্রথমতঃ প্রার্থিগণকে স্বদেশ ও স্ব-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া এত অল্প বয়সে (প্রবেশাধার বয়স পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নামাইয়া উনিশ করা হয়—যাহাতে অধিক ভারতীয় এই চাকুরীতে প্রবেশ না করিতে পারে) সুদূর ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল থাকিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজী ভাষায় গৃহীত পরীক্ষায় ইংরেজ প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইত। এই পরীক্ষা যাহাতে ভারতবর্ষেও গৃহীত হয় তজ্জন্য আন্দোলন চলিতে লাগিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাফরিণ সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য এক পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সিভিল সার্ভিসের নূতন বন্দোবস্ত হয়। পূর্ব্বে :কেবলমাত্র ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (Covenanted Civil Service) ছিল এবং ইহার কর্ম্মচারিগণকে ষ্টাটুটরি সিভিল সার্ভেণ্ট বলা হইত। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের নির্দ্দেশ মত সমস্ত চাকুরী নিখিল ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস ও অধস্তন সিভিল সার্ভিসে বিভক্ত হয়। ইহার মধ্যে প্রাদেশিক ও অধস্তন সিভিল সার্ভিস প্রাদেশিক সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত হয়। নিখিল ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ভারত সরকারের অধীনে রক্ষিত হইল এবং ইহারা চাকুরীর জন্য ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার এক সচিবের নিকট দায়ী রহিলেন। ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসের মত ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষা, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ও বন ইত্যাদি বিভাগেও নিখিল ভারতীয়, প্রাদেশিক ও অধস্তন বিভাগে বিভক্ত করা হইল। নিখিল ভারতীয় সার্ভিস প্রধানতঃ ইংরেজদের জন্য সংরক্ষিত ছিল—অবশিষ্ট দুইটী বিভাগের দ্বার ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইল।

ভারতবর্ষেও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা গৃহীত হউক এই দাবী ভারতবাসীরা সুদীর্ঘকাল করিয়া আসিতে লাগিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কমন্‌স সভা একই সঙ্গে ইংলণ্ডে ও ভারতে উক্ত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন এবং মতামতের জন্য এই সুপারিশ ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন প্রাদেশিক সরকার সমূহের

সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উক্ত সুপারিশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ল্যান্স-ডাউন এই জন্য বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন যে ভারতে পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতীয় অধিক সংখ্যক চাকুরীতে নিযুক্ত হইবে এবং ইংরেজ কর্ম্মচারীরা সংখ্যালঘু হইয়া পড়িলে শাসন কার্য্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু অবাধ পরীক্ষা-নীতির ফলে শিক্ষায় অনগ্রসর অথচ শাসন-দক্ষ মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায় চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইবে। ল্যান্সডাউনের প্রতিবাদের ফলে ভারতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল বিলম্বিত হইল।

কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনে মনোনয়ন প্রথা যাহা কোম্পানী আমলে ছিল তাহার পরিবর্ত্তে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে উপযুক্ত এবং সুকর্ম্মঠ কর্ম্মচারী শাসনের জন্য নিযুক্ত হইতে লাগিল এবং শাসন কার্য্যও পূর্ব্বাপেক্ষা সক্রিয় ও সুদৃঢ় হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার সঙ্গে একটি অবশ্যম্ভাবী ত্রুটী আসিয়া পড়িল। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীরা, যাহাকে সংক্ষেপতঃ আই, সি, এস, বলা হইয়া থাকে, ভারত শাসনের সর্ব্বেসর্ব্বা হইল। তাহাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব ভারতীয় কোন শক্তির উপর নির্ভরশীল না হইয়া একমাত্র সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের উপর হওয়াতে তাহারা নিজেদিগকে সর্ব্ব শক্তিমান মনে করিতে লাগিল এবং সুদূরস্থিত নিয়োগকর্ত্তাও শাসন কার্য্যে তাহাদের শক্তিমত্তার উপর আস্থাশীল না হইয়া পারিল না। সুতরাং কালপরম্পরায় এই সিভিল সার্ভিসের বুরোক্রেশী বা আমলা-তান্ত্রিক শাসনই ভারতের অদৃষ্টে জুটিল। উচ্চমন্যতা ও উন্নাসিকতাই এই শাসনব্যবস্থার অন্যতম গুণ হইল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা জনসংযোগ হইতে ব্যবধানে রহিল। সিভিল সার্ভিসের প্রথম দিকে তবু এই কর্ম্মচারীবৃন্দ ভারতবাসীর সঙ্গে মেলামেশা করিত, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর উভয় পক্ষের মধ্যে একটুখানি গ্লানিকর ব্যবধানের সৃষ্টি হওয়ায় ইহারা সাধারণ হইতে দূরে সরিয়া রহিল। উপরন্তু বাষ্পীয় পোত, বা টেলিগ্রাফ, বা সুয়েজখাল কাটা হওয়াতে

স্বদেশের সঙ্গে সংযোগ পূর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকট হইল ; সুতরাং দেশীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কোন প্রয়োজন রহিল না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে পারস্পারিক শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি সৃষ্টি ক্রমেই দূরে অপসৃত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয়তঃ, উচ্চতর সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় সংখ্যাল্প থাকার ফলে ভারতবাসীর মনে যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ সৃষ্টি হইল। কেবল বিদেশীর দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্য পরাধীনতার মানসিক গ্লানি দেশের মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। এই অসন্তোষ হইতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এর উদ্ভব হইয়াছিল।

(খ) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন চলিয়া আসিতেছিল। গ্রাম নগর সমূহ ক্ষুদ্রাকৃতি রাষ্ট্রের মতনই ছিল এবং নিজেরাই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের দ্বারা স্ব-শাসন সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিত। এই সকল সঙ্ঘ বা শাসন প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থা, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি স্থানীয় সকল কার্য্য নিজেরাই নির্ব্বাহ করিত। মোগল রাজত্বের অবসানের বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল। ইংরেজের আমলে নূতন করিয়া স্থানীয় স্ব-শাসন গড়িয়া তোলার প্রয়োজন হইল।

প্রথমতঃ, ইংরেজগণ যথাসম্ভব প্রাচীন প্রতিষ্ঠান সমূহকে সংশোধন করিয়া স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিল। ১৮১৬ ও ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি নির্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আদায়ের দায়িত্ব গভর্ণমেন্টের উপর ন্যস্ত হইল। উক্ত প্রয়োজনে আদায়ীকৃত অর্থ ব্যয়ের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বত্র স্থানীয় কমিটি নিযুক্ত হইল। এই কমিটি গভর্ণমেণ্টের পরামর্শদাতা মাত্র হইলেন। ১৮৬৯ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় স্ব-শাসনের একট উন্নততর ব্যবস্থা হইল। বিভিন্ন প্রদেশে আইনের সাহায্যে ভূমি-রাজস্বের উপর অতিরিক্ত সেস্ বা কর

আদায়ের ব্যবস্থা হইল এবং এই অতিরিক্ত কর সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় পূর্ত্তকার্য্যে ব্যয়িত হওয়ার বন্দোবস্ত হইল। এই অর্থ যথোপযুক্ত ব্যয়ের জন্য প্রত্যেক জেলায় সরকার নির্ব্বাচিত কমিটি সৃষ্ট হইল। এই কমিটিতে সরকারী ও বে-সরকারী সভ্য রহিল এবং ইহার চেয়ারম্যান একজন সরকারী কর্ম্মচারী হইলেন। এই সকল জেলা কমিটি স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইলেন এবং স্থানীয় ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতিও হইল। কিন্তু এই সকল কমিটিতে সরকারী কর্ম্মচারীর আধিপত্য অত্যধিক থাকায় এবং ইহাদের এলাকাভুক্ত অঞ্চল বিস্তৃত থাকার ফলে স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এই কমিটীসমূহ সন্তোষজনক কার্য্য করিতে পারিল না।

লর্ড রিপণ এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের প্রকৃত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে একটা সরকারী প্রস্তাব পাশ করেন। তাহার পরিকল্পনার মোটামুটি দুইটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমতঃ, জিলা বোর্ডের পরিবর্ত্তে সাবডিভিসন লইয়া প্রতিটি স্বায়ত্ত-শাসনমূলক বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ; এই বোর্ডের অধীনে স্বল্প অঞ্চল লইয়া ক্ষুদ্রতর কয়েকটি বোর্ড থাকিবে—যাহাতে বোর্ডের সভ্যগণ স্থানীয় ব্যাপারে আগ্রহ লইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে বে-সরকারী সভ্য যাহাতে সংখ্যাধিক ও ইহাদের সভাপতি একজন বে-সরকারী ব্যক্তি থাকেন তাহাও তিনি অনুমোদন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ কার্য্যকালে রিপণের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা গৃহীত না হওয়ায় রিপণের মূল উদ্দেশ্য সার্থক হইতে পারে নাই। প্রত্যেক প্রদেশেই স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসক প্রতিষ্ঠান গঠিত করার জন্য আইন পাশ হয় কিন্তু সর্ব্বত্র জেলাই স্থানীয় বোর্ড সমূহের এলাকা বলিয়া গৃহীত হইল এবং অধিকাংশ স্থানেই নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা স্বল্প সংখ্যক রহিল। রিপণ তাহার পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য বঙ্গদেশে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার প্রস্তাবিত আইন ভারত সচিব কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়াতে বাতিল হইয়া গেল। পরিশেষে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যাহা

আইনরূপে গৃহীত হইল তাহাতে বোর্ডের সভাপতির পদ ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অর্পিত হইল। রিপণের পরিকল্পনা বাতিল হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল যে বে-সরকারী সভ্যের আধিক্য হইলে বা বে-সরকারী সভাপতি থাকিলে বোর্ড নাকি আশানুরূপ কর্ম্মঠ হইত না। এ যুক্তি অস্বীকার করা যায় না—কেননা, দেশের লোক এই ব্যাপারে প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষিত ছিল না। কিন্তু রিপণ অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা পরিচালিত ত্রুটিহীন বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য মোটেই আগ্রহশীল ছিলেন না। তাহার বাসনা ছিল যে এই জাতীয় অধিকার দেশের লোকের হস্তে ন্যস্ত করিলে দেশের লোক ক্রমশঃ লোকায়ত্ত ও রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে। রিপণের সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইলেও কংগ্রেস প্রতি বৎসরই এই বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট দেশবাসীর দাবি জানাইত।

মিউনিসিপ্যালিটি সমূহঃ—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিধি প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে পৌর-শাসন নীতিও পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিল; রিপণের পূর্ব্বে পৌর-শাসন সম্বন্ধে কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বিত হয় নাই। উল্লেখযোগ্য সহর সমূহে পৌর কমিটি ছিল; ইহার সভ্যগণ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইত এবং ম্যাজিষ্ট্রেট এই সকল কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু এই কমিটির ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা, সকল ব্যাপারেই ইহাকে গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের এক প্রস্তাবের দ্বারা লর্ড রিপণ পৌরশাসন কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে পৌর-শাসন ব্যবস্থার শেষ দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিলেও দৈনন্দিন শাসন কর্ত্তৃত্ব পৌর-জনের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-সভার ন্যস্ত থাকিলেও দৈনন্দিন শাসন কর্ত্তৃত্ব পৌর-জনের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-সভার হস্তে অর্পিত হওয়া কর্ত্তব্য। পৌর-সভার সভাপতিও একজন বে-সরকারী লোক হইবেন। পৌর-সভার উপর গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব কম থাকিলে জনসাধারণ পৌর-সভার মাধ্যমে শাসন কার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ

হইবে। পৌর ব্যবস্থায় শান্তি রক্ষার কাজ গভর্ণমেণ্ট করিবেন—কিন্তু জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও আলোকাদির ব্যবস্থা পৌর-সভার দায়িত্বে সম্পন্ন হইবে।

লর্ড রিপণের উপরোক্ত প্রস্তাব সম্পূর্ণ কার্য্যকরী না হইলেও উহার অধিকাংশই গৃহীত হইয়াছিল। পৌর-সভায় প্রতিনিধিদের অধিকাংশই নির্ব্বাচন ব্যবস্থা দ্বারা গৃহীত হওয়ার বন্দোবস্ত হইল এবং চেয়ারম্যানও বে-সরকারী হইবেন বলিয়া স্থির হইল। রিপণের সময়ে গ্রাম অঞ্চলেও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন বোর্ডের সৃষ্টি হইল। লর্ড রিপণের শুভপ্রচেষ্টা সর্ব্বাংশে কার্য্যে পরিণত না হইলেও যেটুকু কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহাতেই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রকৃত সূত্রপাত হইল বলা যাইতে পারে।

প্রেসিডেন্সী সহরের শাসন ব্যবস্থা

কলিকাতা :—লর্ড রিপণের স্বায়ত্ত-শাসন বিধি গৃহীত হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনটি প্রেসিডেন্সী সহর কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের পরিচালনার জন্য পৃথক রীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত তিনটি সহরের স্বাস্থ্য, কর নির্দ্ধারণ ও আদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্য দুইটি আইন পাশ হয়। প্রত্যেক সহরে তিনজন কমিশনার নিয়োগের বন্দোবস্ত হয় এবং কলিকাতায় গ্যাসের আলো এবং পয়ঃ-প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ বিধি গৃহীত হয়। উপরোক্ত ব্যবস্থা অপর্য্যাপ্ত হওয়ায় পরিশেষে গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার জন্য একজন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। কলিকাতার কার্য্যকরী শাসনক্ষমতা ইহার উপরেই ন্যস্ত হইল। চেয়ারম্যান অধিকন্তু কলিকাতার পুলিশ কমিশনার নিযুক্ত হইলেন।

এই ব্যবস্থা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পরিবর্ত্তিত হইল এবং কলিকাতা কর্পোরেশন পুনর্গঠিত হইল। কর্পোরেশন ৭২ জন সভ্য দ্বারা গঠিত হইল ; এই সংখ্যার

দুই-তৃতীয়াংশ নির্ব্বাচিত হইবে স্থির হইল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাচিত সভ্য সংখ্যা ৫০ করা হয় এবং খানিকটা সহরতলী কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত হয়।

লর্ড কার্জ্জনের সময়ে কর্পোরেশনের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার সঙ্কুচিত করা হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের এক আইনের বলে নির্ব্বাচিত সভ্য সংখ্যা মোট সংখ্যার অর্দ্ধেক করা হয় এবং গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত চেয়ারম্যানের হস্তে অধিকাংশ শাসন ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। কর্পোরেশনের হস্তে মাত্র কর-নির্দ্ধারণ ও পরিচালনার সাধারণ নীতি অর্পিত ছিল। প্রকৃত ক্ষমতা চেয়ারম্যানই প্রয়োগ করিতেন। বারো জন সভ্য লইয়া গঠিত এক কমিটি চেয়ারম্যানের অবাধ ক্ষমতায় বাধা দিতে পারিত।

লর্ড কার্জ্জনের এই ক্ষমতা হরণের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এর বক্তৃতায় দেশবাসীর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ স্বরূপ কর্পোরেশনের ২৮ জন কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করেন—ইহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথও অন্যতম ছিলেন। (নাট্যকার অমৃতলাল বসু এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া "সাবাস আটাশ" নামে একখানা নাটক রচনা করেন)। ভাগ্যের পরিহাসে এই অন্যায়ের সংশোধন কার্য্য চব্বিশ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথেই দ্বারাই সম্পাদিত হয়।

বোম্বাই :—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই কর্পোরেশনের পৌর-শাসন কার্য্য নূতন করিয়া সংস্কৃত করা হয়। বোম্বাই সহরের পরিচালনার ভার 'জাষ্টিসেস অফ্ দি পিস' নামে পাঁচশত সভ্যের হস্তে অর্পিত হয়। উচ্চবেতনভোগী একজন চেয়ারম্যান ও একজন কণ্ট্রোলার অফ্ একাউণ্টস্ সর্ব্বময় কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সভ্য সংখ্যা কমাইয়া ৬৪ করা হয় এবং পূর্ব্ববৎ একজন চেয়ারম্যান সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী থাকে কিন্তু কণ্ট্রোলারের পদ বিলুপ্ত করা হয়।

মান্দ্রাজ :—মান্দ্রাজ সহরের শাসনভার ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনজন কমিশনারের হস্তে ন্যস্ত ছিল। উক্ত বৎসর নূতন আইনের দ্বারা মান্দ্রাজ

সহরকে আটটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতি ওয়ার্ড হইতে চারিজন কমিশনার গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত করা হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কর্পোরেশনের সভ্য সংখ্যার অর্দ্ধেক করদাতা দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়ার বন্দোবস্ত হয়; কিন্তু ইহার প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট বেতনভোগী কর্ম্মচারীরূপে গভর্ণমেণ্ট দ্বারা মনোনীত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মোট ৩২ জন সভ্যের মধ্যে ২৪ জন করদাতাগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। কার্জ্জনের সময়ে মান্দ্রাজ কর্পোরেশনও পুনর্গঠিত হয় এবং কলিকাতার মত ইহার অধিকারও খর্ব্ব করা হয়।

যাহা হৌক, বিবিধ আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও কলিকাতা এই তিন প্রেসিডেন্সী সহরের পরিচালন ব্যবস্থা এক নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে রূপায়িত হয়। এই পদ্ধতির মূল কথা—কয়েকজন নির্ব্বাচিত কমিশনার থাকিবে, বে-সরকারী চেয়ারম্যান প্রকৃত কার্য্যকরী শাসনব্যবস্থা করিবে, যাহাতে স্বাস্থ্য, জল-সরবরাহ, আলো ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত হয় ও আর্থিক অপচয় না হয় তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিবে।

(৩) আর্থিক সংবিধান

আর্থিক ব্যবস্থা ঃ—ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে ভারত গভর্ণমেণ্টের আর্থিক ব্যবস্থা কোন সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না; ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিল। প্রথম দিকে ভারত গভর্ণমেণ্টের হস্তে আর্থিক বিলি-বন্দোবস্তের ভার ছিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট নিজস্ব তহবিল হইতে প্রত্যেক প্রদেশকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিত—প্রদেশকে সেই অর্থ দ্বারা প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতে হইত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের বাজেট পদ্ধতি অনুসারে উক্ত আর্থিক বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই অত্যধিক কেন্দ্রীকরণের ফলে প্রদেশগুলি অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইল। নিজস্ব আয়ের কোন সুযোগ না থাকায় এবং

অর্থের জন্য কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হওয়ায় আয়বৃদ্ধি বা ব্যয়সঙ্কোচনের জন্য উহাদের কোন আগ্রহ রহিল না। ভারত গভর্ণমেণ্টও সকল সময়ে প্রদেশ সমূহের প্রয়োজনানুসারে অর্থ মঞ্জুর করিয়া উঠিতে পারিতেন না। যে প্রদেশ কেন্দ্রের উপর জোর খাটাইতে পারিত সেই প্রদেশেই আর্থিক ব্যাপারে কেন্দ্রের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারিত। ফলে ভারত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রদেশ সমূহের মনোমালিন্য অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

১৮৭১ হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উপরোক্ত ব্যবস্থার যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। ভারত গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং ডাক-বিভাগ ও রেলওয়ে কেন্দ্রের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিলেন এবং এই দুই বিভাগ হইতে লব্ধ ও লবণ, আফিম ও শুল্ক-বিভাগ হইতে প্রাপ্ত সমস্ত আয় কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিলেন। ভূমি-রাজস্ব, আবগারী, ডাক-টিকিট, বন-বিভাগ ও রেজিষ্ট্রেশন দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্র ও প্রদেশ সমূহের মধ্যে প্রাদেশিক প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন করা হইল। কেন্দ্র ও প্রদেশ সমূহের মধ্যে আর্থিক বিলিবন্দোবস্তের অনুপাত মাঝে মাঝে পর্য্যালোচনা দ্বারা কম বা বেশী করা হইত। এই ব্যবস্থায় প্রদেশ সমূহ আর্থিক দুর্গতির হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইল। কতকগুলি বিষয়ের আয়ে প্রদেশের স্বার্থ থাকায় প্রদেশ সমুহ এই সব বিষয়ে আয় বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইতে পারিল। আর্থিক ব্যাপারে কেন্দ্রের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী হওয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া প্রদেশ সমূহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সক্রিয় হইল।

আয়ের পন্থাঃ—ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় প্রধানতঃ ভূমি-রাজস্ব হইতে আসিত। এতদ্ব্যতীত লবণ ও আফিমের একচেটিয়া অধিকার গভর্ণমেণ্টের হস্তে থাকায় এই দুই বিভাগ হইতেও যথেষ্ট আয় হইত। মোকদ্দমা বা দলিলাদিতে এক প্রকার ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হইত; এই ষ্ট্যাম্প-কর আয়ের অন্যতম সূত্র ছিল। আমদানী বা রপ্তানী দ্রব্যের উপর নির্দ্দিষ্ট কর বা বাণিজ্য শুল্ক গভর্ণমেণ্টের আয়ের এক উপায় ছিল। এই

খাতে প্রধানতঃ বিদেশ হইতে আগত তূলাজাত দ্রব্যের উপর নির্দ্দিষ্ট শুল্ক দ্বারা বেশী আয় হইত। ভারতবর্ষে কয়েকটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইলে বিলাতী বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ উপরোক্ত আমদানী শুল্কের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিল। কেননা যথেষ্ট আমদানী শুল্ক প্রদান করিয়া বিলাতী বস্ত্র ভারতীয় বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লাভবান হইতে পারিত না। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টকে চাপ দিতেই ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিলেন এবং ভারতবর্ষেও ইংলণ্ডের মত অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রচলন করিলেন। কেবলমাত্র মগ্য ও লবণের উপর আন্তঃ শুল্ক আদায় করা হইতে লাগিল।

কিন্তু এই অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট আয় কমিয়া গেল এবং অর্থাভাবে ভারত গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িলেন। তদুপরি রৌপ্যের মূল্যবান কমিয়া যাওয়া, ব্রহ্ম যুদ্ধ, পশ্চিম সীমান্তে রাশিয়ার অগ্রসর-নীতি, দুর্ভিক্ষ নিরোধ তহবিল স্থাপন ইত্যাদির জন্য ভয়ানক আর্থিক দুর্গতি ঘটিল। এই আথিক সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতির জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আমদানী দ্রব্যের উপর পাঁচ শতাংশ শুল্ক স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। অবশ্য বিলাতী বস্ত্র ব্যবসায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাথার জন্য ভারতে জাত বস্ত্র দ্রব্যের উপরও আমদানী শুল্কের সমান আন্তঃ শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। একবার আমদানী শুল্ক রহিত করা, পুনরায় প্রবর্ত্তন করিয়াও বিলাতী বস্ত্রের স্বার্থের জন্য দেশজাত বস্ত্রের উপর শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করা এত বিসদৃশ হইয়াছিল যে স-পরিষদ বড়লাট পর্য্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ভারত সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে এই ভারতবর্ষের স্বার্থ-বিরোধী কার্য্য করিতে বাধ্য করেন। উপরোক্ত আয় ব্যতীত ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রবর্ত্তিত আয়করও আয়ের অন্যতম উপায় ছিল। মধ্যথানে কিছুকাল আয়কর উঠিয়া গেলেও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এক প্রকার স্থায়ীভাবেই আয়-কর প্রবর্ত্তিত হয়। কৃষি দ্রব্যের উপর ব্যতীত অন্য সকল প্রকার আয়ের উপর কর নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

(৪) সামরিক শাসন ব্যবস্থা

সিপাহী মিউটিনি এবং তাহার পরেও বহুদিন যাবৎ বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীত্রয় পৃথক সেনাপতির অধীনে সৈন্য সংগ্রহ ও সৈন্য-বাহিনী রক্ষা করিত। বঙ্গদেশের সেনাপতি নামতঃ ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইলেও বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নিজস্ব সেনাপতির অধীনে স্ব-স্ব সেনা-বাহিনী রক্ষা করিত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের এক আইনের দ্বারা—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উহা কার্য্যকরী হয়—ভারতীয় সৈন্যবিভাগ একজন প্রধান সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত হয় এবং সমগ্র সেনাবাহিনী বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও পাঞ্জাব এই আঞ্চলিক বাহিনীতে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক আঞ্চলিক বাহিনীর কর্ত্তৃত্ব একজন লেফটেনাণ্ট জেনারেলের হস্তে সমর্পিত হইল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কিচেনার সামরিক বিভাগে নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেন। ইহার ফলে ভারতীয় সৈন্যবিভাগ তিনটি 'কমাণ্ড' এবং নয়টি ডিভিসানে বিভক্ত করা হইল। ইহাতে এই স্থবিধা হইল যে যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় সময়েই নিদ্দিষ্ট সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব একই সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত রহিল, যুদ্ধের সময়ে সেনাপতি পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন রহিল না।

সিপাহী মিউটিনির পূর্ব্বে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে দেশীয় সৈন্য সংখ্যা অত্যধিক ছিল। মিউটিনির পরে ইংরেজ সৈন্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় সৈন্য ৬৫,০০০ এবং দেশীয় সৈন্য ১৪০,০০০ ছিল—পরবর্ত্তী সময়েও এই অনুপাত রক্ষা করা হইল। গোলন্দাজ বাহিনীর কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় সৈন্যদলের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। দ্বিতীয়তঃ, সৈন্য সংগ্রহ কার্য্যেও পরিবর্ত্তন আনয়ন করা হইল। পূর্ব্বে ভারতের কোন বিশেষ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত সৈনিক দ্বারা সৈন্য বাহিনী গঠিত হইত এবং এই সকল বাহিনীতে উচ্চবর্ণের লোকের আধিপত্য থাকিত। মিউটিনির সময়ে এই ব্যবস্থার অসুবিধা পরিলক্ষিত হইল। অতঃপর এই অবিমিশ্র প্রথা রহিত করিয়া জাতি, বর্ণ বা ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাহিনীতে মিশ্রিত

সৈন্য রাখার রীতি গৃহীত হয়। তৃতীয়তঃ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ক্রমশঃ গুর্খা, পাঠান ও শিখ প্রভৃতি সামরিক জাতির লোক গ্রহণ করা হইতে থাকে। ক্রমশঃ ইহারা সংখ্যাধিক হইয়া বেঙ্গল আর্ম্মির হিন্দুস্থানীগণকে এবং মান্দ্রাজ বাহিনীর তেলেগুদিগকে অতিক্রম করে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সামরিক বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গভর্ণর জেনারেলের কার্যকরী-পরিষদে একজন সামরিক সদস্য গ্রহণ করা হয়। এই সামরিক সদস্যের মাধ্যমে বড়লাট ভারতীয় সৈন্যবিভাগ পরিচালনা করিতেন। কিন্তু এই নূতন সদস্য নিয়োগে অসুবিধার সৃষ্টি হইল। ভারতের প্রধান সেনাপতি ইতিপূর্ব্বেই কার্য্যকরী পরিষদের অতিরিক্ত সভ্য ছিলেন। পদমর্য্যাদায় তিনি সামরিক-সদস্য অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত থাকিলেও সামরিক নীতির জন্য তাহাকে সামরিক সদস্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। ভারতের সমগ্র সৈন্যবাহিনী এক সেনাপতির অধীনে আসার পর হইতেই এই ব্যবস্থার অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কিচেনার যখন ভারতের প্রধান সেনাপতি তখন এই ব্যবস্থা লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হয়। লর্ড কিচেনার সামরিক ব্যাপারে প্রধান সেনাপতির সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দাবি করিলেন, কিন্তু তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন এই দাবি মানিতে প্রস্তুত হইলেন না ; কেননা এই ব্যবস্থায় বে-সামরিক বিভাগের উপর সমর-বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইংরেজ গভর্ণ-মেণ্টের নির্দ্দেশে কার্জ্জনকে কিচেনারের দাবি স্বীকার করিতে হয়। কার্জ্জন এই অবস্থায় পদত্যাগ করেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের প্রধান সেনাপতিই ভারতের সামকি বিভাগের জন্য একমাত্র দায়ী থাকেন।

(৫) উন্নত শাসন ব্যবস্থা

কোম্পানীর হস্ত হইতে পার্লামেণ্টের হস্তে ভারতের শাসনভার স্থানান্তরিত হওয়ায় ভারতবর্ষের সুবিধা ও অসুবিধা দুইই হইল। ক্রমশঃ

ভারত গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ মন্ত্রিসভার এক অধস্তন বিভাগে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িল এবং সর্ব্বক্ষেত্রে বৃটিশের স্বার্থের নিকট ভারতীয় স্বার্থ পদদলিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ডের রাষ্ট্র সচিব স্যার হেনরী ফাউলার এ বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টকে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে বৃটিশ মন্ত্রিসভার যে কোন নির্দ্দেশ ভারতের স্বার্থ-বিরোধী হইলেও ভারত সরকারের পক্ষে তাহা বিনা প্রতিবাদে অবশ্য পালনীয়। পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধেও একই নীতি অনুসৃত হইয়াছিল, অর্থাৎ কোন বিষয়ে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে স্বার্থ সংঘাত উপস্থিত হইলে ভারতকে ইংলণ্ডের অনুকূলে নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে হইত। শিল্প-বাণিজ্য, মুদ্রামান, বৈদেশিক নীতি ও অন্য সকল আর্থিক ব্যাপারেও ভারতের স্বার্থ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ক্ষুণ্ণ করা হইত।

কিন্তু উপরোক্ত ক্ষতির কথা বাদ দিলে বলা যাইতে পারে যে পার্লা-মেণ্টের সঙ্গে ভারত শাসনের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ' সংযোগে ভারতের পক্ষে শুভঙ্কর হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ প্রাচ্য দেশ অপেক্ষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও তাহা জাতীয় জীবনে কার্য্যকরী করার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ডের মত সর্ব্ববিষয়ে অগ্রসর পাশ্চাত্যজাতি অনগ্রসর ভারতের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শাসন ব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের উচ্চাদর্শ ও কর্ম্মশক্তি যুক্ত করিল। বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার সমূহ ইংলণ্ডের মাধ্যমে ভারতে গৃহীত হইল এবং ভারতের ধন-সম্পদের উন্নতির সূত্রপাত হইল। এতদ্ব্যতীত ইউরোপের উদারনৈতিক মানবাদর্শ সমূহ ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভারতের বিধি-সমূহে মাদক-বর্জ্জন প্রচেষ্টা, কারখানা-শ্রমিক আইন, দুর্ভিক্ষ-নিরোধ তহবিল, রেলপথ নির্ম্মাণ, খাল খনন, ইত্যাদি জাতিকল্যাণকর প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা অনস্বীকার্য্য যে ইংলণ্ড ভারত শোষণে কোন ত্রুটি করে নাই। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইংলণ্ডের মাধ্যমেই ভারতবর্ষ মধ্যযুগীয় জাতি হইতে আধুনিক সভ্য জাতিতে পরিণত হইতে সক্ষম হইয়াছে।

———

তৃতীয় অধ্যায়

নব ভারতের প্রগতির ইতিহাস, ১৮৫৮—১৯০৫

(১) *শিক্ষা ব্যবস্থা*

ভারতের শাসনভার কোম্পানীর নিকট হইতে পার্লামেন্টের নিকট হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা ব্যাপারে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের স্যার চার্লস উডের এডুকেশন ডেসপাচই দীর্ঘকালের জন্য ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির নির্দ্দেশক হইয়া রহিল। ডেসপাচের পরিকল্পনানুযায়ী ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন আসিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর ও এলাহাবাদে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বহু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উচ্চতর পাঠনের বন্দোবস্ত হইল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র হইল। গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষাধীনে একাধারে যেমন বহু স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, অন্যদিকে সরকারের অর্থ সাহায্যে অথবা শুদ্ধ বে-সরকারী প্রচেষ্টায়ও দ্রুত স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য উদ্যোগী হইলেন এবং এই শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূমি রাজস্বের উপর অতিরিক্ত শিক্ষা কর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যস্থার আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায় এই বিষয়ে তদন্তের জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'হাণ্টার কমিশন' নিয়োগ করিলেন। এই কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার ভার নবগঠিত পৌর-সভা এবং জেলা-সভা-র উপর অর্পণ করিবার জন্য অনুমোদন করিলেন। এই কমিশন শিক্ষা বিস্তারের জন্য বে-সরকারী প্রচেষ্টার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে দেশে বহুতর স্কুল ও কলেজ গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

(২) সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কার

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে নব-লব্ধ সমাজ চেতনা ভারতের সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল হইল এবং ধর্ম্মীয় ও সামাজিক ত্রুটি সমুহ সংশোধনের জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইতে লাগিল। এই সংস্কারের প্রথম যুগে সংস্কারকগণ ভারতের সমস্তই খারাপ এবং পাশ্চাত্যের সমস্তই ভাল এই মনোভাব গ্রহণ করিয়া প্রগতিমূলক পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতিনীতি ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তন করিবার স্বপক্ষে মত প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে সংস্কারকগণকে ভারতীয় সনাতন পন্থীদের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইল। পরবর্ত্তী যুগের সমাজ-বিপ্লবীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হইল এবং মূলতঃ হিন্দুধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া তাহারা যুগোপযোগী নূতব মতবাদের প্রচার করিল। ভারতের সকল ধর্ম্মেই সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্ম্মব্যবস্থা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুতরাং নূতন নূতন ধর্ম্মীয় মতবাদের সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। মানবতার সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই এই সকল মতবাদের মূলে ছিল।

(ক) ব্রাহ্ম-সমাজ ঃ—রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রচারিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তাহা ছিলেন না। ইহা অনস্বীকার্য্য যে রামমোহন রায় একেশ্বরবাদী এবং অ-পৌত্তলিক ছিলেন এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভায় একেশ্বরবিশ্বাসী সকল ধর্ম্মের লোকের প্রবেশাধিকার ছিল। কিন্তু রাজা স্বয়ং বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন প্রর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণ হিসাবে যজ্ঞোপবীত রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সভায় ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করিতেন এবং অব্রাহ্মণদের তথায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্ত্তী যুগের ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম মূল নীতি একেশ্বরবাদ বা অ-পৌত্তলিকবাদ-এর প্রচারক ছিলেন বলিয়া সম্ভবতঃ রাজা রামমোহনের উপর ব্রাহ্ম সমাজের জনকত্ব আরোপ করা হয়।

রামমোহনের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম আন্দোলনের মুখপাত্র

হন এবং ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই নূতন ধর্ম্মমতের জন্য বিধিসঙ্গত আইন-কানুন প্রণয়ন করেন। এই নব ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন এবং এই পত্র-পত্রিকার সাহায্যে তিনি মূর্ত্তিবিরোধী একেশ্বরবাদ ও বেদের অপৌরুষেয়তা—যাহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মমতের মূল ভিত্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই নূতন ধর্ম্মমতে কেশব চন্দ্র সেন প্রমুখ কয়েকজন ধর্ম্মোৎসাহী তরুণ যোগদান করিলে ইহাতে নূতন প্রাণ সঞ্চার হইল এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সাধনায় নিযুক্ত না থাকিয়া সমাজ সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে অগ্রসর হইল। সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম সমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সমাজের মোট শাখার সংখ্যা ছিল চুয়ান্ন—তন্মধ্যে একমাত্র বঙ্গদেশেই পঞ্চাশটা ছিল।

অচিরেই এই তরুণ সভ্যদের সঙ্গে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রমুখ আদি সমাজের প্রবীণ সভ্যদের বিরোধ উপস্থিত হয়। অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি প্রগতিমূলক সমাজ সংস্কার সমর্থন ও প্রচার করাতে প্রবীণের দল শঙ্কিত হয় এবং দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর সমাজের একমাত্র অছি হিসাবে কেশব সেন প্রভৃতিকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করেন। এই বহিষ্কৃত তরুণ সম্প্রদায় কেশব সেনের নেতৃত্বে মূল প্রতিষ্ঠান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের দল আদি ব্রাহ্ম সমাজ বলিয়া পরিচিত হইতে থাকে। এই নব্য সম্প্রদায় শুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্মমত প্রচারে লিপ্ত না থাকিয়া বিভিন্ন সমাজ সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য জন্য আন্দোলন করিতে থাকে। ইহাদের সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে নারীর উন্নতি বিধায়ক প্রস্তাব সমূহ উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ ইহাদের আন্দোলনের জন্যই গভর্ণমেণ্ট ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের 'তিন আইন' (Act III of 1872) পাশ করেন। এই তিন আইনের ফলে যে ব্যক্তি হিন্দু বা ইসলামের মত কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত স্বীকার করিবে না তাহার পক্ষে অসবর্ণ বিবাহ

বা বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হইবে; কিন্তু তাহার পক্ষে বাল্যবিবাহ বা বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হইবে। ইহা অনস্বীকার্য্য যে এই 'তিন আইন' ভারতবাসীর সমাজ-জীবনে বিপ্লবী যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে।

কেশব সেনের ব্রাহ্ম সমাজেও অচিরে ভাঙ্গন ধরিল। এই বিরোধের মূলেও ছিল তরুণ ও প্রবীণের মধ্যে আদর্শের সংঘাত। সমাজের চরমপন্থী সভ্যগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অবাধ অধিকার দাবী করিলেন, কিন্তু কেশব সেন বা তাহার মতানুবর্ত্তী প্রবীণ দল স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা প্রগতিমূলক মতবাদে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না—স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিলেন। অধিকন্তু সমাজের মধ্যে চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ভক্তিবাদ এবং সঙ্কীর্ত্তন ক্রমশঃ স্থান পাইতে লাগিল। কেশব সেন ক্রমশঃ তাহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক 'অবতারে' পরিণত হইলেন। ইহাতে তরুণ সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণ ঘটিল। চরম বিরোধ ঘটিল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজের সঙ্গে কেশব সেনের চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ উপলক্ষে। সমাজের বিধি লঙ্ঘন অর্থাৎ নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিয়া কেশব সেন তরুণ সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইলেন। কেশব সেন 'প্রত্যাদিষ্ট' হইয়াই নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন এই ঘোষণা সত্ত্বেও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ' নামে নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। কেশব সেনের সমাজ নব-বিধান নামে পরিচিত হইতে লাগিল এবং 'সাধারণ সমাজ'ই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইল এবং 'নববিধান' আদি সমাজের মতই মুষ্টিমেয় লোকের সস্তে অবজ্ঞাত হইয়া রহিল।

ভারতবর্ষের সামাজিক উন্নতির ইতিহাসে ব্রাহ্ম-সমাজের অবদান উল্লেখ-যোগ্য। নারীর সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন এবং নারীকে পুরুষের সমমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার মূলে রহিয়াছে ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন-বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ নিরোধ, বহুবিবাহ নিরোধ, উচ্চ শিক্ষা প্রবর্ত্তন ইত্যাদি সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক সংস্কারের জন্য জনমত সৃষ্টি এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎ-

সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন ব্রাহ্ম সমাজের প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের জন্য এই সব সমাজ-কল্যাণ প্রচেষ্টা নিবদ্ধ থাকিলেও বৃহত্তর হিন্দু সমাজ এই সব অন্দোলনের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছে এবং আন্তঃবর্ণের মধ্যে পান-ভোজন, নিষিদ্ধ হওয়া, সমুদ্র যাত্রায় জাতিভ্রষ্ট হওয়া ইত্যাদি কুসংস্কার ক্রমশঃ হিন্দু সমাজের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের একেশ্বরবাদ ও অ-পৌত্তলিকতা ব্যতীত ব্রাহ্ম-সমাজের সমস্ত বিধানই বৃহত্তর হিন্দু সমাজ স্বীকার করিতে দ্বিধা করে নাই।

(খ) প্রার্থনা সমাজ ঃ—ব্রাহ্ম সমাজের অনুরূপ সমাজ-সংস্কার আন্দোলন প্রার্থনা সমাজ-এর দ্বারা মহারাষ্ট্র দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টব্দে কেশব সেনের উদ্যোগেই মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বহিরঙ্গের দিক দিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে প্রার্থনা সমাজের কোনই পার্থক্য ছিল না। সমাজ উন্নয়ন ও নারী-কল্যাণ প্রচেষ্টা উভয় প্রতিষ্ঠানেরই অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পার্থক্য ছিল ধর্ম্মমতের মধ্যে—প্রার্থনা সমাজ নিজেকে ব্রাহ্মসমাজের মত হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত কোন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় বলিয়া মনে করিত না—বরঞ্চ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত এক সংস্কারক প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রচার করিত। প্রার্থনা সমাজ অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের সন্তদের অনুরাগী ছিল। প্রার্থনা সমাজ ধর্ম্মান্দোলন অপেক্ষা আন্তঃবর্ণ বিবাহ, পানভোজন, বিধবা-বিবাহ, অনুন্নত ও দুঃস্থদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অধিক আগ্রহশীল ছিল। ইহাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে বহু শিশুসদন, অনাথাশ্রম, চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ কল্যাণকর সামাজিক আন্দোলন ও উন্নতির পশ্চাতে প্রার্থনা সমাজের সক্রিয় হস্ত ছিল। প্রার্থনা সমাজকে এই ভাবে প্রাণবন্ত করার কৃতিত্ব বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ের। রাণাড়ের আগ্রহাতিশয্যেই প্রতিবৎসর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে একটি সামাজিক সম্মেলনেরও ব্যবস্থা হয়।

(গ) আর্য্য সমাজ ঃ—ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ-এর আন্দোলন প্রধানতঃ পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অপর দুইটি ধর্ম্ম ও সমাজ-মূলক আন্দোলন জন্ম পরিগ্রহ করে—একটি আর্য সমাজ-এর অপরটি রামকৃষ্ণ মিশন-এর। এই আন্দোলনদ্বয় প্রধানতঃ ভারতের সনাতন ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং হিন্দুধর্ম্মের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে এইরূপে রূপায়িত করিয়াছে।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। দয়ানন্দ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন—পাশ্চাত্য শিক্ষা তাহার কিছুই ছিল না। তাহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মান্দোলনের প্রধান ভিত্তি ছিল বেদ। বেদ ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের কোন শাস্ত্র গ্রন্থকে তিনি স্বীকার করিতেন না এবং বেদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলিলে সমাজের কল্যাণ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বেদে যাহা নাই জগতে অন্য কোথায়ও থাকিতে পারে না, এমন কি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলিও নাকি বেদের মধ্যে নিহিত আছে। বেদ সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ব্যাপারে দয়ানন্দের একটু আতিশয্য থাকিলেও মোটামুটি দয়ানন্দ রাজা রামমোহনের মতই অদ্বৈতবাদী ও অ-পৌত্তলিকবাদী ছিলেন। দয়ানন্দ বর্ণাশ্রমের কঠোরতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বা সমুদ্র যাত্রার নিষেধ প্রভৃতির প্রতিবাদ করেন এবং স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেন। দয়ামন্দের ধর্ম্ম আন্দোলনের সর্ব্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 'শুদ্ধির ব্যাপারে। এই 'শুদ্ধি' বা পবিত্রকরণের উদ্দেশ্য ছিল অ-হিন্দুকে ধর্ম্মান্তরিত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করা। 'শুদ্ধি' আন্দোলন অন্য ধর্ম্মের চাপে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে কম সাহায্য করে নাই। ইহার ফলে অগণিত ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু পুনরায় স্বধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করার সুযোগ প্রাপ্ত হইল।

ব্রাহ্ম বা প্রার্থনা সমাজ অপেক্ষা আর্য্যসমাজ এর অন্তর্নিহিত শক্তি অধিক ছিল ; কেননা দয়ানন্দ এর আবেদন প্রধানতঃ জনসাধারণের নিকট

ছিল। পক্ষান্তরে ব্রাহ্ম সমাজ শিক্ষিত উচ্চ কোটির জনসমাজে কেন্দ্রীভূত থাকিত। এই কারণেই আর্য্যসমাজ অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং উহার কার্য্যকারিতা ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়। দয়ানন্দের মৃত্যুর পরে আর্য্যসমাজের কার্য্যভার লালা হংসরাজ, পণ্ডিত গুরুদত্ত, লালা লাজপৎ রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি আর্য্যসমাজী নেতৃবৃন্দ কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করেন। আর্য্য সমাজ উত্তর ভারতের সর্ব্ববিধ সামাজিক আন্দোলনের অগ্রদূত হয়। বৈদিক আদর্শকে আধুনিক জীবনে রূপান্তরিত করিবার সদুদ্দেশ্য লইয়া হরিদ্বারে বিখ্যাত 'গুরুকুল বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্য্য সমাজীরা প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করে নাই—পরিশেষে উহা অস্বীকার করিতে না পারিয়া বিখ্যাত লালা হংসরাজ লাহোরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সমন্বিত এ্যাংগ্লো-ভেডিক্ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

(ঘ) **রামকৃষ্ণ মিশন ঃ**—উনবিংশ শতাব্দী ও আধুনিক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন-এর মধ্যে ভারতবর্ষের সনাতন কৃষ্টি ও পাশ্চাত্যের আধুনিক উদার মতবাদের সমন্বয় হইয়াছে। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠান যে মহাত্মার স্মৃতি বহন করিতেছে সেই পুণ্যশ্লোক রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৪-১৮৮৬) প্রথম জীবনে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের সামান্য পূজারী ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান সময়ে তিনি দীর্ঘকাল ধর্ম্ম-সাধনা করেন এবং পরিশেষে ধর্ম্ম বিষয়ে দিব্য জ্ঞান লাভ করেন। তাহার ধর্ম্মের মূল কথা 'যত মত, তত পথ,' অর্থাৎ ভগবৎ কৃপা লাভ যে কোন ধর্ম্মের অনুশীলনেই হইতে পারে। ইসলাম ধর্ম্ম বা খৃষ্টধর্ম্ম কাহাকেও তিনি অবজ্ঞা করিতেন না। সকল ধর্ম্মের সারমর্ম্ম তিনি সমানভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার নিকট উপস্থিত ভক্ত বা শ্রোতা সকলের নিকট তিনি যে গল্পছলে ধর্ম্মের বাণী সমূহ প্রকাশ করিতেন তাহার মধ্যে কোন বিশেষ ধর্ম্মের স্থান ছিল না।

রামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তাহার বাণীর যথেষ্ট প্রসার হয় নাই। কিন্তু

তাহার তিরোধানের পরে তাহরে অন্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এই মহাত্মার বাণী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া গুরুকে সাধারণের নিকট পরিচিত করেন। চিকাগো 'ধর্ম্ম মহা-সম্মিলনে' বক্তৃতা প্রদান করিয়া বিবেকানন্দ সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তদবধি রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব কথিত ধর্ম্মের বাণী সমূহ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হয় ও দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র রামকৃষ্ণ মিশন-এর শাখা ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে যে অধোগতি আসিয়া পড়িয়াছে তাহার সংস্কার সাধন করিয়া ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে উন্নীত ও মহিমান্বিত করা। রামকৃষ্ণদেব বিশুদ্ধ বেদান্তবাদী হইলেও পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং স্বয়ং কালী সাধনা করিয়া ঐকান্তিক আগ্রহের বলে যে বিগ্রহে প্রাণ সঞ্চার করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় মূর্ত্তি-পূজা উপাসককে অগ্রগতিতে সাহায্য করে, মৃন্ময়ের মধ্যেই চিন্ময়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম মূর্ত্তিপূজা ইত্যাদি বহিরঙ্গ সৌষ্ঠবের প্রতি অত্যধিক আগ্রহশীল হওয়াতেই ধর্ম্ম এতটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মে স্বয়ং আস্থাশীল হইলেপ রামকৃষ্ণদেবের বাণীর মধ্যে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় সাধনের কথা রহিয়াছে এবং রামকৃষ্ণ মিশনও তাহাই প্রচার করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে স্বীয় কক্ষপুটে দীক্ষিত করার কোন প্রচেষ্টা না থাকায় রামকৃষ্ণ মিশন সর্ব্বত্র আদৃত ও জনপ্রিয় হয়। রামকৃষ্ণ মিশন বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া দুঃস্থ ও পীড়িতের সেবা, হাঁসপাতাল ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষ ও বন্যার সময়ে আর্ত্ত-ত্রাণমূলক কার্য্য করিয়া সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের অধ্যাত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বর্ত্তমান হিংসোন্মত্ত পৃথিবীকে এই অধ্যাত্ম শক্তিই রক্ষা করিতে পারিবে ইহাই প্রচার করিতেন। কিন্তু বিশ্বের দরবারে ভারতের বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে ভারতের অধঃপতিত অবস্থা দূর করার প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশন তাহার কার্য্যাবলী দ্বারা স্বামিজীর এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। স্বামিজীর উদাত্ত ও অভয় বাণী পরাধীন ও নিশ্চল জাতির প্রাণে আশার আলো বহন করিয়া আনিল ও জাতির নবজাগরণে সহায়ক হইল। ভারতের জাতীয় আত্ম-সম্বিৎ ফিরাইয়া আনা ও বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্য উপস্থাপিত করা এই দুইটিই রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রেষ্ঠ দান।

(ঙ) জাতীয়তার বিকাশ—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঃ—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশ। এক দিকে যেমন ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষের উচ্চ কোটির চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজ জাতিসুলভ উদার মতবাদ, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে চেতনার সঞ্চার হইতেছিল; অন্যদিকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাণীর ঘোষণাপত্র পর্য্যন্ত (১৮৫৮) ভারতবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণসাধন ও স্বার্থরক্ষণ যে ভারত শাসনের উদ্দেশ্য তাহা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করায় ইংরেজের ন্যায়নীতি ও সুবিচার সম্বন্ধে ভারতবাসীর মনে শ্রদ্ধার উন্মেষ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আশা পোষণ করিতে লাগিল যে ভারতবাসীরা উপযুক্ত হইয়া উঠিলেই ইংরেজ জাতি তাহাদের হস্তে ধীরে ধীরে ভারতের শাসনভার অর্পণ করিবে। ভারতবাসীর এই প্রত্যাশার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দল ভারত শাসন সম্বন্ধে যথার্থই উদারনীতি অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছিল। ইংরেজ জাতির ন্যায়াদর্শের প্রথম পরীক্ষা হইল ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে অধিকতর ভারতবাসী গ্রহণ করিবার অনুরোধের দ্বারা। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও কার্য্যক্ষেত্রে ভারত শাসনে ভারতবাসীদিগকে অংশ দানে ইংরেজের অনিচ্ছা প্রকাশ পাইতে লাগিল। লর্ড লিটন এক গোপনীয় আজ্ঞাপত্রে লিখেলেন—"All means were taken of breaking to the heart of promise they had

uttered in the ear." কয়েক বৎসরের মধ্যে গুটিকয়েক ভারতবাসী সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়াতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হন এবং ভারতবাসীর উক্ত চাকুরীতে প্রবেশের পথে অন্তরায় সৃষ্টির জন্য নানাবিধ উপায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিসে কৃতকার্য্য হইলেও প্রথমতঃ তাহাকে চাকুরী হইতে বঞ্চিত করা হয়। পরিশেষে গ্রহণ করা হইলেও চাকুরী জীবনের তুচ্ছ ত্রুটির জন্য তাঁহাকে সিভিল সার্ভিস হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইয়া জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হন এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ব্বাভাস রূপে কলিকাতার "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান" গঠন করেন। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া কয়েকবৎসর পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভূমিষ্ঠ হয়। এই সময়ে সিভিল সাভসে প্রবেশার্থী ভারতবাসীর বয়স একুশ হইতে কমাইয়া উনিশ করা হয়। এই অন্যায় বিধানের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হয় এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের প্রতিনিধি হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষময় বক্তৃতা প্রদান করিয়া ভারতায় জনমতকে জাগ্রত করেন এই বিষয়ে ইংরেজ জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ বিলাতে প্রেরিত হয় এবং তাহার বাগ্মীতা এবং যুক্তিতর্কের ফলে পার্লামেণ্ট চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সিভিল সার্ভিস আইনের সংশোধন করিতে বাধ্য হয়। লর্ড লিটনের সময়ের "দেশীয় সংবাদপত্র আইন' ও 'অস্ত্র আইন' বিধিবদ্ধ হওয়াতে ভারতবাসী ক্ষুব্ধ হয় ও তাহারা ক্রমশঃ ইংরেজের ন্যায়াদর্শ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে। ইংরেজ জাতির এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল বিধি পরোক্ষভাবে ভারতের জাতীয় জাগরণে সহায়তা করিল এবং অন্ধ রাজানুগত্যের স্থলে রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম শতকে 'ইলবার্ট বিল' আন্দোলনের সময়ে

ভারতবাসীর রাজনৈতিক দাবীর মুখপাত্র হিসাবে এক নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব অনুভূত হইল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপনের সময়ে আইন সচিব ইলবাট একটি আইনের পাণ্ডুলিপি, যাহা 'ইলবাট বিল' নামে খ্যাত হইয়াছে, প্রস্তুত করেন। এযাবৎকাল ইউরোপীয়গণ স্বজাতীয় বিচারক দ্বারা বিচারের সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন ; এই বিলে উপরোক্ত সুবিধা প্রত্যাহার করিয়া দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কর্ত্তৃক ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারের ব্যবস্থা ছিল। এই বিলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ইংরেজ সম্প্রদায় ভারতে ও ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল। নেটিভের হাতে বিচার—নেভার, নেভার। *ইলবার্ট বিল বিরোধী ইংরেজ সম্প্রদায় এই বিল প্রত্যাহারের আন্দোলন চালাইবার জন্য দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিল। ইলবার্ট বিলকে উপলক্ষ করিয়া ভারতে বৃটিশ বিরোধী জনমতের সৃষ্টি হইল। স্বজাতীয়দের তুমুল আন্দোলনে রিপণ বাধ্য হইয়া ইলবার্ট বিল প্রত্যাহার করেন। ইহার পরিবর্ত্তে যে আইন পাশ হয় তাহাতে ভারতীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সেসন জজকে ইয়োরোপীয়ান অপরাধী বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইল। অপরাধী ইচ্ছা করিলে স্বজাতীয় জুরী বা অপরাধ নির্ণায়ক সভার সাহায্য লইতে পারিত। ইলবার্ট বিল আন্দোলন সম্বন্ধে সমগ্র ভারতীয়ের ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হইল। জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ এই বিষয়ে অগ্রণী হইলেন। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য ভারতবর্ষের সমগ্র অঞ্চল হইতে প্রতিনিধি আহূত হইয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কনফারেন্সে" মিলিত হইল। একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান আলান অক্টেভিয়ান হিউম-এর পরামর্শে ও প্রচেষ্টায়

*ইলবার্ট বিল উপলক্ষে রচিত হেমচন্দ্রের কবিতা স্মরণীয়—

"গেল রাজ্য গেল মান
হাঁকিল "ইংলিশ ম্যান"
নেটিভের হাতে মান
নেভার, নেভার।"

শাসকবর্গের নিকট ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিত্ব ও তাহাকে উপস্থাপিত করার জন্য জাতীর প্রতিষ্ঠান 'কংগ্রেসের' সৃষ্টি হইল। 'কংগ্রেস' সৃষ্টির প্রাক্কালে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিণ শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া কংগ্রেসের আবির্ভাবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন

মিঃ হিউমের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান রূপে কংগ্রেসের উপযোগিতা স্বীকার করেন। অতঃপর ভারতের সকল প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি আহূত হইয়া ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে বোম্বাই সহরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। তারপর প্রতিবৎসর ভারতের কেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণ কংগ্রেসে যোগদান করিয়া কংগ্রেসের বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। কংগ্রেস মঞ্চ হইতে ভারতবর্ষের জনসাধারণের অভাব অভিযোগ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং শাসক জাতি প্রথমে ইহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেও পরিশেষে এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে শঙ্কা বোধ করিতে লাগিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী কংগ্রেসের প্রত্যেক বাৎসরিক অধিবেশনে ইংরেজ শাসনের ত্রুটির সমালোচনা হইত এবং গভর্ণমেণ্ট যাহাতে এই সকল ত্রুটি দূর করে তজ্জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইত। সাধারণতঃ কাউন্সিলে অধিক সংখ্যক ভারতবাসী গ্রহণ, ভারতে পর্য্যাপ্ত শিক্ষাবিস্তার, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, ইংলণ্ডের মত ভারতবর্ষেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদে অধিক সংখ্যক ভারতীয়ের প্রবেশাধিকারের সুবিধা প্রদান ইত্যাদি প্রস্তাব প্রতি বৎসরেই গ্রহণ করা হইত। কিন্তু এই যুগের কংগ্রেস অত্যন্ত মডারেট-পন্থী ছিল এবং বৃটিশের বিরক্তি উৎপাদন কর কোন প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করিত না। কিন্তু উপরোক্ত প্রস্তাব সমূহ

কংগ্রেসে গৃহীত হইলেও গভর্ণমেণ্ট তাহা কার্য্যকরী করিবার কোন চেষ্টাই করিত না। বৎসরের পর বৎসর প্রস্তাব গৃহাত হইয়া গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া থাকিত। গভর্ণমেণ্টের এই ঔদাসীন্যে বিরক্ত হইয়া কংগ্রেস তাহার প্রস্তাব সমূহ গভর্ণমেণ্ট যাহাতে গ্রহণ করে তজ্জন্য 'নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন' আরম্ভ করিল। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আন্দোলন চলিল, এমন কি ইংলণ্ডবাসীর কর্ণগোচর করিবার জন্য ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতেও বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা হইল। এই আন্দোলন নিস্ফল হয় নাই—১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস এ্যাক্ট কংগ্রেস আন্দোলনেরই সুফল।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের এই আন্দোলনকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিল না। দেশীয় জনমত রুদ্ধ করার জন্য তাহারা 'রাজদ্রোহ আইন' সংবাদপত্র দমন আইন' ইত্যাদি পাশ করিয়া দেশবাসীর অশ্রদ্ধার কারণ হইল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা, মহারাষ্ট্র নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড, পুনায় প্লেগ দমন উপলক্ষে বৃটিশ কর্ম্মচারীদের অত্যাচার, বিনা-বিচারে জনপ্রিয় নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্ব্বাসন, ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্র 'ইংলিসম্যান' 'পায়োনিয়ার' প্রভৃতি কর্তৃক দেশীয় সংবাদপত্রের তথা ভারতবাসীর বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গীরণ ইত্যাদি ব্যাপারে কংগ্রেসের পূর্ব্বতন 'আবেদন-নিবেদন' নীতি বহু ব্যক্তির নিকট নিস্ফল বলিয়া মনে হইল। গভর্ণমেণ্টের ভ্রান্ত নির্য্যাতন নীতির ফলে কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী দলের আবির্ভাব হইল। এই চরমপন্থী দলের সুস্পষ্ট প্রকাশ ১৯০৬-১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে দৃষ্ট হইল। এই চরমপন্থী দল কংগ্রেসের এযাবৎ অনুসৃত বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধী হইল। এইরূপে দেশে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হইল।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট প্রথমে কংগ্রেসকে 'অনুবীক্ষণিক সংখ্যাল্প' জনসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সভা বলিয়া উপহাস করিলেও ইহার ক্রমবর্দ্ধমান ও জনপ্রিয়তার ভীত হইয়া মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস হইতে দূরে রাখিবার

জন্য সচেষ্ট হইল। গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টা নিস্ফল হইল না—ইংরেজের অনুগত স্যার সৈয়দ আহম্মদ, নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি, রাজা আমির হোসেন খান প্রভৃতি মুসলমান নেতৃবৃন্দ স্বধর্ম্মীয়গণকে হিন্দু প্রধান কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তৎকালে এই প্রচেষ্টা মোটেই সার্থক হয় নাই। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে তিনশতাধিক মুসলমান প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিল এবং সুবিখ্যাত মুসলিম নেতা বদরুদ্দিন তায়েবজী তৃতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শিক্ষিত মুসলমানদের একদলকে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গঠনে প্ররোচিত করিতে লাগিল এবং ইহাদের দ্বারাই মুসলিম স্বার্থ-রক্ষী প্রতিষ্ঠান "মুসলিম লীগ" (১৯০৬) সৃষ্ট হইল। মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের এক ডেপুটেশন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইল এবং গভর্ণমেণ্ট মুসলিম স্বার্থ বিশেষভাবে রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই ভাবে ইংরেজের প্ররোচনা ও প্রশ্রয়ে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হইলেও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মনোবৃত্তি মুসলমানদের মনে ততটা স্থায়ী স্থান লাভ করে নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইলেও কংগ্রেস ও লীগ একযোগে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে।)

———

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, ১৯০৬-'৩৭

লর্ড কার্জ্জনের পর-রাষ্ট্রনীতি

লর্ড কার্জ্জন (১৮৯৯-১৯০৫) দ্বিতীয় এলগিনের পরে ভারতের বড়লাট হইয়া আগমন করেন। মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি যে বিদ্যাবত্তা, প্রাচ্য-দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা; ও কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা তাহার পূর্ব্বে বা পরে কোন বড়লাটের মধ্যে দৃষ্ট হয় নাই। তিনি শাসন কার্য্যে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে তিনি ডাল-হৌসীর রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন। প্রাচ্য দেশে বৃটিশের প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে—ইহাই কার্জ্জনের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ভারতের বড়বাট হওয়ার পূর্ব্বে তিনি বহুবার ভারতবর্ষ, সিংহল, আফগানিস্থান, চীন, পারস্য, তুরস্ক, জাপান ও কোরিয়া প্রভৃতি এশিয়ার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার পররাষ্ট্র নীতি প্রধানতঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত, আফগানিস্থান, পারস্য ও তিব্বত এই চারিটি স্থানের সমস্যা লইয়াই পরিচালিত হইয়াছে।

(ক) **উত্তর পশ্চিম সীমান্ত** ঃ—লর্ড কার্জ্জন উত্তর পশ্চিমে নূতন সীমান্ত নীতি অবলম্বন করিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কালের 'অগ্রসর নীতি' পরিত্যাগ করিয়া কার্জ্জন 'অপসরণ ও সন্নিবেশ' (Withdrawal and Concentration) নীতি গ্রহণ করিলেন। চিত্রল, টোচি উপত্যকা, লাণ্ডিকোটাল, খাইবার পাশ প্রভৃতি সীমান্ত-পারের উপজাতি অধ্যুষিত স্থান হইতে বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া আনার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু চিত্রল, কোয়েটা প্রভৃতি পূর্ব্বে অধিকৃত সামরিক ঘাঁটি সমূহে বৃটিশ সৈন্য সমাবেশ অক্ষুন্ন রহিল। উপরোক্ত অঞ্চলের পরিত্যক্ত বৃটিশ সৈন্যের স্থান বৃটিশ কর্ম্মচারীদ্বারা শিক্ষিত উপজাতি অঞ্চলের

লোক দ্বারা পূর্ণ করা হইল। উপজাতিদের মধ্যে অস্ত্র শস্ত্র যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বাহির হইতে আমদানী না হইতে পারে তজ্জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইল। সীমান্তে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ নির্ম্মিত হইল—এই রেলপথ খাইবারের প্রবেশ পথ দরগাই, জামরুদ এবং কুররাম উপত্যকার প্রবেশদ্বার থাল পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইল। কার্জ্জনের সীমান্তনীতির মূল উদ্দেশ্য হইল একদিকে সীমান্ত-পারের উপজাতিদিগকে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সম্বন্ধে আশ্বস্ত করিয়া তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা—অন্যদিকে যাহাতে সীমান্ত অঞ্চল উপজাতি দ্বারা উপদ্রুত না হইতে পারে তাহার জন্য যথেষ্ট সামরিক প্রতিবিধান করা। বৃটিশের শক্তি সম্বন্ধে যাহাতে উপজাতিদের মনে কোন সন্দেহ না থাকে তজ্জন্য সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি সমূহ পর্য্যন্ত বৃটিশ সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া রাখা হইল। কার্জ্জনের এই নূতন নীতির ফল পরিণামে শুভ হইয়াছিল—১৯০১ খৃষ্টাব্দের মাসুদ-ওয়াজিরী আক্রমণ ব্যতীত সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল সীমান্ত অঞ্চল নিরুপদ্রুত ছিল।

সীমান্ত প্রদেশ সৃষ্টি ঃ—কার্জ্জনের অন্যতম কার্য্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে একটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি। সীমান্ত অঞ্চলের শাসন-কার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য ইহা করা হয়। পঞ্জাব প্রদেশ হইতে কয়েকটি অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রধানতঃ সিন্ধু-পারের অঞ্চল সমূহ লইয়া (ডেরা গাজি খাঁ ব্যতীত) ৪০,০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী সীমান্ত প্রদেশ সৃষ্ট হয় এবং এই নব সৃষ্ট প্রদেশের ভার ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষাধীন একজন চীফ কমিশনারের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। প্রাক্তন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আগ্রা অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশ নামকরণ হয়।

সীমান্তের পরবর্ত্তী ইতিহাস

কার্জ্জনের সীমান্ত নীতি সাময়িক ভাবে সফল হইলেও সীমান্তিক স্থায়ী সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হয় নাই। পর্ব্বত-সঙ্কুল উপজাতি অঞ্চলের বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থার দৃঢ় বিন্যাস কোন প্রকারে হইয়া উঠিল না। প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিয়া এবং

উপজাতিদের মধ্য হইতে রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উপজাতিদের দুর্দ্দমনীয় লুণ্ঠন প্রবৃত্তি নিবারণ করিতে সক্ষম হইল না। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময়ে কার্জ্জন প্রতিষ্ঠিত সীমান্ত রক্ষা পদ্ধতি একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। সীমান্ত পারের অঞ্চল সমূহ পুনরায় কর্ম্মতৎপর হইয়া বৃটিশ এলাকায় অভিযান আরম্ভ করিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহাদের উপদ্রব দমন করিবার জন্য একাধারে চণ্ডনীতি ও অন্যদিকে ইহাদিগকে শান্ত ও সুবোধ নাগরিকে পরিণত করার জন্য রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, শিক্ষাপ্রচার ও সামাজিক সংস্কার নীতি অবলম্বন করিল। কিন্তু তাহাদিগকে স্ববশে আনার জন্য সকল রুদ্র ও শান্ত সকল উপায় ব্যর্থ হইল। বৃটিশের তোষণ নীতি তাহাদের মনঃপূত হইল না। ১৯১৯ সালে ওয়াজিরী বিদ্রোহ, মিস এলিস নামে একজন ইঙ্গ-মহিলা অপহরণ, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মাসুদ বিদ্রোহ, ১৯৩০-'৩১ খৃষ্টাব্দে মোমন্দ ও আফ্রিদী বিদ্রোহ, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মোমন্দ অভ্যুত্থান এবং ১৯৩৬-'৩৭ খৃষ্টাব্দের টোরী খেল বিদ্রোহ ইত্যাদি কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্টকে সীমান্তপারের উপজাতিদের বিরুদ্ধে বহুবার বিপুল সামরিক অভিযান করিতে হইয়াছে, এমন কি বিমানের সাহায্যে বোমা নিক্ষেপ করিয়া ইহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। অধিকন্তু ভারতবর্ষের বৃটিশ বিরোধী জাতীয় ভাবধারার দ্বারা ইহারা যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়া পড়ে। সীমান্তের কংগ্রেসী নেতা আবদুল গফুর খান ও তাহার খোদাই খিদ্‌মেদগার দল উপজাতি পাঠানদের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করে।

(খ) **আফগানিস্থান**ঃ—কার্জ্জনের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত-নীতির সঙ্গে আফগানিস্থান সম্পর্কীত নীতি অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। আফগানিস্থানের সঙ্গে বৃটিশের মৈত্রী বজায় থাকিলে উপজাতি অঞ্চলের শান্তি সহজেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইহার অভাব হইলেই কাবুলের পরোক্ষ হস্ত দ্বারা উপজাতিদের অশান্তি আরম্ভ হয়। আবদুর রহমান যতদিন আমীর ছিলেন ততদিন তিনি

বৃটিশের সখ্যতা বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন এবং উপজাতিদের বৃটিশ-বিরোধী 'জেহাদ' যে ভ্রান্ত তাহা বুঝাইয়া উপজাতিদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত রাখেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর পুত্র হবিবুল্লা নির্ব্বিবাদে আমীর হন। লর্ড কার্জ্জন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আবদুর রহমানের সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যে মৈত্রী-সন্ধি হয় তাহা পুত্র হবিবুল্লার সঙ্গে নূতন করিয়া করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু হবিবুল্লা উক্ত সন্ধি নূতন করিয়া করার মধ্যে কোন অভিসন্ধি আছে মনে করিয়া এই যুক্তিতে তাহাতে অসম্মত হন যে উপরোক্ত সন্ধি মোটেই ব্যক্তিগত ছিল না, দুইটি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ; সুতরাং পূর্ব্ব সন্ধি মোটেই বাতিল হয় নাই। ইহাতে উভয় দেশের মধ্যে কিছুকাল মনোমালিন্য চলে। হবিবুল্লা ইংরেজের নিকট হইতে বার্ষিক প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করা বন্ধ করেন এবং স্বয়ং 'হিজ ম্যাজেষ্টি' পদবী গ্রহণ করেন। লর্ড কার্জ্জন এশিয়া খণ্ডে রাশিয়ার বৃটিশ-বিরোধী কর্ম্মতৎপরতার জন্যই আফগানিস্থানের সঙ্গে নূতন বন্দোবস্ত করার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের সাময়িক অনুপস্থিতির সময়ে অস্থায়ী বড়লাট লর্ড এ্যাম্পট্হিল কাবুলে এক 'মিশন' প্রেরণ করেন। এই মিশনের চেষ্টার ফলে আবদুর রহমানের সঙ্গে হবিবুল্লার সম্পাদিত পূর্ব্বোক্ত চুক্তির সর্ত্ত সমূহ ইংরেজ কর্ত্তৃক পুনরায় স্বীকৃত হয়। ইংরেজ হবিবুল্লার 'হিজ ম্যাজেষ্টি' পদবী স্বীকার করে।

তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ ঃ—আফগানিস্থানের সঙ্গে ইংরেজের দীর্ঘকাল মৈত্রী বজায় থাকে। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময়ে আমীর হবিবুল্লা নিরপেক্ষ থাকিয়া মিত্রশক্তির যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে হবিবুল্লা নিহত হইলে পর তাহার পুত্র আমানুল্লা আমীর হন। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য আমানুল্লা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু বৃটিশ শক্তির বিমান, বেতারযন্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহারের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই আফগান বাহিনী পরাজয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধ বিরতি প্রার্থনা করে। উভয় পক্ষের

মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিদ্বারা (১৯১৯) স্থির হয় যে অতঃপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের পর-রাষ্ট্র নীতি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না এবং আফগানিস্থানও বৃটিশ এলাকার মধ্য দিয়া স্বদেশে অস্ত্রাদি আমদানী করিতে পারিবে না। বৃটিশ প্রদত্ত আমীরের বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

আফগানের পরবর্ত্তী ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। আমানুল্লার বিবিধ সংস্কার কার্য্যের ফলে গোঁড়া আফগানীরা অসন্তুষ্ট হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আমানুল্লা সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন—বচ্চা-ই-সেকো নামে এক ভাগ্যান্বেষী স্বল্পকালের জন্য আমীর হন। অতঃপর আমানুল্লার জনৈক রাজকর্ম্মচারী নাদির নাদির শাহ বাচ্চা-ই-সেকো-কে পরাজিত ও নিহত করিয়া আমীর বলিয়া ঘোষিত হন। নাদির্ শাহ ইংরেজ কর্তৃক স্বীকৃত হন্। ১৯৩৩ সালে নাদির শাহ আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে তাহার পুত্র মহম্মদ জাহির কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই গৃহ বিপ্লবের সময়ে ইংরেজ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিল। গৃহ-বিবাদের অবসানে তাহারা কৃতকার্য্য ব্যক্তিকে আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

(গ) পারস্য ঃ—মধ্য প্রাচ্যে বিশেষতঃ পারস্য উপসাগর অঞ্চলে ইংরেজের বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ ছিল। পারস্যের তৈলখনির উপর বৃটিশের একচেটিয়া অধিকার থাকায় তাহারা পারস্য উপসাগরে অন্য কোন জাতির অনুপ্রবেশ সন্দেহের চক্ষে দেখিত। উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির যুগে ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্ম্মাণী ও তুরস্ক পারস্যে প্রভাব বিস্তার করিবার প্রচেষ্টা করিলে ইংরেজ শঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং ইহার প্রতিবিধানের জন্য যত্নবান হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন স্বয়ং পারস্য উপসাগরে গমন করিয়া বৃটিশ-বিরোধী শক্তি নিবারণ করার জন্য চেষ্টা করেন। পারস্যের উপকূল অঞ্চলে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত ও পোষ্টাল সার্ভিস-এর সুবন্দোবস্ত হয়। এইভাবে পারস্যে বৃটিশের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়।

অতঃপর পারস্যের আভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসম্বাদের সুযোগে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে

ইংলণ্ড ও রাশিয়া সম্মিলিতভাবে এক চুক্তিদ্বারা পারস্যকে উভয় রাষ্ট্রের প্রভাবাধীন দুইটি এলাকায় বিভক্ত করে; উত্তরাঞ্চলে রাশিয়ার ও দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে ইংলণ্ডের প্রভাব থাকিবে বলিয়া স্থির হয়। অবশ্য উভয় রাষ্ট্রই পারস্যের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। উপরোক্ত বাঁটোয়ারা সন্ধির ব্যাপারে পারস্যের মতামত না নেওয়ায় পারস্য ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু দুর্ব্বল বলিয়া তাহার করণীয় কিছুই ছিল না। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়ে পারস্য নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিলেও তুরস্ক ও জার্ম্মাণী মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে পারস্যকে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ করাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। ইংলণ্ডের চেষ্টায় পারস্য উপসাগরে মিত্র শক্তির আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

পরবর্ত্তী ইতিহাস

(ঘ) **তিব্বত**—লর্ড কার্জ্জনের সময়ে তিব্বতের সঙ্গে বৃটিশের সম্পর্ক একটুখানি তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিব্বত সুদীর্ঘকাল যাবৎ চীনের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছিল, যদিও প্রকারান্তরে দলাই লামা ও তাসি লামা-দ্বয়ের শাসনাধীনে তিব্বত স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। তিব্বতীগণ সময়ে সময়ে বৃটিশ রাজ্য আক্রমণ করিয়া উৎপাত করিত, বৃটিশের চেষ্টায় তাহাদের উপদ্রব নিবারণ করা হইত।

কার্জ্জনের সময়ে তিব্বতের প্রধান শাসনকর্ত্তা দলাই লামা ডোরজিয়েফ নামে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এক রাশিয়ান শিক্ষকের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া চীনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাশিয়ার বন্ধুত্বকামী হন। তিব্বতে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিহত করার জন্য কার্জ্জন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ইয়ং হাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে তিব্বতে এক সশস্ত্র মিশন প্রেরণ করেন। এই মিশন বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লাসা-য় উপস্থিত হয়। তিব্বতের সঙ্গে এক চুক্তির বলে ইংরেজ ভারত-তিব্বত সন্নিহিত কয়েকটি স্থানে বাণিজ্য-কেন্দ্র খুলিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। চীনদেশের সঙ্গে অপর এক চুক্তি অনুযায়ী ইংলণ্ড উক্ত বাণিজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের টেলিগ্রাফ দ্বারা

যোগাযোগ রাখার অধিকার প্রাপ্ত হয়। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কার্জ্জনের এই তিব্বত অভিযানের দ্বারা কোন রাজনৈতিক লাভ হয় নাই, তিব্বতের মধ্যে তিনটি বাণিজ্যকেন্দ্র খোলার সুবিধা পাওয়া গেল মাত্র।

রাশিয়ায় বলশেভিক আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পর তিব্বতে রাশিয়ার প্রতিপত্তি কমিয়া যায় এবং ইংলণ্ড ও তিব্বতের মধ্যে পুনরায় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে একজন সিভিল সার্ভিস-এর কর্ম্মচারীর নেতৃত্বে এক শুভেচ্ছা মিশন তিব্বতে প্রেরিত হয়। উভয় দেশের মধ্যে সুদীর্ঘকালের মৈত্রী পুনরায় সংস্থাপিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

শাসনতান্ত্রিক ক্রম-বিকাশ, (১৮৫৮—১৯৩৭)

[১] শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন, ১৮৫৮—১৯০৫

(ক) সম্রাট ও ভারত সচিব

Secretary of State for India

সিপাহী যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষের শাসনভার কোম্পানীর হস্ত হইতে পার্লামেন্টের হস্তে স্থানান্তরিত করা হইল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লর্ড ডার্বির নেতৃত্বে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক এক আইন বিধিবদ্ধ হইল। পূর্ব্বে ডিরেক্টারগণ এবং বোর্ড অফ কণ্ট্রোল যৌথভাবে যে ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন তাহা তাহাদের হস্ত হইতে স্থানান্তরিত করিয়া ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার একজন মন্ত্রীকে প্রদত্ত হইল। এই মন্ত্রী ভারত-সচিব (Secretary of State for India) নামে পরিচিত হইলেন। ভারত সচিবকে ভারত শাসন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য ভারত বিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন ব্যক্তি লইয়া একটি পরিষদ বা কাউন্সিল সৃষ্ট হইল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সচিবের হস্তে ভারত বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হইল। তাহার পরিষদের সভ্যগণ মাত্র দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন এবং ভারত সচিবের ইচ্ছানুসারে তাহারা পুনঃ-নির্ব্বাচিত হইবেন। ভারত সচিব যে কোন বিষয়ে কাউন্সিলের মতামত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। ভারত সচিব ভারতের বড়লাটের কাউন্সিলের সাধারণ সভ্য মনোনয়ন করিতেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের আর্থিক ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিতেন এবং ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে বড়লাটকে পরামর্শ দিতেন। ভারত সচিব তাহার অনুসৃত ভারত-নীতির জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী হইলেন বলিয়া

কালক্রমে ভারত সচিব ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের বড়লাট .ভারত সচিব-এর নামমাত্র প্রতিনিধি হইয়া রহিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে তারবার্ত্তার প্রত্যক্ষ যোগ হইলে ভারত সচিবের ক্ষমতা আরও সক্রিয় হইয়া উঠিল। উল্লেখযোগ্য যে কোন বিষয়েই বড়লাট ভারত সচিব-এর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য হইল। ভারত সচিবের হস্তে ভারতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা শাসন ব্যবস্থা উন্নত হইল। পূর্ব্বে কোর্ট অফ ডিরেক্টার ও বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের যে দ্বৈধ শাসন ব্যবস্থা ছিল তাহা দূরীভূত হওয়ায় শাসন পদ্ধতি অধিক কর্ম্মঠ ও সক্রিয় হইল।

(খ) ভারত গভর্ণমেণ্ট

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন (Indian Councils Act, 1861.) :—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সনন্দ দ্বারা ভারতবর্ষে আইন প্রণয়নের যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল তাহাতে দুইটি গুরুতর ত্রুটি ছিল। প্রথমতঃ, কোন ভারতবাসীকে আইন পরিষদের সদস্য না করায় ভারতবাসীর মনোভাব সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করার অসুবিধা ছিল। দ্বিতীয়তঃ মান্দ্রজ, বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ন হইতে বঞ্চিত থাকায় ঐ সকল প্রদেশের শাসন কার্য্যে অসুবিধা হইত। আইন পরিষদের অভিজ্ঞতা বঙ্গদেশের বাহিরের অঞ্চল সম্বন্ধে যথেষ্ট না থাকায় বাহিরের প্রদেশ সমূহের জন্য আইন প্রণয়নও যথোপযুক্ত হইল না। প্রথমোক্ত অসুবিধার বিষয় সিপাহী মিউটিনির সময়ে ইংরেজদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং স্যার সৈয়দ আহম্মদ ও এ বিষয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সকল ত্রুটি দূর করিবার জন্য ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়।

এই আইনের দ্বারা বড়লাটের কার্য্য পরিষদের সভ্য সংখ্যা চারিজন

হইতে পাঁচজন করা হয় এবং পূর্ব্ববৎ ভারতের প্রধান সেনাপতি ভারত সচিব কর্তৃক অতিরিক্ত সভ্য রূপে মনোনীত হন।

কার্য্য পরিশোধ

বড়লাটের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করা হয় এবং তিনি কার্য্য পরিষদের কার্য্যক্রম ও নিয়মাবলী নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার প্রাপ্ত হন। লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে 'পোর্টফোলিও বা দপ্তর পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি পরিষদের সভগণের প্রত্যেককে এক বা একাধিক বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব দপ্তরের সাধারণ কার্য্য নিজের দায়িত্বে সম্পন্ন করিবেন, কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বড়লাটের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন রহিল। পরিষদের নিকট কেবলমাত্র সাধারণ নীতি নির্দ্ধারক কার্য্যক্রম উপস্থাপিত করা হইল। ইহাতে বড়লাটের ক্ষমতা যেমন বর্দ্ধিত হইল তেমনি পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হইল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের এ্যাক্ট অনুযায়ী আইন প্রণয়নের বিধান সমূহ উল্লেখ-যোগ্য। ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যের জন্য আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বড়লাটের পরিষদে ছয়জনের অধিক নহে এবং

আইন সভা

দ্বাদশ জনের অনধিক অতিরিক্ত সভ্য গ্রহণ করা হইল। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক বে-সরকারী লোক হইতে হইবে। শেষোক্ত সভাবৃন্দ বড়লাট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। আইন পরিষদের ক্ষমতা সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল। আইন প্রণয়ন সম্বন্ধেও আইন পরিষদের অধিকার সর্ত্তসাপেক্ষ রহিল। প্রথমতঃ, সরকারী ঋণ, ধর্ম্ম, সামরিক শৃঙ্খলা, দেশীয় রাজ্যনীতি ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে আইন প্রণয়নের পূর্ব্বে বড়লাটের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এমন কোন আইন প্রণীত হইতে পারিবে না যাহাতে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বা পার্লামেন্টে গৃহীত কোন আইন লঙ্ঘিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, বড়লাট যে কোন আইন তাহার 'ভেটো' ক্ষমতা দ্বারা নাকচ করিতে পারিবেন, বা প্রয়োজনে কাউন্সিল দ্বারা

নূতন আইন কার্য্যকরী করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত কাউন্সিল প্রণীত যে কোন আইন পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক বাতিল হইতে পারিবে।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহের সুবিধার জন্য বোম্বাই ও মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। উপরোক্ত প্রদেশদ্বয়ে আইন পরিষদ গঠিত হইল। প্রাদেশিক গভর্ণর তাহার কাউন্সিলের সভ্যগণ, এডভোকেট জেনারেল এবং গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত কয়েকজন অতিরিক্ত সভ্য (৪ জনের কম নয়, ৮ জনের অধিক নয়) দ্বারা এই সভা গঠিত হইল। অতিরিক্ত সভ্যগণের সংখ্যা অর্দ্ধেকের কম থাকিত। অর্থনৈতিক বা শাসন সম্বন্ধীয় কোন বিষয় আলোচনা করিবার অধিকার এই সভার রহিল না ; কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে গভর্ণরকে পরামর্শ দেওয়াই ইহার কর্ত্তব্য হইল। প্রত্যেক প্রাদেশিক আইন-সভা কেবলমাত্র সেই প্রদেশের প্রতি প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী হইল।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আইন বড়লাটকে ভারতের অবশিষ্ট প্রদেশ সমূহের জন্য আইন-সভা গঠনের নির্দ্দেশ দিয়াছিল। উক্ত নির্দ্দেশের দ্বারা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (পরবর্ত্তী কালে যুক্ত প্রদেশ) এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে প্রাদেশিক আইন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের কাউন্সিল আইন বহুবিধ ব্যাপারে নৈরাশ্যজনক বলা যাইতে পারে। ইহাতে আইন সভার হস্তে মোটেই যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হয় নাই—কার্য্য-পরিষদকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করা হইয়াছে। আইন সভার ক্ষমতা বহুবিধ উপায়ে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এই ত্রুটি সত্ত্বেও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আইনকে পরবর্ত্তীকালের আইন সমূহের পথনির্দ্দেশক বলা যাইতে পারে। ভবিষ্যতের আইন সমূহ এই আইনের দ্বারা রচিত কাঠামোর উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতবাসীকে শাসনকার্য্যে অধিকার প্রদান এই প্রথম আরম্ভ হইল। ক্যানিং পাতিয়ালার মহারাজ, বারাণসীর রাজা ও স্যার দিনকর রাওকে নবগঠিত আইন পরিষদের সভ্য নিযুক্ত করিলেন।

ভারতীয় কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট, ১৮৭০ :—এই আইনে বড়লাটের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল। আইন পরিষদের অগোচরে সপারিষদ বড়লাটকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত বড়লাটকে কার্য্য-পরিষদের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া ভারত সাম্রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যে কোন আইন প্রণয়ন, বাতিল, অথবা স্থগিত রাখার অধিকার প্রদত্ত হইল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী বড়লাটের পরিষদে পূর্ত্তবিভাগের জন্য ষষ্ঠতম সভ্য গ্রহণ করা হইল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন (Indian Council Act, 1892) :—১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পর ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবাসীর মধ্যে রাজনীতিক চেতনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতে কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় শাসন ব্যাপারে অধিকতর অধিকার দাবি করিতে লাগিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আইন দ্বারা আইন-সভাকে যে অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। অর্থনৈতিক ব্যাপারে এবং শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার না থাকিলে আইন সভা দেশের যথার্থ প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, মনোনীত সদস্যদের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাচন দ্বারা গৃহীত সদস্য না থাকিলে আইনসভা প্রতিনিধিমূলক হয় না। সুতরাং আইন সভার বাজেট আলোচনার অধিকার, নির্ব্বাচনের দ্বারা সদস্য গ্রহণ এই দুই দাবি দেশবাসীর পক্ষ হইতে বারংবার গভর্ণমেণ্টের সমীপে উপস্থাপিত হইতে লাগিল। এই দুইটি বিষয়ে ভারতবাসীগণের দাবি কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিবার জন্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়।

এই আইন দ্বারা ভারতীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। ইতিপূর্ব্বে আইন সভার সকল সভ্যই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। মনোনয়নের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাচনের দাবী কংগ্রেসের তরফ হইতে

ক্রমাগত উত্থিত হওয়ায় এই আইনের মধ্যে পরোক্ষ নির্ব্বাচন পদ্ধতি অনুমোদন করা হইল। অতএব বড়লাটের কার্য্যকরী পরিষদের সরকারী সভ্যগণ ব্যতীত আইন সভার বে-সরকারী সকল সভ্যই মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিকবোর্ড, চেম্বার অফ্ কমার্স, বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল। অধিকন্তু চারিটি প্রাদেশিক আইন সভার বে-সরকারী সভ্যগণ কর্ত্তৃক মনোনীত চারিজন সভ্য ভারতীয় আইন-সভায় গ্রহণ করা হইল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আইনে আইন সভার সভ্যগণকে বাজেট আলোচনার অধিকার প্রদত্ত হইল। তাহারা জনস্বার্থ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে প্রশ্ন করার অধিকারও প্রাপ্ত হইলেন।

এই আইনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দাবি সমূহ সম্পূর্ণ পূরণ না করিলেও ইহা পূর্ব্ব ব্যবস্থা অপেক্ষা বহুলাংশে উন্নত হইল। প্রত্যক্ষ না হইলেও নির্ব্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন এবং শাসন ব্যবস্থার উপর আইন সভার যৎকিঞ্চিৎ অধিকার ইহার দুইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

[২] শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন, ১৯০৫-'৩৭

১। মর্লে-মিণ্টো সংস্কার, ১৯০৯।
২। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার, ১৯১৯,
(ভারত শাসন আইন, ১৯১৯)।
৩। ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫।

(ক) সম্রাট ও ভারত সচিব

ভারত শাসন ব্যাপারে ভারত সচিবের ক্ষমতা এইরূপ সর্ব্বগ্রাসী হইয়া পড়িল যে লর্ড কার্জ্জনের মত প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বড়লাটকে পর্য্যন্ত ভারত সচিবের মতের নিকট অবনতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। অথচ

বড়লাট ভারতবর্ষে অবস্থান করেন বলিয়া স্থানীয় শাসন ব্যাপারে তাঁহার মতামতই চূড়ান্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পার্লামেণ্ট কোন মতেই ভারতের উপর তাহার মুষ্টি শিথিল করিতে প্রস্তুত ছিল না এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইলেও ভারত সচিবের ক্ষমতা প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষত অব্যাহত রহিয়াছে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভারত সচিবের কাউন্সিলে কোন ভারতীয় সভ্য নিয়োগ করা হয় নাই। এই বিষয়ে কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা না থাকিলেও ভারতবাসীগণকে এতটা সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত যে তাহাদিগকে উক্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করা নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইত না। ভারত সচিব লর্ড মর্লে এবং বড়লাট মিণ্টো এই অনুদার নীতি পরিত্যাগ করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে দুইজন ভারতবাসী সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী ও স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত-কে ভারত সচিবের কাউন্সিলে গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের জনমত ভারত সচিবের কাউন্সিল তুলিয়া দিবার সপক্ষে দাবি করিতে থাকে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে একটি পার্লামেণ্টারী কমিটিও (ভূপেন্দ্রনাথ বসু ইহার অন্যতম সভ্য ছিলেন) ভারত সচিবের কাউন্সিল বিলোপের জন্য মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইনেও উক্ত কাউন্সিল বিলুপ্ত হইল না—উহার সভ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল মাত্র। এই কাউন্সিলের মতামত কয়েকটি অপ্রধান ব্যাপারে ভারত সচিবের গ্রহণযোগ্য করা হইল। কিন্তু সাম্রাজ্য বা সামরিক বিষয়ে, পররাষ্ট্র নীতিতে, ভারতস্থিত বৃটিশ প্রজার স্বার্থে, এবং আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারত সচিবের স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা রহিল। শুদ্ধ কয়েকটি 'হস্তান্তরিত' বিষয়ে ভারত সচিবের কোন হাত রহিল না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ভারত সচিবের মাহিনা ও তাহার দপ্তরের যাবতীয় ব্যয় পূর্ব্ব রীতি অনুযায়ী ভারতের রাজকোষ হইতে না হইয়া ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনতন্ত্রে ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক

সরকারের হাতে অনেক ক্ষমতা প্রদান করার জন্য ভারত সচিবের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়। ভারত সচিবের কাউন্সিল (ইণ্ডিয়া কাউন্সিল) উঠিয়া যায় এবং কাউন্সিলের হস্তে ভারত সচিবের কয়েকজন পরামর্শদাতা নিযুক্ত হওয়ার বন্দোবস্ত হয়। ভারত সচিব ইহাদের মতামত আইনতঃ গ্রাহ্য করিতে বাধ্য ছিলেন না—কেবল 'নিখিল ভারতীয় কর্ম্মচারী' নিয়োগ বিষয়ক উপবিধান প্রণয়নে ও ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগীয় কর্ম্মচারী সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা করার ব্যাপারে সভায় উপস্থিত সভ্যদের অন্ততঃ অর্দ্ধেকের মতানুযায়ী কার্য্য করিতে হইল।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনে ভারত-সচিবের ক্ষমতা অনেকটা কমিয়া গেলেও কয়েকটি বিষয় ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার কর্তৃত্বাধীনে না রাখিয়া সম্রাটের হস্তে রাখায় কার্য্যতঃ ভারত সচিবই তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। ভারতবর্ষের বৈদেশিক (External Affairs) ও যাজক (Ecclesasitical বিভাগগুলি ভারতের বড়লাট তথা ভারত-সচিবই নিয়ন্ত্রিত করিতেন। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় বড়লাট ও গভর্ণরদের কয়েকটি বিষয়ে 'বিবেচনামূলক সম্মতি'র (Discretionary powers) প্রয়োজন ছিল। বড়লাটও যুক্ত-রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নিজ বিবেচনামত কার্য্য করার অধিকার ভারত-সচিবের সম্মতি সাপেক্ষে প্রয়োগ করিতে পারিতেন। সুতরাং কার্য্যতঃ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনেও সম্রাটও ভারত সচিবের ভারতের শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ-অধিকার অব্যাহত রহিল।

ভারত সচিবের কার্য্যভার লাঘব করার জন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইনে ভারতীয় হাই-কমিশনার নামে এক পদের সৃষ্টি হইল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনেও হাই-কমিশনারের পদ অব্যাহত রাখা হইল। হাই-কমিশনারের পদ অব্যাহত রাখা হইল। হাই-কমিশনারের রাষ্ট্রনৈতিক কোন কার্য্যের অধিকার ছিল না। তাহাকে ভারতবর্ষের স্বার্থসম্পকিত ব্যবসা সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ, ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করা, ভারত সরকারের

পক্ষ হইতে বিদেশের মালপত্র ক্রয় করা প্রভৃতি কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতে হইত। হাই-কমিশনারের ও তাহার দপ্তর সংক্রান্ত ব্যয় ভারত সরকারের তহবিল হইতে বহন করিতে হইল।

(খ) ভারত গভর্ণমেণ্ট

লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে বঙ্গ-বিভাগ রদ করা উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই জাতীয় মহাসভা শাসক ও শাসিতের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারের বৈষম্য বিলোপ ও স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি করিয়া আসিতেছিল। ১৮৬১ ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আইন সমূহে কার্য্যতঃ জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হস্তে শাসন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পর জাতীয় আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। শাসন কার্য্যে ভারতবাসীদের কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান না করিলে সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না বিবেচনা করিয়া তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টো এবং ভারত সচিব মিঃ মর্লে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের শাসন ও ব্যবস্থা- পরিষদের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। শাসনতন্ত্রের এই সংস্কার 'মর্লে মিণ্টো সংস্কার' নামে পরিচিত।

মর্লে মিণ্টো সংস্কার, ১৯০৯

নূতন ব্যবস্থার ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভার এবং বড়লাট ও প্রাদেশিক গভর্ণরদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার (Executive ouncil) সংস্কার সাধিত হয়। কেন্দ্রীয় আইন সভার বে-সরকারী সভ্য সংখ্যা প্রায় চারিগুণ এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলির সভ্য সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। ভারতবাসীদিগকে শাসন-কার্য্যে সহযোগিতা করিবার সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত গভর্ণর জেনারেল ও কয়েকজন গভর্ণরের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদে এক একজন ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করা হয়। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) কেন্দ্রীয় শাসন-

পরিষদের এবং রাজা কিশোরী লাল গোস্বামী বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের সভ্য নিযুক্ত হইলেন। বাংলা এবং অন্যান্য কতিপয় বৃহৎ প্রদেশের গভর্ণরের শাসন পরিষদের সভ্য সংখ্যাও বর্দ্ধিত করা হয়।

এই সংস্কারে ভারতে দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আইন-পরিষদের সভ্যদিগকে বাজেট আলোচনা করিবার অধিকার দেওয়া হইলেও মূল বাজেট অথবা তাহার কোন বিশেষ অংশ সম্বন্ধে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা একেবারে দেওয়া হয় নাই। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃপক্ষগণ পূর্ব্বের ন্যায় জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মতামত উপেক্ষা করার অধিকারী রহিলেন। অধিকন্তু ভারতীয় জনমতকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা গৃহীত হয়। এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের বিষময় ফল পরিণামে ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনকে বিষাক্ত করিয়া ভারত-উপমহাদেশের দ্বিধা-বিভাগে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ভারতসচিবের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ভারতীয় নিয়োগের দ্বারা ভারতীয়দের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইলেও শাসনতন্ত্রের কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। ব্যবস্থা পরিষদে বে-সরকারী সদস্যবৃন্দের হস্তে মাত্র শাসন কার্য্যের সমালোচনার অধিকার ছিল; কার্য্যকরীভাবে কোন সংস্কার প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা তাহাদের ছিল না; সুতরাং দেশের শাসন ব্যাপারে আপনাদের অধিকারের অভাবই তাহারা বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। কাজেই মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের পরেও ভারতে বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাইয়াই চলিল।

মর্লে মিণ্টো সংস্কারের দ্বারা ভারতবাসীর প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনের পথ উন্মুক্ত করিবার কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় ভারতবর্ষ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

মণ্টেগু চেমস ফোর্ড সংস্কার, ১৯১৯

১৯১৪ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপে প্রথম বিশ্বমহাসমর চলিয়াছিল। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ সৈন্য এবংঅর্থদ্বারা ইংলণ্ডকে সাহায্য করিয়াছিল। এই সমরকালে ভারতবাসীর আত্মত্যাগ এবং স্বায়ত্তশাসনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার

কথা মনে করিয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু পার্লামেণ্টের পক্ষ হইতে ঘোষণা করেন যে, "শাসনের প্রতি বিভাগে ভারতীয়দের ক্রম বর্দ্ধমান সংযোগ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম অংশরূপে ভারতের ক্রমিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভই সম্রাটের মন্ত্রিমণ্ডলীর নীতি।" ঐ বৎসরই মিঃ মণ্টেগু ভারতে আসিয়া বড়লাট লর্ড চেমস ফোর্ডের সহযোগিতায় এক রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। পরে এই রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট নূতন ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই নূতন শাসন-তন্ত্র অনুসারে নির্ব্বাচন হয় এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের পিতৃব্য ডিউক অফ কনট ভারতের এই নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে এই আইনের অধিকাংশ বিধান ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল, কারণ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় নাই।

ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন কার্য্যের ভার বড়লাট ও প্রধান সেনাপতিসহ এক কার্য্য-নির্ব্বাহক পরিষদের হাতে রাখা হয়। আইনে অবশ্য কার্য্য পরিষদের সভ্য সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগ বড়লাটের শাসনাধীনে রহিল। এই কার্য্য পরিষদ ও ইহার সভ্যগণ বড়লাট ও ভারত-সচিবের নিকট দায়ী রহিলেন। আইনে বিধান না থাকিলেও ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর কার্য্য-নির্ব্বাহক পরিষদের অন্ততঃ তিনজন সভ্য ভারতবাসীদের মধ্য হইতে গ্রহণ করা হইত। স্যার আলি ইমাম আইন-সদস্য রূপে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের স্থলাভিষিক্ত হইলেন এবং স্যার শঙ্করণ নায়ারকে শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভ্য নিযুক্ত করা হইল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে আইন সদস্যের পদে একজন উপযুক্ত ভারতবাসীই থাকিত, কিন্তু অর্থ-সদস্যের পদ সর্ব্বদা একজন ইংরেজ দ্বারাই অলঙ্কৃত।

কেন্দ্রীয় আইন সভা রাষ্ট্র-পরিষদ (Council of State) ও আইন

পরিষদ (Legislative Assembly) নামে দুইটি কক্ষে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিষদ বা কেন্দ্রীয় আইন-সভা বড়লাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য বা কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিত না। উভয় পরিষদের নির্ব্বাচনেই 'সম্প্রদায়' হিসাবে আসন বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল এবং ভোটাধিকারও সীমাবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্র-পরিষদ পাঁচ বৎসরের এবং আইনপরিষদ তিন বৎসরের আয়ুষ্কালবিশিষ্ট ছিল। সকল আইনের প্রস্তাবই উভয় পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করার রীতি ছিল এবং বাজেট সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা ছিল। পরিষদ দুইটির মধ্যে আইনের প্রস্তাব সম্বন্ধে মতানৈক্য ঘটিলে বড়লাট কর্তৃক যুক্ত-পরিষদ আহ্বানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ ঐরূপ পরিষদ কখনও আহূত হয় নাই।

নূতন বিধি অনুযায়ী প্রাদেশিক শাসন-কার্য্য সংরক্ষিত (Reserved) ও হস্তান্তরিত (Transferred) এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। এই জন্য এই শাসন প্রণালী দ্বৈত-শাসন বা Diarchy নামে পরিচিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, কৃষি, আবগারী, শিল্প প্রভৃতি কতিপয় বিভাগের শাসন আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদের অধীনে 'হস্তান্তরিত' হয়। পুলিশ, জেল, অর্থ, রাজস্ব, বিচার প্রভৃতি কতিপয় বিভাগ গভর্ণর ও বড়লাটের নিকট দায়ী কার্য্য নির্ব্বাহক বিভাগের সদস্যদের হস্তে 'সংরক্ষিত' ছিল। সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এই উভয় বিভাগের উপর গভর্ণরের অবাধ কর্তৃত্ব ছিল। প্রাদেশিক পরিষদ সমূহে পূর্ব্বাপেক্ষা বে-সরকারী নির্ব্বাচিত সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং ইহা-দিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বাজেট-সম্বন্ধে প্রাদেশিক পরিষদগুলির শুধু সমালোচনার অধিকার ছিল; কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় ভোটের অধিকার দেওয়া হইল।

"Diarchy"

ইহা সুনিশ্চিত যে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কারে ভারতবাসীগণকে মাত্র সামান্য সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রকৃত শাসনাধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় সমূহ 'সংরক্ষিত' রাখিয়া কয়েকটি সাধারণ বিষয়ের ভার দেশীয় লোকের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা মোটেই গণতন্ত্রানুমোদিত হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থাকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সোপান বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় সর্ব্বপ্রথম প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন স্বীকৃত হইল। দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসী এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-পরিচালনায় হাতে-কলমে শিক্ষার সুযোগ ও জনমত দ্বারা গভর্ণমেণ্টের নীতি প্রভাবিত করার সুযোগ পাইল। এই ব্যবস্থায় ইহাও নির্দ্দিষ্ট করা ছিল যে দশ বৎসর নূতন শাসনতন্ত্র চালু থাকিবার পর পুনরায় দায়িত্বশাল শাসন বিধি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে কিনা তজ্জন্য পার্লামেণ্ট একটি উপযুক্ত তদন্ত-কমিশন নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন :—১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন ভারতবাসীর জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে অসমর্থ হওয়ায় নূতন শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস নূতন শাসনতন্ত্রের সঙ্গে 'নন্‌-কো-অপারেশান' আরম্ভ করিল। মডারেটপন্থী কয়েকজন ইহার সঙ্গে সহযোগিতা করিল, কিন্তু ইহা দেশবাসীর সমর্থন প্রাপ্ত হইল না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল নূতন-সংস্কারকে অসার প্রতিপন্ন করিয়া আইন সভায় প্রবেশ করিয়া দ্বৈতশাসনের ব্যর্থতা প্রমাণিত করিল। কংগ্রেসের পরিচালনায় দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে 'মুডিম্যান কমিটি' নিযুক্ত হইয়া নূতন-সংস্কারেব দোষগুণ সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রদান করিল ; কিন্তু এই কমিটির অনুমোদন সমূহ কার্য্যকরী করার কোন প্রচেষ্টা হইল না। ভারতবাসীর আন্দোলনের ক্রম-প্রসার ও তীব্রতা উপলব্ধি করিয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী বলডুইন স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক রাজকীয় কমিশন সংস্কার-বিষয়ক তদন্তের জন্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। এই কমিশনের সাতজন সভ্যের মধ্যে একজনও ভারতবাসী না

থাকায় কংগ্রেস এই কমিশন বর্জ্জন করিল এবং বোম্বাইতে এই কমিশনের অবতরণ দিবস (৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮) সমগ্র ভারতব্যাপী 'হরতাল' অনুষ্ঠিত হইল। অধিকন্তু কোন জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার অপর জাতির তদন্ত ও সুপারিশ সাপেক্ষ হওয়া সেই জাতির পক্ষে অপমানজনক বলিয়া ভারত-বাসিগণ মনে করিল। ফলে কমিশন ভারতীয় জন-নায়কদের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইল। ভারতবর্ষের জনমতের তীব্রতা উপলব্ধি করিয়া স্যার জন সাইমন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড-কে (ইতিমধ্যে ম্যাকডোনল্ডের প্রধানমন্ত্রীত্বে শ্রমিক-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল) সাইমন-কমিশন-রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরে ভারতীয় জন-প্রতিনিধিগণকে বিলাতে এক সভায় আলাপ-আলোচনার জন্য নিমন্ত্রণ করিবার অনুরোধ জানান। তদনুযায়ী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে বৃটিশ ও ভারতীয় রাজনীতি এবং সামন্ত নৃপতিদের লইয়া প্রথম গোলটেবিল বৈঠক হয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক-শাসনতন্ত্র (Dominion Status) গঠনই এই বৈঠকের কার্য্য হইবে কিনা এমন কোন আশ্বাস না পাওয়ায় কংগ্রেস ইহা বর্জ্জন করিয়া গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে। ইহার অল্পকাল পরেই কংগ্রেসের সহিত আপোষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে বড়লাট লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এক চুক্তি করেন (গান্ধী-আরউইন চুক্তি, ১৯৩১)। এই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেসের তরফ হইতে একক মহাত্মাজী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। কিন্তু তখনকার বিলাতী মন্ত্রীমণ্ডলে রক্ষণশীল দলের প্রাধান্য থাকায় বৃটিশ সরকারের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং মহাত্মাকে রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

উপর্য্যুপরি দুইটি গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সমস্যা হয় না দেখিয়া প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড তাহার 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার'র (Communal Award) সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করেন। এই ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়া তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক

সরকার মনোনীত স্বল্প সংখ্যক প্রতিনিধির মধ্যে শাসন সংস্কারের যে আলোচনা হয় তাহারই ফলে বৃটিশ-ভারতীয় এবং সামন্ত রাজ্য সমূহের সমন্বয়ে বৃটিশ-সরকার কর্তৃক এক সংযুক্ত রাষ্ট্রের (Federation) পরিকল্পনা ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের 'হোয়াইট পেপার'-দ্বারা সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশিত হয়। এই 'বাঁটোয়ারা' সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে ভয়ানক অনিষ্ট হইতে পারে মনে করিয়া মহাত্মা গান্ধী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর পুণাতে উচ্চবর্ণের হিন্দু (Caste Hindu) ও অনুন্নত তপশীল বা হরিজন (Depressed বা Scheduled Caste) সম্প্রদায়ের মধ্যে এক আপোষ-মীমাংসা করেন। এই মীমাংসা "পুণাচুক্তি" (Poona Pact) নামে পরিচিত। ইহার ফলে কতকগুলি বিশেষ সর্ত্ত অনুযায়ী উচ্চ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুদের একত্রে ভোট দিবার ব্যবস্থা হয়।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে "সংযুক্ত-রাষ্ট্র" পরিকল্পনার সমালোচনার্থে বৃটিশ পার্লামেণ্ট হাউস অফ্ লর্ডস এবং হাউস অফ্ কমন্স উভয় সভা হইতে মনোনীত সদস্য লইয়া এক যুগ্ম-সমিতির (Joint Committee) অধিবেশন আরম্ভ হয়। লর্ড লিনলিথগো এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় সামন্ত রাজ্য এবং বৃটিশ ভারতের কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণান্তে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যুগ্ম-সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। ইহার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া পরবৎসর বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন আইন পাশ করা হয়।

১৯৩৫ খৃঃ-র আইনের বিধান সমূহ

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন এবং সমগ্র ভারতব্যাপী এক 'সংযুক্ত-রাষ্ট্রের' (Federal Government) বিধান হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশ ও এডেন ব্যতীত গভর্ণর-শাসিত ও চীফ-কমিশনার শাসিত বৃটিশ প্রদেশ সমূহ এবং সামন্ত-রাজ্য সমূহের সমন্বয়ে এই সম্মিলিত রাষ্ট্র-গঠনের পরিকল্পনা হইয়াছিল। বৃটিশের সহিত সামন্ত রাজ্য সমূহের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের সন্ধি হওয়ার জন্য সামন্ত রাজ্যগুলির

পক্ষে পরিকল্পিত 'যুক্ত-রাষ্ট্রে' যোগদানে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। এই জন্য ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনে ব্যবস্থা করা হইল যে, দেশীয় সামন্ত-রাজ্য সমূহ শাসন-সংক্রান্ত কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার "অঙ্গীকার-মূলক দলিল" (Instrument of Accession) লিখিয়া রাষ্ট্র সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে পারিবে। এইভাবে সামন্তরাজ কর্তৃক স্বীকৃত বিষয়গুলি সম্মিলিত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। অপরাপর বিষয় রাজন্যবর্গের নিজ অধিকারেই থাকিবে। এই বিষয়গুলির সঙ্গে সম্রাটের প্রতিনিধি-হিসাবে (Crown Representative) গভর্ণর-জেনারেলের সম্বন্ধ থাকিতে পারিবে।

প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের মূল কর্ত্তৃত্ব ছিল সম্রাটের। তাঁহার পক্ষ হইতে যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনি একজন গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করিবেন। স্বাধীন গণতন্ত্রে কর্ম্ম-বিভাগ দেশের প্রতিনিধি গঠিত আইন-সভার অধীনেই থাকে। কিন্তু প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে গভর্ণর-জেনারেলের দেশরক্ষা, যাজকীয় ব্যাপার, পররাষ্ট্রনীতি, আদিবাসী-অঞ্চল সম্বন্ধে নিজ বিবেচনামত কার্য্য করিবার ব্যবস্থা ছিল। তিনি নানাভাবে প্রায় আশী দফা কার্য্য স্বাধীনভাবে করিবার অধিকারী ছিলেন, মন্ত্রীগণ অথবা আইন-সভার সঙ্গে পরামর্শ করিবারও প্রয়োজন ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা সমগ্র বৃটিশ ভারতের যে কোন অঞ্চলের জন্য আইন প্রবর্ত্তন করিতে পারিত। কিন্তু এই বিষয়েও আইন-সভার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। বড়লাটের অনুমতি ব্যতীত কোন আইন বিধি প্রণয়ন করা যাইতে পারিত না। কতকগুলি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের অধিকার বড়লাটের হস্তেই ছিল, এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বড়লাটের "বিশেষ দায়িত্ব" সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বড়লাট আইন-সভা ব্যতিরেকেই আইন প্রণয়ন এবং "অর্ডিনান্স" জারি করিতে পারিতেন।

প্রাদেশিক শাসন পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। সিন্ধু

এবং উড়িষ্যা দুইটি প্রদেশ নবগঠিত হইল এবং সর্ব্বসমেত এগারোটি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশ ও ছয়টি চীফ-কমিশনার শাসিত প্রদেশ লইয়া নব যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত হইল। গভর্ণর শাসিত প্রদেশ সমূহে দ্বৈত-শাসনের স্থলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইল। প্রত্যেক প্রদেশে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে গভর্ণরের হস্তে কার্য্যকরী-ক্ষমতা ন্যস্ত হইল। গভর্ণর আইন-সভার সদস্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রীসভা নির্ব্বাচন করিবেন এবং এই মন্ত্রীসভার সাহায্যে সমস্ত বিভাগের কার্য্য করিবেন। প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দায়িত্ব ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে গভর্ণরের 'বিশেষ দায়িত্ব' ছিল এবং এই সকল 'বিশেষ দায়িত্ব' ব্যাপারে গভর্ণর স্বেচ্ছানুযায়ী করিতে পারিতেন। বড়লাটের মত গভর্ণর তাঁহার 'বিশেষ দায়িত্ব' পালনের জন্য প্রয়োজন মনে করিলে গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি লইয়া স্থায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেন। এই 'গভর্ণরের আইন'-এ আইন-সভার সম্মতি না থাকিলেও ইহা আইন সভা কর্ত্তৃক প্রণীত আইনের মতই কার্য্যকরী ছিল। কোন বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হইলে প্রয়োজনীয় অস্থায়ী আইন বা অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করা যাইত।

শাসতন্ত্রের সাধারণ বিধানমত প্রাদেশিক শাসন পরিচালনা অসম্ভব হইলে গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি লইয়া গভর্ণর ভারত-শাসন আইনের '৯৩ ধারা'-র সাহায্যে নিজ হস্তে প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন। ইত্যবস্থায় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন দ্বারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত অধিকার প্রদান করিলেও গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা যথেচ্ছভাবে থাকার জন্যই দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্টের লেশমাত্রও ইহার বিধানের দ্বারা সাধিত হইতে পারে নাই। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। উক্ত বৎসরের জুলাই মাসে কংগ্রেস অধিকাংশ প্রদেশে মন্ত্রিত্ব-ভার গ্রহণ করে এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কংগ্রেস উক্ত পদে আসীন থাকে।

(গ) দেশীয় রাজ্য

দেশীয়-রাজ্যসমূহের অবস্থিতির জন্যই ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়াছিল। দেশীয়-রাজ্যসমূহের উপর বৃটিশের সার্ব্বভৌম অধিকার বিভিন্ন সময়ে লর্ড কার্জ্জন, দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো এবং তৃতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক স্পষ্টই ঘোষণা করা হইয়াছে। অবশ্য প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়ে দেশীয় রাজগণের সাহায্য প্রয়োজনীয় হওয়ায় ইংরেজ দেশীয় নরপতি-বর্গকে সাম্রাজ্যের সহায়ক ও সহযোগী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল।

দেশীয়-রাজ্যসমূহের সহযোগিতা লাভের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দ্বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করিয়াছিল। প্রথমতঃ দেশীয় রাজ্য হইতে দেশীয় নরপতিদের ব্যয়ে এবং ইংরেজ সেনাপতি দ্বারা শিক্ষিত একটি ইম্পিরিয়েল-সার্ভিস ট্রুপস দেশীয়-রাজ্যসমূহ হইতে সংগৃহীত হওয়ার জন্য হইল। এই সাম্রাজ্য-সেবক-বাহিনী প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে ইংরেজের পক্ষভুক্ত হইয়া ইংরেজকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয়-রাজ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার বা পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য একটি দেশীয় নরপতিদের প্রতিনিধি-সভা চেম্বার অফ্ প্রিন্সেস বা রাজন্য পরিষদ বা সৃষ্ট হইল (১৯২১ খৃঃ)। এই পরিষদের কোন প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু বৃটিশ বনাম দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত সমস্যায় গভর্ণমেণ্ট এই পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। কিন্তু রাজন্যবর্গ বৃটিশের সার্ব্বভৌম শক্তি তাহাদের উপর ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছে বলিয়া উদ্বিগ্ন হন। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশীয় নরপতিদের কোন আন্তর্জ্জাতিক অস্তিত্ব ছিল না, অথচ তাহারা তাহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ করিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয়-রাজ্যসমূহকে বৃটিশ-ভারতের সমপর্য্যায় ভুক্ত করার আন্দোলন চলিল। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট "বাটলার কমিটি"-র রিপোর্টের দ্বারা দেশীয়-রাজ্যসমূহকে আশ্বাস দিল যে বৃটিশ ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি কখনও হইবে না। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে সমগ্র ভারতের দুই

পঞ্চমাংশ আয়তন এবং এক-চতুর্থাংশ লোকসংখ্যা বাদ দিয়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক উন্নতি অসম্ভব। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নেহেরু কমিটি এবং ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটুটরি কমিশন দেশীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে বৃটিশ ভারতের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে দেশীয় রাজ্যসমূহকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঐচ্ছিক যোগদানের সর্ত্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে দেশীয় রাজ্যসমূহে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং বৃটিশ ভারত দেশীয় প্রজা সম্মেলন ইত্যাদি দ্বারা এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই গণতান্ত্রিক জাগরণে প্রথমে বাধা দিলেও শেষ পর্য্যন্ত রাজন্যবর্গকে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিতে হইয়াছে। বরোদা, মহীশূর প্রভৃতি প্রগতিশীল রাজ্যে নির্ব্বাচিত আইনসভা স্থাপিত হইল এবং বহুরাজ্যে মন্ত্রিসভা দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল।

সপ্তম অধ্যায়

দেশের অবস্থা, ১৯০৬-'৩৭

প্রধানতঃ ইংলণ্ডের ও সাম্রাজ্যের স্বার্থে ভারতবর্ষের শাসন-বিধি পরিচালিত হইয়া আসিলেও এবং 'শাসন ও শোষণ' (Administration and Exploitation) এক সঙ্গেই চলিবে ইহা প্রকাশ্যে উক্ত হইলেও ইহা অনস্বীকার্য্য যে সুদীর্ঘ দেড় শত বর্ষব্যাপী বৃটিশ-শাসনে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতবর্ষ মধ্যযুগীয় স্তর হইতে দ্রুতবেগে আধুনিক যুগে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতবর্ষ আধুনিক হইয়াছে সে সকল হয়তো বৃটিশ শাসনাধীন না থাকিলেও কালের দান হিসাবে স্বতঃই ভারতে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিত—সম্ভবতঃ সামান্য বিলম্বিত হইত। তথাপি বৃটিশ-শাসনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের জীবনে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে বলিয়া বৃটিশকে এই সকলের উদ্যোক্তার গৌরব প্রদান করা চলে। সম্ভবতঃ আধুনিক এবং অগ্রসর রাষ্ট্র হিসাবে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক বা শিক্ষা বিষয়ক ত্রুটিসমূহ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে পারে নাই, অথবা অধীনস্থ কোন দেশের পরোক্ষ সন্তুষ্টির জন্য যে দক্ষ শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা কার্য্যকরী করিতে হইলেও আভ্যন্তরীণ যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধন করা শাসক জাতির পক্ষে অপরিহার্য্য ইহা মনে করিয়া ইংরেজ ভারতের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে বাধ্য হইয়াছে। কারণ যাহাই হউক, পরিবর্ত্তন যাহা হইয়াছে তাহা যে উল্লেখযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১) শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমিক

ভারতীয় শিল্পের প্রতি বৃটিশের অবহেলা ও ঔদাসিন্য উদ্দেশ্য-মূলক ছিল। লর্ড কার্জ্জনের সময়ে এই উদাসীন নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে একটি পৃথক বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগ সৃষ্ট হয়। এই সময়ে 'স্বদেশী' আন্দোলনের ফলে স্বতঃই স্বদেশ-জাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি হয় এবং বহু দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান-এর উদ্ভব হয়। কিন্তু বিদেশী শিল্প-পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিশু-শিল্প-সমূহকে রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কোন রক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিলেন না, উপরন্তু পুরাতন অবাধ বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ করিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড মর্লে ভারত গভর্ণমেণ্ট যাহাতে দেশীয় শিল্পোন্নতিতে কোন উৎসাহ প্রদান না করে তাহা জানাইয়া এক অনুজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেন।

গভর্ণমেণ্টের এই স্বেচ্ছাকৃত উদাসীনতার ফল প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হইল। যুদ্ধকালে সামরিক কার্য্যের জন্য বহু শিল্প-পণ্যের প্রয়োজন হইলে দেখা গেল শিল্পে অবহেলার দরুণ ভারতবর্ষ উপরোক্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে অক্ষম। ইহাতে ভারত গভর্ণমেণ্টের একটু চৈতন্য হইল এবং যুদ্ধের রসদাদি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে তজ্জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে একটি munitions Board স্থাপন করেন। এই বোর্ড ভারতীয় পণ্য সংরক্ষণে এবং সামরিক সরবরাহের অর্ডার ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রদান করায় ভারতবর্ষের শিল্প-সৃষ্টি যথেষ্ট পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হয়। এই সময়েই ভারতের জনমতের চাপে গভর্ণমেণ্ট একটি শিল্প-কমিশন নিযুক্ত করে। এই কমিশন ভারতীয় শিল্প প্রসারের জন্য কেন্দ্রে ও প্রদেশে শিল্প-মন্ত্রী নিয়োগ, কারিগরী বিদ্যালয়, শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদান, পণদ্রব্য চলাচলের জন্য রেলভাড়া হ্রাস ও বিশেষ সুবিধা ইত্যাদি প্রস্তাব অনুমোদন করে। গভর্ণমেণ্ট শিল্প-কমিশনের প্রস্তাব সমূহ আংশিকভাবে অনুমোদন এবং কার্য্যে পরিণত করে এবং মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড সংস্কারের পর শিল্প-বিভাগ 'হস্তান্তরিত' বিষয়ে পরিণত হয়।

কিন্তু ইহা স্মরণযোগ্য যে ভারতীয় শিল্পোন্নতির সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের

বাণিজ্য-নীতি ও শুল্ক নীতি (Tariff Policy) অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যুদ্ধ কালে সামরিক ভাবে ইংলণ্ডের কল-কারখানা সমূহ সামরিক দ্রব্য সমূহ নির্ম্মাণে ব্যস্ত থাকায় ভারতীয় শিল্পের প্রতি গভর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে পুনরায় বিলাতী শিল্প দ্রব্য নির্ম্মিত হইলে ভারতীয় শিল্পের দুরবস্থা হয়। অবাধ আমদনী নীতির ফলে বিদেশী পণ্য দ্রব্য ভারতবর্ষীয় শিশু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে পরাজিত করে। জাপানী দ্রব্য এত সুলভে ভারতের বাজারে আমদানী হইতে থাকে যে শুধু ভারতীয় পণ্যদ্রব্য নহে, বিলাতী পণ্য পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতায় পশ্চাদ্‌পদ হইতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন বিশ্ব-ব্যাপী বাণিজ্যিক মন্দা দেখা দেয় তখন ইংলণ্ড ভারতের বাজারের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু জাপানী প্রতিযোগিতায় পশ্চাদ্‌পদ হওয়ার আশঙ্কায় ইংলণ্ড দ্রুত ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত হয় এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিল্প দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য 'টেরিফ বোর্ড' গঠন করে। এই বোর্ডের অনুমোদন অনুসারে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত, তুলা, কাগজ, চিনি, দিয়াসালাই ইত্যাদি শিল্প দ্রব্যের জন্য 'শুল্ক প্রাচীর' এর বন্দোবস্ত হয়। ইহাতেও স্বীয় স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না হইয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড অটোয়াতে এক 'সাম্রাজ্য অর্থনীতিক সম্মেলন'-এর বন্দোবস্ত করে। অটোয়াতে ভারতবর্ষ এই মর্ম্মে স্বীকার করে যে ভারতে বাণিজ্য দ্রব্য আমদানি বিষয়ে ইংলণ্ড বা সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য কোন দেশ শুল্ক ব্যাপারে অধিকতর সুবিধা প্রাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে স্যার 'যম্মুখম্ চেট্টি' এই 'অটোয়া চুক্তি' সম্পন্ন করেন। বলা বাহুল্য, এই চুক্তির দ্বারা ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য স্বার্থের নিকট ভারতের স্বার্থকে বলি দেওয়া হয়। 'টেরিফ বোর্ড' দ্বারা রক্ষণ প্রাচীর নির্ম্মাণে ভারতের কয়েকটি শিল্প উন্নত হয় সত্য, কিন্তু মূলতঃ ইংলণ্ডের শিল্প দ্রব্যের পক্ষেই অধিকতর সুবিধা হয়। আমদানী শুল্ক হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বহু বিলাতী ও বিদেশী দ্রব্যের কল-কারখানা

ভারতবর্ষে নির্ম্মিত হইতে থাকে। ইহাতে ভারতীয় কয়েকটি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অটোয়া চুক্তিতে জাপানী, আমেরিকান বা অন্যান্য বিদেশী শিল্প দ্রব্যের প্রতিযোগিতা হইতে ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার যথেষ্ট সুবিধা হয়। যাহা হউক, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে গভর্ণমেণ্টের রক্ষণ ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত, সিমেণ্ট, চিনি, বস্ত্র, বহু প্রসাধন দ্রব্যাদি উৎসাহ প্রাপ্ত হয় এবং ভারতবর্ষ এই সকল শিল্পে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করে। কিন্তু যাহাদিগকে 'Key-Industries' বলে, যথা কল-কব্জা, জাহাজাদি, মোটর-যান, রেল ইঞ্জিন ইত্যাদি শিল্প যাহাতে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত না হয় তজ্জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট যত্নবান ছিল। এই সকল শিল্প প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ কখনও গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় নাই, বরঞ্চ নানাভাবে বাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সমস্যার প্রতি গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য করার প্রয়োজন হয় এবং গভর্ণমেণ্টও শ্রমিক উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে উপযুক্ত শ্রমিক-মঙ্গল আইন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয় নাই। বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘ শ্রমিকদের উন্নতির প্রতি যত্নবান হইয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনের অনুমোদিত বিধি অনুসারে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে শ্রমিক সম্পর্কিত আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে শ্রমিকদের সর্ব্বনিম্ন বয়স, দৈনন্দিন কার্য্যকাল, মঞ্জুরী বা ছুটি সম্পর্কে নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন পাশ হওয়াতে কার্য্যকালে আঘাতপ্রাপ্ত বা নিহত মজুরদের ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত হয়। অতঃপর প্রত্যেক প্রদেশেই শ্রমিকদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি গভর্ণমেণ্ট লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করে এবং কারখানা আইন, বিবিধ শ্রমিক আইন পাশ করিয়া বা কারখানা কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া শ্রমিক সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন চালু হইবার পরে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের সময়ে প্রত্যেক প্রদেশে একজন শ্রমিক-মন্ত্রীর পদ সৃষ্ট হয়। শ্রমিকগণকে স্বার্থ

রক্ষার জন্য আইনসঙ্গত ভাবে 'ট্রেড-ইউনিয়ন' বা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার প্রদত্ত হয় (১৯২৬)। এতদ্ব্যতীত ওয়াই-এম-সি-এ, সোশ্যাল সার্ভিস লীগ, Depressed Class mission Society, প্রভৃতি বে-সরকাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ শ্রমিকদের আর্থিক এবং সামাজিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। কংগ্রেসও শ্রমিক স্বার্থের প্রতি যথেষ্ট অবহিত হয় এবং বিখ্যাত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস পরিচালিত হইতে থাকে।

(২) যান-বাহন, সেচ কার্য ও কৃষি

রেলওয়েজ ঃ—গভর্ণমেণ্টের উৎসাহে ও আনুকুল্যে বে-সরকারী কোম্পানী সমূহের দ্বারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রেলপথ নির্ম্মিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ রেল কোম্পানী সমূহ প্রচুর লাভ করিতে থাকে। এই লভ্যাংশ ভারতবর্ষ যাহাতে পাইতে পারে তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের চুক্তি অন্তে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত মূল্য প্রদানের পর বিদেশী কোম্পানীর হস্ত হইতে রেলপথ সমূহ গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনয়ন করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আইনতঃ রেল কোম্পানী সমূহের মালিক হওয়ার পরেও স্বয়ং রেল পরিচালন-ভার গ্রহণ না করিয়া গভর্ণমণ্টের তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে রেলের পরিচালনা কার্য্য কোম্পানী সমূহের উপর ন্যস্ত রাখিল এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'রেলওয়ে বোর্ড' সৃষ্টি করিয়া রেলপথের তত্ত্বাবধান ইহার উপর ন্যস্ত করিল। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে রেলপথের অত্যধিক প্রসার হয়, কিন্তু যুদ্ধের পর নূতন রেল নির্ম্মাণ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। রেলপথের সুপরিচালনার জন্য যুদ্ধের পর 'অ্যাকওয়ার্থ কমিটি' নিযুক্ত হয়। এই কমিটি রেলপথের উন্নতির জন্য বাৎসরিক দেড়শত কোটি ব্যয় করিবার পরামর্শ প্রদান করে এবং রেলওয়ের পূর্ণ পরিচালনা ও নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ স্বয়ং গভর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে। অধিকন্তু এই কমিটি রেলওয়ে বাজেট-কে সাধারণ বাজেট হইতে পৃথকীকরণ এবং রেলওয়ে

ইত্যাদির জন্য নূতন যানবাহন বিভাগ সৃষ্টির জন্য পরামর্শ প্রদান করে। ভারত গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং অনিচ্ছুক হইলেও ভারতীয় জনমতের চাপে ক্রমশঃ কোম্পানীর পরিচালনা হইতে স্বয়ং রেলপথ সমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এইরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৯২৫), গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলওয়ে (১৯২৫), বার্ম্মা রেলওয়েজ (১৯২৯), ও সাউথ পাঞ্জাব রেলওয়ে (১৯৩০) ক্রমশঃ গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় আনীত হয় এবং রেলওয়ে বোর্ড নূতনভাবে সংগঠিত হয়। রেলের বাজেটও 'এ্যাকওয়ার্থ কমিটি' সুপারিশ-ক্রমে সাধারণ বাজেট হইতে পৃথক করা হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনে রেলওয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অধীন বিষয় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

জলপথ ঃ—রেলপথের তুলনায় ভারতবর্ষের জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা নৈরাশ্যজনক। ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে রেলপথ প্রসারিত হওয়ায় জলপথে যাতায়াতের উপযোগিতা যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্তর্বাণিজ্যের পক্ষে বাণিজ্য-পোত থাকা অত্যাবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে উদাসীন থাকায় ভারতে জাহাজী শিল্প গড়িয়া উঠে নাই এবং ভারতে কোন প্রথম শ্রেণীর জাহাজ মেরামতী ডকও গড়িয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষের জলপথে প্রচলিত জাহাজী কোম্পানী সমূহ প্রধানতঃ ইংলণ্ডীয় এবং ইহারাই ভারতের আন্তঃ বা বাহিরের বাণিজ্য-পণ্য বহন করিয়া থাকে। ভারতীয় জনমত ভারতবর্ষের উপকূল-বাণিজ্য দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করিবার জন্য সুদীর্ঘকাল ব্যর্থ দাবি করিয়াছে। বহু আন্দোলনের পর ভারতীয় যুবকদিগের নৌ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য 'ডাফরিণ' নামে একটি শিক্ষানবীশ পোতের বন্দোবস্ত করিয়াছে।

সেচ-কার্য্য ঃ—ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় ভারতবর্ষের কৃষি সম্পদ উন্নয়নের জন্য সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজন। কৃষিকার্যের জন্য পূর্ব্বে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিতে হইত এবং বৃষ্টিপাত প্রকৃতি-নির্ভর ও অনিশ্চিত হওয়ায় শস্যহানি ঘটিত। ১৮৯৬ ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের

সময়ে সেচ কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। লর্ড কার্জ্জনের সময়ে সেচ-কার্য্য তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয় এবং এই তদন্ত কমিটি পর্য্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে সেচ বিভাগ প্রাদেশিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তদবধি সর্ব্বত্র সেচ কার্য্য আন্তরিকতার সহিত অনুসৃত হয়। সেচ কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য :নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন হ্রদ বা জলাশয়ে ধরিয়া রাখা এবং পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে সেই মজুত জল দেশের অভ্যন্তরভাগে পরিচালিত করা। এই সমস্ত কার্য্যের ফলে যেমন বর্ষাস্ফীত নদীর দ্বারা জল-প্লাবন সৃষ্টি হইতে পারে না। অন্যদিকে তেমনি গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হইতে পারে না। আলোচ্য সময়ের মধ্যে নিম্নোক্ত সেচ কার্য্য সমূহ সম্পন্ন হইয়াছে—পাঞ্জাবের শতদ্রু উপত্যকা পরিকল্পনা (১৯৩৩), সিন্ধুদেশের সুক্কুর বা লয়েড বাঁধ নির্ম্মাণ (১৯৩২), দাক্ষিণাত্যে কাবেরী বাঁধ বা মেত্তুর পরিকল্পনা (১৯৩৪), নিজাম সাগর পরিকল্পনা (১৯৩৫), সংযুক্ত প্রদেশের সার্দ্দা-অযোধ্যা পয়ঃপ্রণালী পরিকল্পনা ইত্যাদি। এই সকল সেচ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার ফলে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, বহু পতিত জমিতে চাষ আবাদ হইয়াছে এবং কোন কোন জলের প্রবাহ হইতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি সুলভে সরবরাহের ব্যবস্থাও হইয়াছে।

কৃষি :—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে কৃষি-বিভাগ খোলা হয় এবং কৃষির উন্নতির জন্য গভর্ণমেন্ট সচেষ্ট হয়। লর্ড কার্জ্জনের সময়েই কৃষি-বিভাগের কার্য্য সক্রিয়ভাবে আরম্ভ হয় এবং পুষাতে এগ্রিকালচারেল ইনষ্টিট্যুট ও কৃষিকলেজ খোলা হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'ভারতীয়'-কৃষি-চাকুরী' বিভাগ আরম্ভ হয় এবং অতঃপর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পুনাতে এবং কানপুর, নাগপুর, লায়ালপুর, কোয়েম্বাটার, মান্দালয় প্রভৃতি স্থানে কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পর কৃষি-বিভাগ 'হস্তান্তরিত' বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়

এবং একজন মন্ত্রীর অধীনে কৃষিবিভাগ পরিচালিত হইতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি-বিষয়ক সাধারণ উন্নতি ও গবেষণাদি কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে থাকে। কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য রাজকীয় কমিশন (লিনলিথগো কমিশন, ১৯২৯) নিযুক্ত হয় এবং ইহার সুপারিশক্রমে দিল্লীতে 'কৃষি-গবেষণা সংসদ' (Imperial Council of Agricultural Research) প্রতিষ্ঠীত হয়। কেবল কৃষি-কার্য্য বিষয়ক নহে, কৃষি-সংশ্লিষ্ট পশুপালন সম্বন্ধেও গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করা ও সাহায্য করা এবং বিদেশে গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করা ও সাহায্য করা এবং বিদেশে গবেষণায় প্রাপ্ত ফল ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এই 'গবেষণা সংসদের কার্য্য। এতদ্ব্যতীত সরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎকৃষ্ট বীজ ও সার দ্বারা কৃষিকার্য্য করা, কৃষকগণকে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত নানা স্থানে 'আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র' (Model Agricultural Farm) এবং গবেষণাগার স্থাপন করা, কৃষি-পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার জন্য সরকারী বাজার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা বা কৃষি-ঋণ প্রদান করা ইত্যাদি কৃষিকার্য্যের উন্নতির অনুকূল ও আবশ্যকীয় বিধান গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে করা হইতেছে।

(৩) পল্লী-ঋণ, পল্লী-সংগঠন ও সমবায় আন্দোলন

ভারতীয় কৃষিকার্য্যের অবনতির মূলে কৃষককুলের আর্থিক দুরবস্থা বিদ্যমান। তাহারা কৃষির প্রয়োজনে অত্যন্ত উচ্চ সুদে মহাজনের নিকট হইতে আর্থিক ঋণ গ্রহণ করে এবং আজীবন এই ঋণভারে প্রপীড়িত থাকে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি এই পল্লী ঋণের পরিমাণ প্রায় ৯০০ কোটি টাকা বলিয়া অনুমান করে। এই ঋণভার হইতে কৃষক-গণকে আংশিক নিষ্কৃতি প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন সময়ে উত্তমর্ণের পক্ষে আদায়যোগ্য সর্ব্বোচ্চ সুদের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় এবং ঋণের দায়ে যাহাতে কৃষকের জমি হস্তচ্যুত না হয় তজ্জন্য 'ভূমি-হস্তান্তর

আইন' পাশ করে। এতদ্ব্যতীত উত্তমর্ণদের অত্যাচার নিয়ন্ত্রিত করার জন্য মহাজনী আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। উপরন্তু যাহাতে স্বল্প সুদে কৃষকগণ ঋণ গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য গ্রাম্য সমবায় সমিতি ও সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করার জন্য গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হয়।

পল্লী-ঋণের সুব্যবস্থা ব্যতীত পল্লীসংগঠন ও সংস্কারের প্রতি গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হয়। ভারতের মুমূর্ষু পল্লীসমূহকে সঞ্জীবিত করার জন্য কংগ্রেসও সচেষ্ট হয় এবং কংগ্রেস কর্ম্মীরা পল্লী সংগঠন কার্য্য তাহাদের কার্য্যসূচীর অন্যতম বলিয়া গ্রহণ করে। ভারতে গভর্ণমেণ্ট আলোচ্য শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে এই বিষয়ে নিয়মিত কর্ম্ম পদ্ধতি আরম্ভ করে এবং কেন্দ্রের জন্য একজন গ্রাম পুনর্গঠন কমিশনার নিযুক্ত করিয়া গ্রামোন্নয়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। বঙ্গদেশেও সরকারের পক্ষ হইতে গ্রামোন্নয়ন কার্য্যের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয় এবং সরকারের উদ্যোগে বহু গ্রাম্য অঞ্চলে পল্লীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল সমিতি বহু গ্রামের জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার, জঙ্গল নিকাশ, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কার্য্য, পথ ও সেতু নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করে। লোকায়ত্ত সরকার না হওয়ায় এই সকল সরকারী গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই এবং জনসাধারণের প্রকৃত সহযোগিতা প্রাপ্ত হয় নাই।

পল্লী সংগঠন এবং ভারতীয় কৃষকের দুরবস্থা দূর করিবার প্রচেষ্টায় নানা প্রকারের বিভিন্ন সমবায় সমিতির কার্য্য প্রশংসনীয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক সমবায় ঋণদান বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পর সমবায়-কার্য্য প্রাদেশিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রদেশ সমূহ সমবায় সম্বন্ধে উৎসাহী হয়। মহাজনের হস্ত হইতে কৃষকদিগকে উদ্ধার করিয়া স্বল্প সুদে ঋণদান করা, মিতব্যয়িতা, উদ্বৃত্ত আয় জমা রাখার বন্দোবস্ত করা, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দায় কৃষকদিগকে ঋণের দায় হইতে আংশিক নিষ্কৃতি দেওয়া ইত্যাদি উন্নতিমূলক কার্য্য প্রবর্ত্তনের জন্য সমবায় সমিতি সমুহ বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া পড়ে।

সমবায় সমিতি সমুহের কার্য্যাবলীর জন্য পল্লীসংগঠন কার্য্য ত্বরান্বিত হয়। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা, স্যার হ্যামিল্টন মহোদয়ের সুন্দরবনস্থ গোসাবা অঞ্চলে পল্লীউন্নয়ন প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৪) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

লর্ড রিপণের সময়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিধি প্রবর্ত্তিত হইলেও স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহ সুদীর্ঘকাল কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। দেশবাসীর উদ্যমের অভাব কিংবা স্বায়ত্ত শাসনের অযোগ্যতার জন্য এই শোচনীয় অবস্থা হয় নাই। এই সকল প্রতিষ্ঠানে সরকারী প্রভাব অত্যাধিক ছিল; সরকারী সভ্য অধিক নির্ব্বাচন করা হইত, অর্থব্যয় এবং কর্ম্মপদ্ধতি গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের সভাপতি সাধারণতঃ সরকারী কর্ম্মচারী থাকিত এবং সর্ব্বোপরি ভোটাধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিত। এই সকল ত্রুটির ফলেই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইলেও ইহার মৌলিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই।

১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন 'হস্তান্তরিত' বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও অধিকার পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করা হয়। দৈনন্দিন কার্য্য ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ লুপ্ত হয় এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ নির্ব্বাচন পদ্ধতিতে গৃহীত হওয়ায় পৌর প্রতিষ্ঠান সমূহ অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে এবং কর্ম্মদক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে সক্ষম হয়।

এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন সহরের উন্নতিমূলক ব্যবস্থার জন্য 'ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট' নামে স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হয়। কলিকাতা বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত জনবহুল সহরের স্বাস্থ্যবিষয়ক উন্নতি বিধানের জন্য এই সকল ট্রাষ্ট যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে।

(৫) সরকারী চাকুরী

সরকারী চাকুরীতে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিযুক্ত করা সম্বন্ধে ভারতবাসী দীর্ঘকাল আন্দোলন করিয়া আসিতেছিল। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইসলিংটন কমিশন নিযুক্ত হয়। মিঃ গোখেল ও স্যার আবদার রহিম এই কমিশনের দুইজন ভারতীয় সভ্য ছিলেন। এই রিপোর্ট ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কমিশন দুইটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করে—প্রথমতঃ, বিলাতে গৃহীত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারতীয় কর্ম্মচারী গ্রহণ ব্যতীত উচ্চতর সিভিল সার্ভিসের শতকরা পঁচিশটি পদ প্রত্যক্ষ নিয়োগ দ্বারা এবং নিম্নপদ হইতে প্রমোশনের বলে ভারতীয় কর্ম্মচারীর দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় নিয়োগ কার্য্যকরী করার জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ভারতবর্ষেও গৃহীত হইবে। ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে কার্য্যকরী হইল। ইহার ফলে অধিক সংখ্যক এবং উপযুক্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস যোগদানের সুবিধা প্রাপ্ত হইল। ভারতবর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করার জন্য পাঁচজন স্থায়ী সভ্য দ্বারা গঠিত একটি 'পাব্লিক সার্ভিস কমিশন' নিযুক্ত হইল (১৯১৫)। বলা বাহুল্য, সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভারত সচিবের হস্তে রহিল।

সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারী গ্রহণ নীতি পরিবর্ত্তিত হওয়ার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভারতীয় এই চাকুরীতে প্রবেশের সুযোগ প্রাপ্ত হইল। এই ভারতীয় করণের বিরুদ্ধে বৃটেনে আন্দোলন আরম্ভ হইলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য 'লী কমিশন' নিযুক্ত হয়। লী কমিশন সিভিল সার্ভিসের দ্রুত ভারতীয়করণ বন্ধ করার জন্য এই সুপারিশ করেন যে, সিভিল সার্ভিসের শতকরা ২০ জন কর্ম্মচারী প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস হইতে প্রমোশানের দ্বারা নিযুক্ত হইবে—বাকী ৮০ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে অর্দ্ধেক ইউরোপীয় ও অর্দ্ধেক ভারতীয় হইবে। লী

কমিশনের মতে এই ব্যবস্থানুযায়ী ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিসে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সম-সংখ্যক হইবে। কিন্তু সাইমন কমিশান এর রিপোর্টে লী কমিশনের সম্বোক্ত হিসাবের ত্রুটি প্রদর্শিত হয়। সাইমন কমিশন বলেন, উপরোক্ত হারাহারি হিসাবে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ৭১৫ জন ইউরোপীয় ও ৬৪৩ জন ভারতীয় কর্ম্মচারী সিভিল সার্ভিসে থাকিবে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-শাসন আইনেও সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য বজায় রাখা হয় এবং সিভিল সার্ভিসের সমূহ প্রভাবিত ফেডারেল সার্ভিস কমিশন এর দ্বারা গৃহীত হইলেও তাহাদের স্বার্থ ও সুবিধা রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব গভর্ণরজেনারেলের হস্তে ন্যস্ত হয়। সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীবৃন্দ এযাবৎকাল যে বেতন, ভাতা, পেনসান বা অন্যান্য সুবিধাদি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা বজায় রাখার স্বীকৃতি প্রদত্ত হয়। মোট কথা, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারিগণই প্রকৃত-পক্ষে ভারত শাসনের মেরুদণ্ড স্বরূপ বলিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই সার্ভিসে নিয়োগ, উন্নতি বা বেতনাদি সম্বন্ধে প্রকৃত অধিকার স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন।

প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে কর্ম্মচারী গ্রহণ ব্যবস্থাও প্রাদেশিক পাব্লিক কমিশনের সাহায্য করা হয় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী প্রদেশ সমূহে এই সকল কমিশন গঠিত হয়। প্রয়োজনানুসারে একাধিক প্রদেশ সংযুক্ত পাব্লিক কমিশনের সাহায্যে কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারে। পাব্লিক সার্ভিস কমিশন কেবল প্রার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ এবং উপযুক্ত ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত নিয়োগের ক্ষমতা মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত ছিল।

(৬) *বিচার ব্যবস্থা*

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় হাইকোর্ট এ্যাক্ট অনুসারে পুরাতন সুপ্রীম কোর্ট ও সদর কোর্ট সমূহ উঠিয়া গিয়া সেই স্থলে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। হাইকোর্টের বিচারক হইবার যোগ্যতা

এই তিন শ্রেণীর ছিল—ইংলণ্ড বা উত্তর আয়র্লণ্ডের ব্যরিষ্টার অথবা স্কটল্যাণ্ডের এডভোকেট, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী, এবং ভারতীয় হাইকোর্টের উকিল অথবা নিম্ন বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারী। কিন্তু প্রধান বিচারপতি কেবলমাত্র প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকই নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের হাইকোর্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী লাহোর, এলাহাবাদ, পাটনা, নাগপুর ও রেঙ্গুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় জনমত সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিচারপতি পদে সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে এবং প্রধান বিচারপতি যাহাতে হাইকোর্টের উকিলদের মধ্য হইতেও নির্ব্বাচিত হয় তজ্জন্য দাবি করিয়া আসিতেছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে পর্য্যন্ত ভারতীয়দের উপরোক্ত প্রতিবাদ বা দাবি অনুযায়ী কোন বিধান করা হয় নাই। পূর্ব্বে হাইকোর্টের বিচারপতিদের এক তৃতীয়াংশ সিভিল সার্ভিসের লোক দ্বারা পূর্ণ করা হইত। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনে সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীদের কোন অনুপাত রক্ষিত হইল না, অর্থাৎ কার্য্যতঃ সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীদের প্রাধান্যই রক্ষিত হইল। তবে উক্ত আইনে প্রধান বিচারপতির যোগ্যতা সম্বন্ধে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে অতঃপর তাহারা কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন না—'প্রয়োজন অনুসারে' দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপিত হইয়াছে ; ইহার নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করা যাইতে পারিত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রধান কার্য্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রদেশ সমূহের মধ্যে অথবা দুই বা অধিক প্রদেশের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা সম্বন্ধীয় মতবিরোধের বিচার করা। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত উপরোক্ত বিবাদের সময়ে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধান সমূহের অর্থ ব্যাখ্যা করিবে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপিত হয়

এবং স্যার মরিস গয়ার (Sir Maurice Gwyer) ইহার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। শাসনতান্ত্রিক বিষয় সম্বন্ধীয় মামলায় এই আদালত প্রাদেশিক আদালত হইতে আনীত আপিল গ্রহণ করিতে পারিত।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে কলিকাতা হাইকোর্ট ব্যতীত সকল হাইকোর্টই প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বাধীনে যায়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনে কলিকাতা হাইকোর্ট সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সকল হাইকোর্টেরই বিচারকদের বেতন ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে দেওয়া হইতেছে।

(৭) দেশরক্ষা ও সামরিক বিভাগ

লর্ড কার্জ্জনের সময়ে সামরিক শাসন ব্যবস্থায় এক নূতন পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়। পুরাতন ব্যবস্থানুযায়ী ভারতের জঙ্গীলাট বড়লাটের কার্য্য পরিষদের একজন 'অতিরিক্ত' সভ্য ছিলেন। জঙ্গীলাট ব্যতীত এই পরিষদের একজন সামরিক সদস্য ছিলেন এবং জঙ্গীলাটকে উক্ত সামরিক সদস্যের মাধ্যমে পরিষদের নিকট সামরিক কার্য্যক্রম উপস্থাপিত করিতে হইত। পদমর্য্যাদায় জঙ্গীলাট অপেক্ষা অধস্তন শ্রেণীর হইলেও সামরিক সদস্য প্রকৃত প্রস্তাবে সামরিক বিভাগের নিয়ন্তা ছিলেন। কার্জ্জনের সময়ে লর্ড কিচেনার ভারতের জঙ্গীলাট ছিলেন। তিনি উপরোক্ত অ-স্বাভাবিক রীতির পরিবর্ত্তে জঙ্গীলাটকে সমর-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করার পরামর্শ দেন এবং সামরিক সদস্য-পদ তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। কার্জ্জন লর্ড কিচেনারের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে সামরিক বিভাগ বে-সামরিক বিভাগের অধীনে থাকাই যুক্তি-যুক্ত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কিচেনার-কে সমর্থন করায় ইহার প্রতিবাদে কার্জ্জন পদত্যাগ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে জঙ্গীলাটই ভারতের প্রধান সমর-উপদেষ্টার অধিকার প্রাপ্ত হন। অনেকের মতে কার্জ্জনের যুক্তিই

ন্যায়সঙ্গত ছিল। কেননা, আইনতঃ বড়লাটই ভারত সচিবের পর ভারত-শাসন ব্যাপারে প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন। জঙ্গীলাটকে সামরিক বিভাগের স্বাধীন দায়িত্ব প্রদান করিলে বড়লাটের দায়িত্ব ও পদমর্য্যাদা বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হইয়া যায়।

ভারত গভর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা ও সামরিক বিভাগের পরিচালনা নীতি সম্বন্ধে ভারতবাসীর মনোভাব অত্যন্ত তীব্র। প্রথমতঃ, সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে সামরিক বিভাগের কোন দায়িত্বশীল পদ ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করা হইতেছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করা হইত ও ভারতীয় রাজকোষের অর্থব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতেছিল। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন সময়ে শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলেও দেশরক্ষা ও সামরিক বিভাগ সম্পূর্ণ বৃটিশের হাতে রাখা হইতেছিল। কোন দায়িত্বশীল ভারতীয় মন্ত্রীর হস্তে দেশরক্ষার ভার অর্পণ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ছিল না। সৈন্যবিভাগ ভারতীয়-করণের বিরুদ্ধে বৃটিশের আপত্তির কারণ তিনটি—সীমান্ত রক্ষা, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও দেশীয় রাজ্যের নিরাপত্তা। এই তিনটি 'মহান দায়িত্ব' ভারতীয় সৈন্যের দ্বারা সম্যকভাবে প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা কম। গভর্ণমেণ্টের আয়ের অর্দ্ধেকের অধিক সামরিক খাতে ব্যয়িত হইত। ফলে জাতীয় গঠনমূলক কাজের জন্য সর্ব্বদা অর্থাভাব ঘটিত। দেশবাসীর পক্ষ হইতে এই ব্যয় বাহুল্যের বিরুদ্ধে অজস্র প্রতিবাদ করিয়াও কোন ফলোদয় হয় নাই।

ভারতীয় সামরিক বিভাগে অফিসার শ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—কিংস্ কমিশন এবং ভাইস্‌রয়েস্ কমিশন। ভাইস্‌রয়েস্ কমিশনের কর্ম্মচারীরা ভারতীয় হইত, কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদা একটু নিম্নস্তরের থাকিত। কিংস্ কমিশনে মাত্র ইউরোপীয়দের প্রবেশাধিকার ছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে বিশেষ কয়েকটি গুণবত্তার অধিকারী

হইলে ভারতীয়গণ কিংস্ কমিশনে যোগদান করিতে পারিত। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের পর 'ইণ্ডিয়ান কমিশানড্ অফিসার' নামে তৃতীয় শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সম্প্রতি সামরিক বিভাগে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আকারে ক্ষুদ্র হইলে রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বহর এবং বিমান বাহিনী ভারতীয় সমর বিভাগের অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছে। যুদ্ধ-শিক্ষার জন্য দেরাদুনে একটি সামরিক বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্থল বাহিনীকে যুগোপযোগা যান্ত্রিক সজ্জায় সজ্জিত করার প্রচেষ্টা হইতেছে। ভারতের স্থল-বাহিনী দেশরক্ষার উপযোগী হইলেও ভারত গভর্ণমেণ্ট চিরকাল ভারতীয় নৌ-বিভাগকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে তিনদিকে সমুদ্র-বেষ্টিত দেশের পক্ষে উপযুক্ত নৌ-শক্তির অভাব যে কিরূপ বিপজ্জনক তাহা দেখা গিয়াছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারই সমগ্র বৃটিশ ভারতীয় রাজস্বের মালিক ছিল এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহ আর্থিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ছিল। লর্ড মেয়োর সময়ে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তাহার সময় হইতে কেন্দ্রীয় সরকার শান্তি-রক্ষা, জেল বিভাগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রাদেশিক সরকারের হস্তে নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ প্রদান করিতে আরম্ভ করে। এই নির্দ্দিষ্ট অর্থ স্বেচ্ছামত ব্যয় করার অধিকার ব্যতীত প্রয়োজনানুযায়ী আইনের সাহায্যে কর-স্থাপনের-দ্বারা অর্থ সংগ্রহের অধিকার প্রাদেশিক সরকারকে প্রদত্ত হইল। লর্ড লিটনের শাসন সময়ে আরও কয়েকটি বিভাগ প্রাদেশিক অধিকারে আসে। দীর্ঘকাল যাবৎ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব-তহবিল হইতে নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদেশের হস্তে অর্পণ করিত। প্রদেশকে এই অর্থ এবং সামান্য কয়েকটি বিষয়ে কর স্থাপনের দ্বারা তাহার

আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে হইত। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার রিপোর্টে আর্থিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যধিক আধিপত্য এবং প্রাদেশিক সরকারের কেন্দ্র-মুখাপেক্ষিতার অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল।

কেন্দ্র ও প্রদেশের আর্থিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণের জন্য ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্যার জেম্‌স (পরে লর্ড) মেষ্টনের সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটির সুপারিশ মেষ্টন বাঁটোয়ারা (Meston Award) নামে পরিচিত। এই বাঁটোয়ারা অনুযায়ী জেল, পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রাদেশিক দায়িত্ব পরিচালনার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভূমিকর, আবগারী হইতে আয়, বনকর, বিচার সম্পর্কিত ষ্ট্যাম্প হইতে আয় ও কতিপয় সেস্ প্রাদেশিক সরকারকে প্রদত্ত হয়। অন্যদিকে ইংলণ্ডে প্রেরিতব্য অর্থ (Home Charges), জাতীয় ঋণ, দেশরক্ষা বিভাগ প্রভৃতির ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য লবণ কর, বাণিজ্য শুল্ক, আয়কর, টাকশালের আয় এবং ডাকবিভাগ ও রেলওয়ের আয় ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত হয়। এতদ্ব্যতীত মেষ্টন কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য প্রাদেশিক তহবিল হইতে (বিহার উড়িষ্যা বাদ) কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব করেন। এই সাহায্যের পরিমাণ প্রায় দশ কোটি টাকা ছিল। প্রদেশ সমূহের আপত্তিতে এই সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস করা হয় এবং ১৯১৮-'২৯ খৃষ্টাব্দে এই সাহায্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এইভাবে প্রাদেশিক সরকার সমূহ একই নীতিতে নির্দ্ধারিত আর্থিক ব্যবস্থার অধীন হয়। পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা ছিল এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির কোন বাজেট ছিল না। মেষ্টনী বন্দোবস্তে প্রদেশ সমূহ আর্থিক দুশ্চিন্তা হইতে নিস্কৃতি প্রাপ্ত হয়।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন অনুসারে রাজস্ব প্রভৃতি সকল ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীনতা আইনসঙ্গতভাবে স্বীকৃত হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশের আয়ের নির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত কয়েকটি বিষয়ে ভাগাভাগির

বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরাধিকার-কর, প্রান্ত-কর, রেলওয়ে ভাড়ার উপর ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায় করিবেন, পরে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য সমূহকে তাহাদের প্রাপ্য অনুসারে ঐ অর্থ ভাগ করিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতীত আয় কর, লবণ কর, বাণিজ্য শুল্ক প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্র নির্দ্ধারণ ও আদায় করিবে এবং স্বেচ্ছামত উহা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের মধ্যে অংশতঃ বা সম্পূর্ণ দিতে পারিবে। কিন্তু পাট রপ্তানী শুল্কের অন্ততঃ অর্দ্ধেক ভাগ পাট উৎপাদন-কারী প্রদেশকে দিতেই হইবে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'অটো নিমেয়ার'-এর রিপোর্ট প্রাদেশিক আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু সুপারিশ করে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন কার্য্যকরী হওয়ার সময়ে যাহাতে প্রদেশ সমূহের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকে তজ্জন্য এই রিপোর্ট কয়েকটি প্রদেশকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা, কয়েকটি প্রদেশের আর্থিক ঋণ মকুব করা, পাটশুল্কের শতকরা সাড়ে বারো টাকা পাট উৎপাদনকারী প্রদেশ সমূহকে প্রদান, কয়েকটি সর্ত্ত সাপেক্ষে আয় করের অর্দ্ধেক টাকা সংশ্লিষ্ট প্রদেশ সমূহকে প্রদান ইত্যাদি সুপারিশ করে। আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করার জন্য ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন বিধিবদ্ধ হয় ও ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চালু হইতে থাকে।

ভারত গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইবার যথেষ্ট অন্তরায় ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গভর্ণমেণ্টের আয়ের প্রধান উৎস ভূমি-রাজস্ব হইতে আয় বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ ছিল। দেশরক্ষা, জাতীয় ঋণের সুদ দেওয়া, হোম চার্জ্জেস্ ইত্যাদি কার্য্যেই আয়ের অধিকাংশ অর্থ ব্যয়িত হইত। এই তথাকথিত জাতীয় ঋণের মহাজন ছিল ইংলণ্ড। কোম্পানীর যুগ হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছে ইংলণ্ড হইতে ঋণ করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াছে এবং পরিশোধের দায়িত্ব ভারতের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রেলওয়ে, পূর্ত্ত কার্য্য ইত্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্যও ইংলণ্ড হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অবশ্য প্রথম বিশ্ব-মহাসমরের পর ভারতের অভ্যন্তর হইতে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত

হইয়াছে। উপরোক্ত ঋণের বাৎসরিক মোটা অঙ্কের সুদ ভারতবর্ষ উত্তমর্ণ হিসাবে ইংলণ্ডকে দিয়া আসিতেছে। এই শির-স্ফীত ব্যয়বাহুল্যের জন্য জাতীয় গঠনমূলক কার্য্য যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প ইতাদিতে ভারত গভর্ণমেণ্ট কোন দিন ন্যূনতম অর্থও বরাদ্দ করিতে পারে নাই।

(৮) স্বাস্থ্য রক্ষা

বৃটিশ ভারতের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কেন্দ্রে এবং প্রদেশে ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধান করেন এবং মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের পর স্বাস্থ্য 'হস্তান্তরিত' বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

রোগ নিবারণ ও রোগ নিরাময়: উভয়বিধ ব্যাপারেই ভারতবর্ষ যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশেই 'জন-স্বাস্থ্য বিভাগ' স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট রহিয়াছে এবং সর্ব্বত্র সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টায় চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মিউনিসিপ্যালিটি বা জেলা বোর্ডগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করিতেছে। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার 'অল ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিট্যুট অফ পাব্লিক হেল্‌থ এ্যাণ্ড হাইজিন' এর নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশী দাতার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহার পরিচালনা করে এবং এই প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে।

ভারতীয় রোগ ও তাহার প্রতিষেধক ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য সরকার বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় 'স্কুল অফ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন' বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ক্ষিপ্ত জন্তুদষ্ট রোগীর চিকিৎসার জন্য কসৌলীতে, মান্দ্রাজের কুনুর-এ, শিলং-এ ও কলিকাতায় চিকিৎসালয় আছে। কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর প্রতিষেধক টিকা ও ইঞ্জেকসন প্রভৃতির বহুল প্রচার সাধিত হইয়াছে। বাতুল, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্য বাতুলাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম ও স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত হইয়াছে।

গবাদি পশুর চিকিৎসার জন্য গভর্ণমেণ্ট একাধারে পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসক-এর বন্দোবস্ত করিয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের বহুবিধ প্রচেষ্টা থাকিলেও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা এই বিরাট দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। অধিকন্তু অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের জন্য ভারতের জাতীয় স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি হইতেছে।

———

ভারতবর্ষের ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ

বিংশ শতাব্দী ও মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

(১) ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

(ক) গতি ও প্রকৃতি।

(খ) স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্রম-বিকাশ।

(গ) দ্বিতীয় বিশ্ব-সমর—স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্য্যায়।

(২) ভারত বিভাগের কাহিনী

(৩) সমাজনৈতিক সংস্কার প্রচেষ্টা

(৪) শিক্ষা ও সংস্কৃতি

(৫) সাধারণতন্ত্রী ভারতের শাসন-পদ্ধতি

বিংশ শতাব্দীর ভারত

(১) ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

(ক) মুক্তি-সংগ্রামের গতি ও প্রকৃতিঃ—ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড কোন নৈতিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের অধিকার স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ করে নাই, সংগ্রাম-বহুল সুদীর্ঘ উত্থান পতনের মধ্য দিয়া ভারতবাসীকে স্বাধিকার অর্জ্জনের গৌরব লাভ করিতে হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরোধিতার মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত সূত্রপাত হয়। ভারতের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস প্রথমে নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করে—পরিশেষে গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের প্রথম যুগের অস্ত্র ছিল বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন, দ্বিতীয় যুগে 'বয়কট' বা অসহযোগিতা এবং শেষ অধ্যায়ে আইন অমান্য করা ; এবং দাবির মাত্রাও ছিল প্রথম স্তরে 'আবেদন-নিবেদন', মধ্যম স্তরে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং অন্তঃস্তরে পূর্ণ স্বাধীনতা।

ভারতের স্বাধিকার লাভের প্রচেষ্টাকে প্রতিরুদ্ধ করার জন্য বৃটিশ শক্তি তাহার কূটনীতিক তূণের কোন অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করে নাই। দমন-আইন, বন্দীশালা, ফাঁসি-মঞ্চ সমস্ত প্রয়োগ করিয়া বিভীষিকা রাজত্বের সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু দেশবাসীর শৃঙ্খল মোচনের কামনাকে স্তব্ধ করিতে পারে নাই। এই সকল বিভীষিকা সৃষ্টির সঙ্গে বৃটিশ শক্তি ভারতবাসীদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে শাসন সংস্কারের স্বল্পমাত্রার দাক্ষিণ্য। ইহাই আয়ার্ল্যাণ্ডে এবং অন্যত্র প্রযুক্ত বৃটিশের Policy of Kicks and Kisses—একই সঙ্গে নিপীড়ন ও সুবিধা প্রদান। এই নীতি জাতীয় আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কাল পর্য্যন্ত অনুসৃত হইয়াছিল। ১৯০৫-'৬-এর স্বদেশী আন্দোলনের পশ্চাতে আসিয়াছে মর্লে-মিণ্টো সংস্কার, দ্বিতীয় দশকের

'হোম-রুল লীগ' আন্দোলন ও প্রথম বিশ্ব মহাসমরে যোগদানের বিনিময়ে পাইয়াছে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার; ১৯২১-'২৪-এর অসহযোগ আন্দোলন ও ১৯৩০-'৩১-এর আইন অমান্য আন্দোলনের নিবৃত্তির জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রথমে প্রেরণ করিয়াছে 'সাইমন কমিশন', লণ্ডনে বসিয়াছে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সহ তিন দফা গোল টেবিল বৈঠক এবং পরিশেষে আসিয়াছে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়েও 'ক্রিপস মিশন' ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার উদ্দেশ্যে ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু 'মুষ্ট্যাঘাত ও দাক্ষিণ্যের' কূটনীতি কিছু সময়ের জন্য কিয়ৎ সংখ্যক লোকের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইলেও কোন জাতির স্বাধিকারের-দাবিকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে না—ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। মুক্তি-সংগ্রামের শেষ পর্য্যায়ে আভ্যন্তরীণ জাতীয়-অভ্যুত্থানের তীব্রতা ও বহির্বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি বৃটিশকে চিরতরে ভারত পরিত্যাগে বাধ্য করিল।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে দুর্ব্বল করার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলনের মধ্যে প্রথমাবধি বিভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ হিন্দু সম্প্রদায় হইতে পৃথক—এই মনোভাব বিভিন্ন প্রকারে মুসলমানদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া জাতীয় আন্দোলন হইতে তাহাদিগকে পৃথক রাখার জন্য কোন চেষ্টার ক্রটি করে নাই। লর্ড মিণ্টোর সময়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশের আনুকূল্যে মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বে একদল নেতৃস্থানীয় মুসলমান তাহাদের পৃথক স্বার্থ রক্ষার জন্য বড়লাটের নিকট আবেদন করেন এবং বড়লাটও তাহাদের স্বার্থ সম্যকরূপে বিবেচিত হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। বৃটিশের এই বিভেদ নীতি একেবারে সফল না হইলেও আন্দোলন হইতে মুসলমান সম্প্রদায় মুখ্যতঃ দূরে থাকে। কিন্তু নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময় তাহাদের জন্য সর্ব্বত্র বিশেষ সংরক্ষণ নীতি অবলম্বিত হইতে থাকে। মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় গণ-আন্দোলনে

অংশ গ্রহণ করাইবার প্রত্যাশায় কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সুবিধা স্বীকার করে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রত্যাশা আংশিকভাবে পূর্ণ হয়। ১৯২০-'২১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানের খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করার বিনিময়ে কংগ্রেস মুসলমানদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়। খিলাফৎ আন্দোলন পরিত্যক্ত হইবার পর মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশ জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বৃটিশের-ভেদ নীতির ফলেই 'হিন্দু' প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের হাতে মুসলমানের স্বার্থ নিরাপদ হইবে না এই মনোবৃত্তিই জয়যুক্ত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের সহযোগিতা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য অধিকসংখ্যক চাকুরী ও পরিষদের আসন, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন কেন্দ্র প্রভৃতি স্বীকার করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করে। এই সকল সুবিধা প্রদান করা সর্ত্তেও তাহারা জাতায় আন্দোলনে যোগদান না করিয়া পৃথক জাতি হিসাবে এক পৃথক রাষ্ট্রের জন্য দাবি করিতে থাকে। এই দ্বি-জাতি তত্বের পরিণতি ভৌগোলিক ভাবে অবিচ্ছেদ্য ভারতের অঙ্গে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। বৃটিশের সৃষ্ট ও বৃটিশের দ্বারা সযত্নে বৰ্দ্ধিত কৃত্রিম ভেদ-নীতি পরিণামে ভারতীয় উপমহাদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া উভয় রাষ্ট্রকে ভবিষ্যৎ অকল্যাণের সম্মুখীন করিয়া গেল।

কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সমান্তরালে চলিয়াছে স্বাধীনতাকামী তরুণ সম্প্রদায়ের সশস্ত্র-বিপ্লবের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টা। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদ আপাততঃ কার্য্যকরী না হইলেও ইহার গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য সার্থকতা লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। অধিকন্তু ১৯২০-'২১ খৃষ্টাব্দের পর হইতে গান্ধীজির অহিংস নীতি দ্বারা প্রভাবিত জনসাধারণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সমর্থন করিতে পারে নাই। তথাপি যে সকল সন্ত্রাসবাদী যুবক তাহাদের রক্তের পবিত্র ধারায় জাতির ললাট হইতে দাসত্বের কালিমা মুছিয়া দিবার

জন্য ইংরেজের বন্দিশালায় অথবা ফাঁসি-মঞ্চে জীবনের জয়গান গাহিয়া গেল তাহাদের স্বদেশপ্রেমের আন্তরিকতা জাতীয় আন্দোলনের গতিকে দুর্ব্বার করিয়া তুলিয়াছিল। কানাই, ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, বাভগৎ সিংহের আত্মদান ব্যর্থ হয় নাই—এই সকল মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের শোণিতে পরাধীন জাতির মনোভূমি উর্ব্বরা হইয়া মুক্তি পিপাসাকে আরও তীব্র করিয়াছিল। ইহাদের আত্মদান যে জাতীয় আন্দোলনকে অলক্ষ্য গতি ও প্রেরণা জোগাইয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য্য।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অনেক সময় অগ্নিযুগের দানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। অনেকে মনে করেন এই অগ্নিযুগ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত অধ্যায় মাত্র—কয়েকটি অপরিনাম-দর্শী উন্মাদ তরুণের সামরিক উত্তেজনা প্রসূত কার্য্য; যেন এই অগ্নিযুগ আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। বাস্তবপক্ষে ব্যাপারটা কতকটা তাই। অগ্নিযুগের কর্ম্মীবৃন্দ এই কথা সত্যিই জানিত যে একাধিক শতাব্দীর পরাধীনতা ঘুচাইবার জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি খণ্ড-বিপ্লব মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। তাহাদের দুর্ব্বল হস্তের অস্ত্র অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী শক্তিমান তাহাদের প্রতিপক্ষ, একট, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের মালিকের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় কয়েকটি তরুণের অস্ত্রধারণ বাতুলতা মাত্র। তথাপি ভারতবাসীর উপায়বিহীন কাপুরুষতা আর ভীরু আত্মা-বমাননার গ্লানি ঘুচাইবার জন্য—এতদিন যাহারা বিনা প্রতিবাদে সমস্ত সহ্য করিয়া আসিয়াছে তাহাদের কণ্ঠে প্রতিবাদের সাহস দিবার জন্য—তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাসের ক্ষীণরেখা জাগাইয়া তুলিবার জন্য, অগ্নিযুগের কর্ম্মীবৃন্দ স্বেচ্ছায় হাসিমুখে ফাঁসিমঞ্চকে বরণ করার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। তাহারা জানিত আজ যে প্রতিরোধ মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি মানুষের মনে আবদ্ধ রহিল—একদিন তাহা সমগ্র দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে—অগণিত জনতার মধ্যে। তাঁহাদের আত্ম-ত্যাগ নিস্ফল হইবে না।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর দান অসামান্য—নিরস্ত্র ভারতবর্ষের পক্ষে তাঁহার অসহযোগ ও অহিংস অস্ত্রের উপযোগিতা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অগ্নিযুগের অগণিত সর্ব্বস্বত্যাগী কর্ম্মীবৃন্দ বা মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের দানের কথা বাদ দিয়া যদি শুধু গান্ধীজীর নীতি ও কাজের কথা থাকে তাহা হইলে এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। যদি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে অগ্নিহোত্রী ক্ষ্যাপা তরুণের দল এইভাবে দুঃখ বরণ ও মৃত্যুবরণ করিয়া জাতির ঘুম ভাঙ্গাইয়া না যাইত তাহা হইতে মহাত্মার অসহযোগ অস্ত্র ধারণ করিবার শক্তি দেশের লোকের হইত কিনা সন্দেহ? ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে লেখা থাকিতে হইবে—বালেশ্বরে বুড়ী বালামের তীরের যুদ্ধ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের গৌরবময় অধ্যায়, ১৯৪২-এর গণ-আন্দোলন, মেদিনীপুর বালুরঘাট—সাতারা-বালিয়ার জাতীয় সরকার গঠনের ইতিহাস এবং সর্ব্বোপরি নেতাজীর ইম্ফল অভিযানের কাহিনী এবং ভারতের বাহিরে গিয়া যাহারা বিভিন্ন সময়ে বিদেশীর রাষ্ট্রের সাহায্যে দেশকে উদ্ধার করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন সেই সকল মুক্তিপিপাসু বিপ্লবী ও হিংসাব্রতে বিশ্বাসী তরুণদের নাম।

(খ) স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্রমবিকাশ :—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নানা দিক দিয়া বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন যুগান্তর আনয়ন করিল। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য লর্ড কার্জ্জন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলন আবেদন নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আবেদন নিবেদনের ভিতর দিয়া যে ভারতের ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে তাহা দেশবাসী বুঝিতে পারিল। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালীর জাতীয় ঐক্য

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন

নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহা সকলেই আশঙ্কা করিল। এক হিসাবে এই অভিযোগ সত্য, কারণ বঙ্গ বিভাগের প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালার দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ বিরোধের সৃষ্টি হয়।

বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হয় তাহার নেতৃত্ব করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। শীঘ্রই এই আন্দোলন সর্ব্ব ভারতীয় হইয়া দাঁড়ায় এবং ভারতবাসী জাতীয়তাভাবে উদ্দীপিত হইয়া বঙ্গ-ভঙ্গের 'অবিচল সিদ্ধান্ত' (settled fact)কে পরিবর্ত্তিত (unsettled) করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ভারতবাসীর পক্ষ হইতে প্রতিবাদ স্বরূপ বৃটিশ পণ্য বয়কট-এর প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এই 'বয়কট' কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টা হয়। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন ব্যর্থ হয় নাই—ছয় বৎসর বাদে উভয় বঙ্গকে পুনরায় যুক্ত করা হইয়াছিল। এই জয়লাভের ফলে পরাধীন জাতির মনে আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর এবং সমগ্র জাতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে অগ্রসর হইল।

বহির্বিশ্বের ঘটনাদ্বয়ের দ্বারা প্রভাবিত

বহির্বিশ্বের সমকালীন দুইটি ঘটনা ভারতের জাতীয়তাবাদকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। ইটালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধ ও রুশ-জাপান যুদ্ধ। উভয় যুদ্ধেই দুইটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র প্রাচ্য জাতির হস্তে পরাভূত হয়—ইহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ভারতবাসী আত্মশক্তির উপর অত্যন্ত বিশ্বাসী হয়।

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধ—চরমপন্থী ও নরমপন্থী

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুইটি দলের উৎপত্তি হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। লোকমান্য তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নির্দ্দেশে চরমপন্থী দল কংগ্রেসকে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ হইতে সক্রিয় আন্দোলন ও অধিকতর বিপ্লবমুখী করার চেষ্টা করে। আবেদন

নিবেদন বা ভিক্ষার সাহায্যে স্বাধীনতার লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া চলে না ইহাই ছিল চরমপন্থীদের মত। নরমপন্থীরা গতানুগতিক ভাবে নিয়মতান্ত্রিকতার পদ্ধতিতে অগ্রসর হইবার পক্ষপাতী ছিল। উপরন্তু স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে মতভেদ ছিল। নরমপন্থীরা বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের অপরাপর ডোমিনিয়ানের মত দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু চরমপন্থীরা বৃটিশের অধিকার মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত সন্তুষ্ট হইবে না বলিয়া দাবি করিতে লাগিল।

নরমপন্থী বা মডারেট দলের সহিত চরমপন্থীদের বিরোধ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসী কংগ্রেসেই পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি দাদাভাই নৌরজী কোন প্রকারে উভয়-পক্ষকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেন। এই কংগ্রেসেই ভারতবর্ষের দাবি যে 'স্বরাজ' এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্যার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে উভয় পক্ষের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং গণ্ডগোলের জন্য সুরাট কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে চরমপন্থীদের বাদ দিয়া মান্দ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল—সভাপতি হইলেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। উক্ত বৎসরেই এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কনভেনসনে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচিত হইল। উক্ত গঠনতন্ত্রে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসাবে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জ্জন করা কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইল। কংগ্রেসে চরমপন্থীদের প্রভাব দূর করার জন্য এই মর্ম্মে আর একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, যাহারা কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া কংগ্রেসের নিয়মাবলী মানিয়া চলিবেন তাহারাই কংগ্রেসের প্রতিনিধি হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন। এইরূপে কংগ্রেসে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া চরমপন্থীরা বিপ্লববাদের পন্থা অনুসরণ করিল এবং দেশের বহু স্থানে বিপ্লবীদের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেস মডারেট পন্থীদের দখলে রহিল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মডারেট প্রাধান্য

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের ফল আশানুরূপ হইল না, যদিও গোখ্‌লে প্রভৃতি মডারেটপন্থীরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। কেননা, ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্টের দমন নীতি তীব্র ভাবে অনুসৃত হইতেছিল এবং বিভিন্ন অর্ডিনান্স, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইন প্রভৃতির সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট বহু লোককে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতেছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সরকারী দমন নীতি রুদ্র রূপ ধারণা করিল। লোকমান্য তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে ছয় বৎসর কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বাংলার অশ্বিনী কুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট জননায়ক ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইন অনুসারে ধৃত হইয়া বন্দী হইলেন। বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটি সংবাদপত্র প্রচার বন্ধ করা হইল ও কয়েকটি ক্ষেত্রে মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত হইল। এই সকল চণ্ডনীতির ফলে ভারতময় অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মর্লে-মিণ্টো সংস্কার ভারতে প্রবর্ত্তিত হইল এবং ভারতবাসীদের অসন্তোষ প্রশমিত করিবার জন্য ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী ভারতে পদার্পণ করিয়া দিল্লীর দরবার হইতে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হইলেও বঙ্গদেশের আয়তন পূর্ব্ববৎ রহিল না। বঙ্গদেশ হইতে তিনটি নূতন প্রদেশ বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম সৃষ্ট হইল এবং ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। এই ব্যবস্থায় প্রকারান্তরে বঙ্গদেশের আধিপত্য ও সংহতি বিনষ্ট করার ব্যবস্থা হইল—যদিও সেই সময়ে ছিন্ন বঙ্গ যুক্ত হওয়ার আনন্দে দেশনায়কগণ ভবিষ্যতের ক্ষতির সম্ভাবনাকে তেমন বড় করিয়া দেখেন নাই। সম্মুখ যুদ্ধে বিজিত হইলেও বৃটিশ কূটনীতি পরিণামে জয়ের পথ করিয়া রাখিল —দক্ষিণ হস্তের দ্বারা যে অনুগ্রহ বর্ষিত হইল বাম হস্তের দ্বারা তাহা প্রত্যাহৃত হওয়ার ব্যবস্থা রহিল।

দমন-নীতি ও মর্লে-মিণ্টো সংস্কার

বঙ্গ-ভঙ্গ রদ, ১৯১১

মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে দেশের কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হইল না। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ইহার অসারতা প্রমাণিত হইল। ইতিমধ্যে বাহিরের কয়েকটি ব্যাপারের ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদ পুনরায় নূতন উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, উগাণ্ডা, কেনিয়া প্রভৃতি কয়েকটি বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীদের উপর অত্যন্ত নির্য্যাতন করা হইতেছিল। স্বদেশীয়দের উপর এই নির্য্যাতন এবং বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদকল্পে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (পরে মহাত্মা গান্ধী) দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ করেন। বহির্ভারতে দেশবাসীর এই অপমান ও লাঞ্ছনায় সমগ্র ভারতবর্ষ বিচলিত হয় এবং স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হইলে বিদেশে ভারতবাসীর মর্য্যাদা কোথায়ও রক্ষিত হইবে না তাহা উপলব্ধি করে। ইসলাম রাষ্ট্রদ্বয় তুরস্কে ও পারস্যে নব জাগরণের সংবাদে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ও জাতীয়তাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার নেতৃত্বে 'মুসলিম লীগ' স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট দ্বারা কংগ্রেস ও লীগ যুক্তভাবে বৃটিশ বিরোধী কার্য্যক্রমের নীতি গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্ব-মহাসমরের সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের বৃটিশ বিরোধিতার অন্য কারণও ছিল। ইসলামের ধর্ম্মগুরু ও তুরস্কের খলিফার বিরুদ্ধে মিত্র পক্ষীয়গণ যুদ্ধ ঘোষণা করাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত লাগে।

প্রবাসী ভারতীয়ের লাঞ্ছনা

লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট, ১৯১৬

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের সাহায্য ব্যতীত এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভের সম্ভাবনা কম ছিল এবং যুদ্ধান্তে শাসনতান্ত্রিক সুবিধালাভের প্রত্যাশায় কংগ্রেস বৃটিশকে অকুণ্ঠ সাহায্য করিয়াছিল। যুদ্ধ চলিবার কালে

প্রথম বিশ্ব-মহাসমর ও জাতীয় আন্দোলন

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা মিসেস আনি বেসান্টের "হোমরুল লীগ" আন্দোলন। মিসেস বেসান্ট ভারতবাসীর স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে "হোম রুল লীগ" প্রতিষ্ঠা করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন। লোকমান্য তিলক হোমরুল আন্দোলন সমর্থন করিয়া দৈনিক সংবাদপত্র 'কেশরী' ও সাপ্তাহিক 'মারাঠা' পত্রিকার সাহায্যে হোমরুলের বার্ত্তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। সরকার দমন নীতির সাহায্যে আন্দোলন নষ্ট করিবার চেষ্টা করিল। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সরকারের রোষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। তিলক ও বিপিন চন্দ্র পালের পাঞ্জাব গমন নিষিদ্ধ হইল, মিসেস বেসান্ট ও তাহার সহকর্ম্মী এরুণ্ডেল ভারত সরকারের নির্দ্দেশে অন্তরীণ হইলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে আনি বেসান্ট সভাপতিপদে বৃত হইলেন। আনি বেসান্টের সভাপতি পদ লাভের ফলে কংগ্রেসে চরমপন্থীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

হোম রুল লীগ

জাতীয় আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করিতেছে উপলব্ধি করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের প্রস্তাব সমূহ প্রকাশ করিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসের আধিপত্য চরমপন্থীদের হস্তগত থাকে। কংগ্রেস দেশবাসীর পক্ষ হইতে নূতন সংস্কার গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া ইহা প্রত্যাখ্যান করে। মডারেট দল ইণ্ডিয়ান ন্যাশানেল লিবারেল ফেডারেশন নামে এক নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া নূতন সংস্কারকে অভিনন্দন জানাইতে দ্বিধা করিল না। এই 'মণ্টেগু মাকালের' বিরুদ্ধে পুনরায় দেশব্যাপী সভা সমিতি ও আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রত্যুত্তরে গভর্ণমেণ্ট 'রাউলাট এ্যাক্ট' নামে এক দমন মূলক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে। পাঞ্জাবের অমৃতসরে অবস্থিত জালিয়ানওয়ালাবাগে পাঞ্জাবের সৈন্যদল এক নিরস্ত্র জনতার

রাউলাট এ্যাক্ট ও জালিয়ানওয়ালাবাগ

উপর গুলি বর্ষণ করিয়া বহু নরনারীকে নিহত করে এবং অতঃপর পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করিয়া গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত হইয়া জাতীয় অবমাননার প্রতিবাদ স্বরূপ বৃটিশ প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে দেশের বহু জননায়ককে বিনা বিচারে বন্দি-শালায় এবং নির্ব্বাসনে প্রেরণ করা হয়। এই সকল দমন নীতির ফলে জাতীয় আন্দোলন অধিকতর শক্তি প্রাপ্ত হয়। রাজনৈতিক অসন্তোষ ব্যতীত যুদ্ধান্তে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যুদ্ধের ঋণ পরিশোধের জন্য বিভিন্ন প্রকারের করবৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাও বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধির কারণ হয়। ১৯১৪-'১৮ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের অবসানে ইংলণ্ড প্রমুখ বিজয়ী মিত্রশক্তি তুরস্কের খলিফাকে পদচ্যুত করে। তাহার প্রতিবাদকল্পে মুসলিম জননায়ক মহম্মদ আলি, সৌকৎ আলি প্রভৃতির নেতৃত্বে খিলাফৎ আন্দোলনের সৃষ্টি হইল এবং মুসলিম সম্প্রদায় বৃটিশের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদান করিল। গান্ধী কংগ্রেসের কর্ণধার হইয়া খিলাফৎ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপোষ রফা করিলেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। বলিতে গেলে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির শেষ দিবস পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের এক-নায়ক ছিলেন।

খিলাফৎ আন্দোলন

গান্ধীজির নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র ভারত পরিব্যাপ্ত হয় এবং দেশমাতৃকার আহ্বানে বহু খ্যাতিমান ব্যক্তি স্ব-স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগদান করেন। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ 'গোলামখানা' নামে অভিহিত হয় এবং দেশের সর্ব্বত্র জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। গান্ধীজীর আন্দোলন সম্পূর্ণ বৈধ ও অহিংস ছিল

এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই আন্দোলন চলিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট দমন নীতি আরম্ভ করিলেন এবং নেতৃবর্গকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইতিমধ্যে চৌরীচৌরা নামক স্থানে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে একুশজন পুলিশ কর্ম্মচারী উন্মত্ত জনতার হস্তে নিহত হয়। গান্ধীজী এই হিংসা কার্য্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত খলিফা-কে পুনরায় তুরস্কের সিংহাসনে বসাইবার প্রত্যাশায় মুসলমান নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সমর্থন লাভের বিনিময়ে এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তুরস্কের জনসাধারণ খলিফাকে পদচ্যুত ঘোষণা করিয়া মুস্তাফা কামালের নেতৃত্ব তুরস্কের গণতন্ত্র ঘোষণা করিল। ইহাতে খিলাফৎ আন্দোলনের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিল এবং মুসলিম সম্প্রদায় কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া গেল। উপরন্তু আরব বংশসম্ভূত মোপ্‌লা নামে মালাবারের এক শ্রেণীর ধর্ম্মান্ধ মুসলমান ১৯২১-'২২ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হইয়া প্রতিবেশী হিন্দুদের উপর ধর্ম্মান্তরিতকরণ, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি নিষ্ঠুর আচরণ করে। অচিরেই এই বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। এই সকল বিভিন্ন কারণে গান্ধীজি তাহার ব্যর্থতা স্বীকার করিয়া আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হন।

গান্ধীজির ব্যর্থতা

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের অসারতা প্রতিপন্ন করার জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, এন্, সি, কেলকার প্রভৃতি কয়েকজনের নেতৃত্বে 'স্বরাজ্য পার্টি' গঠিত হয়। স্বরাজ্য দল নূতন সংস্কারের 'সংশোধন অথবা অবসান' (Mending or ending) ঘটাইবার উদ্দেশ্যে আইরিশ জন-নায়ক পার্ণেল অনুসৃত পন্থা গ্রহণ করিয়া নূতন সংস্কারানুযায়ী নির্ব্বাচনে যোগদান করে এবং সর্ব্বত্র আইন পরিষদে প্রবেশ করিয়া সরকারের বিরোধিতা দ্বারা অচল অবস্থার সৃষ্টি করে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অচল অবস্থা বর্ত্তমান ছিল।

স্বরাজ্য দল

জাতীয় আন্দোলন কিয়ৎকাল স্তিমিত থাকার পর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে "সাইমন কমিশন" নামে এক রাজকীয় কমিশন ভারতে প্রেরিত হওয়ার সঙ্গেই পুনরায় জাতীয় আন্দোলন কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিল। সম্পূর্ণ অ-ভারতীয় দ্বারা গঠিত সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইল। উপরন্তু বিদেশীর হস্তে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লাভের যোগ্যতা বিচারের ভার থাকা ভারতবাসী জাতীয় অবমাননা বলিয়া গ্রহণ করিল। সর্ব্বত্র সাইমন কমিশন বর্জ্জন করা হইল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের নির্দ্দেশে মতিলাল নেহেরু, তেজবাহাদুর সপ্রু প্রভৃতি কয়েকজন নেতা ভারতের জন্য উপযুক্ত শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। এই খসড়া 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে খ্যাত। নেহেরু রিপোর্ট ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস-কে ভারতের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থিত এক দল ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস-এ অসন্তুষ্ট হইয়া পূর্ণ স্বরাজ দাবি করিল এবং ইহারা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে সভাপতি ও জহরলাল নেহেরু ও সুভাষ চন্দ্রকে সেক্রেটারী করিয়া 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' নামে একটি উপদলের সৃষ্টি করিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে উভয় মতবাদের সংঘাত ঘটিলে মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপে তাহা প্রশমিত হয়। এই কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবানুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের চরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয়, কিন্তু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস' প্রদান করিলে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিবে বলিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দেওয়া হয়। ভারতের জনমত লক্ষ্য করিয়া তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন বৃটিশ সরকারের অনুমতিক্রমে ১৯২৯ সনের ৩১শে অক্টোবর এক ঘোষণা করেন যে 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস'-ই ভারতীয় সংস্কারের স্বাভাবিক পরিণতি। সাইমন কমিশনের সংস্কার প্রস্তাবনা (Report) প্রকাশিত হইলে সর্ব্ববাদীসম্মত ভিত্তিতে ভারত-শাসন সংস্কারের চেষ্টায় এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের উল্লেখও তাঁহার বিবৃতিতে ছিল।

সাইমন কমিশন, ১৯২৭

নেহেরু-রিপোর্ট

আরউইন-এর বিবৃতিতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস-এর কথা উল্লেখ থাকিলেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আরউইনের উক্তির সমর্থন করিল না, বরঞ্চ তাহা এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এই মনোভাবে কংগ্রেস বৃটিশের সদিচ্ছার উপর সন্দিগ্ধ হইয়া জহরলাল নেহেরু-র সভাপতিত্বে লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯) কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিল এবং প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান অনাবশ্যক বলিয়া মত প্রকাশ করিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী সমগ্র ভারতময় স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপিত হইল এবং উক্ত বৎসর ৩০শে এপ্রিল মহাত্মা গান্ধী 'সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স' বা আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। মডারেট দল, দেশীয় রাজ্যসমূহ ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৃহদংশ এই আন্দোলন হইতে পৃথক রহিল। গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলন দমনের জন্য সর্ব্ববিধ ক্ষমতা প্রয়োগ করিলেন। বিভিন্ন দমন-আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ইহাদের সাহায্যে দলে দলে লোক কারাগারে প্রেরিত হইল। নেতৃগণ সকলেই কারারুদ্ধ হইলেন, কিন্তু দেশব্যাপী অশান্তির অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না।

আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৩০-'৩১

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রতিনিধি ব্যতীত ভারতীয় সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া বিলাতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইতে থাকে। বৃটিশ সরকারের মনোনীত পার্লা-মেণ্টের সদস্যদের মধ্য হইতে ৩ জন প্রতিনিধি এবং ভারত হইতে ১৬ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি ও ৫৭ জন বৃটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া তদানীন্তন শ্রমিক নেতা ও প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সভাপতিত্বে এই বৈঠক বসে। কিন্তু কংগ্রেসকে বাদ দিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচনা নিরর্থক উপলব্ধি করিয়া প্রধান মন্ত্রী ভারতের সকল শ্রেণীর সম্মতি গ্রহণের সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া

প্রথম গোল টেবিল বৈঠক, ১৯৩০

গান্ধী-আরউইন-চুক্তি কংগ্রেসের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান

এক বিবৃতি দেন। তদনুসারে বড়লাট আরউইন কংগ্রেসের সহিত আপোষ করিয়া এক সর্ব্বজনসম্মত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে মাহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এক চুক্তি করেন। এই গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে বলা হয় যে বৃটিশ সরকারের সম্মতি অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইল যে গোলটেবিল বৈঠকে ভারত শাসন-তন্ত্র সম্পর্কে যে আলোচনা হইবে তাহাতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন, ভারতীয় স্বার্থে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহ, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও জাতীয় ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে বিহিত ব্যবস্থা সংরক্ষিত রাখিয়া ভারতবাসীদের শাসন ব্যাপারে দায়িত্ব প্রদান করা হইবে ;—ইহাই হইবে নূতন শাসন-পরিকল্পনার অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই চুক্তির ফলে গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন, গভর্ণমেণ্টও অর্ডিনান্স সমূহ বাতিল করিল এবং রাজনৈতিক বন্দীগণকে (হিংসাপন্থী বন্দিগণ ব্যতীত) কারামুক্ত করিল। অতঃপর কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মাজী ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে বিলাতে শ্রমিক-মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তে ন্যাশানেল মন্ত্রি সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই মন্ত্রিসভায় রক্ষণশীল দলের প্রাধান্য থাকায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং মহাত্মাকে রিক্ত হস্তে ব্যর্থমনোরথ হইয়া দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডন ভারতে আসিয়া পূর্ণোদ্যমে দমন-নীতি আরম্ভ করেন। অচিরেই মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হয়।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক, ১৯৩১

কংগ্রেসকে বাদ দিয়াই দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্য চলিতে থাকে। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের আলোচনার সময়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে একমত না হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড স্বয়ং এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইহা 'কম্যুনাল

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

এওয়ার্ড' বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নামে বিখ্যাত। ইহা দ্বারা মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খৃষ্টান, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায় প্রভৃতিকে আইন সভায় পৃথক নির্ব্বাচন কেন্দ্রের অধিকার প্রদান করা হয়। হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায় (Scheduled caste)-এর জন্যও পৃথক নির্ব্বাচনের বন্দোবস্ত হয়। হিন্দুসমাজকে বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত" হিন্দু এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থায় মহাত্মা গান্ধী প্রতিবাদ স্বরূপ যারবেদা জেলে অনশন আরম্ভ করেন। ইহাতে 'অনুন্নত হিন্দু' (গান্ধীজির ভাষায় 'হরিজন') এবং বর্ণহিন্দুর নেতৃবৃন্দ মিলিত হইয়া মহাত্মার অনশন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে পুনাতে এক চুক্তি করেন। এই পুনা-চুক্তির ফলে কতকগুলি বিশেষ সর্ত্তানুযায়ী উচ্চ ও অনুচ্চসম্প্রদায়ের হিন্দুদের একত্রে ভোট দিবার ব্যবস্থা হয়। উপরন্তু বর্ণহিন্দুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন হইতে অতিরিক্ত কয়েকটি আসন আইন সভায় 'তপশীলভুক্ত' হিন্দুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়। এই চুক্তি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মানিয়া লন। ইহাতে বর্ণহিন্দুদের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, মহাত্মা গান্ধী হিন্দুদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির প্রতিবাদ করিয়া প্রথমে অনশন করিলেও 'হরিজন'দের স্বার্থ-রক্ষার ব্যবস্থা হওয়াতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং এই ভেদনীতিকে মূলতঃ স্বীকার করিয়া লইলেন। সমগ্রভাবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মৌননীতি দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। ইহাকে স্বীকার করিলে যে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ভবিষ্যৎ আশঙ্কাপূর্ণ হয় ও তৃতীয় পক্ষের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় তাহা উপলব্ধি করিয়াও কংগ্রেস প্রধানতঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের তুষ্টির জন্য এই বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে এক অদ্ভুত "না গ্রহণ, না বর্জ্জন" (Neither acceptance nor rejection) প্রস্তাব গ্রহণ করিল। কংগ্রেসের এই দুর্ব্বলনীতির জন্যই পরিণামে প্রধানতঃ বাংলা ও পাঞ্জাব রাষ্ট্রনৈতিক কণ্টকিত সমস্যা প্রদেশে পরিণত হয় এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না।

পুনা-চুক্তি

ইহার পর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই শাসন সংস্কার সম্বন্ধে তাহাদের 'হোয়াইট পেপার' বা সুপারিশপত্র প্রকাশ করে। অতঃপর প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার সমালোচনার্থ পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ হইতে মনোনীত সদস্য লইয়া 'জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি'র অধিবেশন হয়। ভারতীয় দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ ভারতের কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণান্তে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। ইহার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন আইন লিপিবদ্ধ করা হয়।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে কার্য্যকরী হয়। নূতন সংস্কারের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব বিরূপ থাকিলেও কংগ্রেস নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং ছয়টি প্রদেশের আইন সভায় কংগ্রেস অন্য নিরপেক্ষ গরিষ্ঠতা লাভ করে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশেও সাধারণ আসন সমূহ কংগ্রেস সদস্যের দ্বারা অধিকৃত হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে গভর্ণরকে যে সমস্ত বিশেষ অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে মন্ত্রিসভার স্বাধীনভাবে কার্য্য করা অসম্ভব দেখিয়া কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব পদ প্রত্যাখ্যান করে এবং সর্ব্বত্র 'অন্তর্ব্বর্ত্তী' মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অতঃপর বড়লাটের তরফ হইতে অসাধারণ ক্ষেত্র ব্যতীত গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে না এই আশ্বাস প্রদত্ত হইলে কংগ্রেস ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রাদেশিক মন্ত্রিত্বভার গ্রহণ করে।

বলা বাহুল্য, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলেও কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, অথবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হয় নাই। প্রথমতঃ, দেশীয় নৃপতিবর্গ স্ব-স্ব অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা না করিয়া প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে চাহে নাই। দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ, কোন রাজনৈতিক দলই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য

বলিয়া বিবেচনা করে নাই। যাহা হউক, কংগ্রেস ক্রমশঃ বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ ব্যতীত অপর আটটি প্রদেশে ক্ষমতায় আসীন হইয়াছিল।

(গ) **দ্বিতীয় বিশ্ব-সমর ও স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্ব্ব ঃ—** ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করে। ভারত সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন কিছুটা ক্ষুন্ন করিয়াও সমগ্র ভারতের নিরাপত্তার জন্য কয়েকটি অর্ডিনান্স জারি করেন। বলা বাহুল্য, জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে বিনা পরামর্শেই এই সকল কার্য্য করা হইতেছিল। ইহাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয় এবং প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষের স্বাতন্ত্র্যের উপরেও হস্তক্ষেপের আশঙ্কা অনুভূত হয়।

এই সময়ে ভারতীয় জাতীয় মহাসভা ভারতের পক্ষ হইতে বৃটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে জানাইতে অনুরোধ করে। যে গণতন্ত্র ও মানবীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই যুদ্ধ ভারতে সেই গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি না পাইলে ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে না কংগ্রেস এই মনোভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো এক ঘোষণায় বৃটিশ সরকারের মনোভাব প্রকাশ করিলেন। এই ঘোষণায় বলা হইল, যুদ্ধান্তে বৃটিশ সরকার যথাসম্ভব শাসন সংস্কারের বন্দোবস্ত করিবেন এবং ভারতে ক্রমিক 'ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস' প্রতিষ্ঠাই বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য। অদূর ভবিষ্যতে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান সম্পর্কে বৃটিশ সরকার কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় কংগ্রেস বৃটিশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয় এবং ভারত সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের মনোভাবের প্রতিবাদ স্বরূপ প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল সমূহকে পদত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দেয়। এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী আটটি প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করে এবং এই সকল প্রদেশে গভর্ণর স্বয়ং কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

বৃটিশ মন্ত্রিসভা যখন বুঝিলেন, যে ভারতের অসন্তোষ দূর করা যুদ্ধ প্রচেষ্টার পক্ষে অপরিহার্য্য তখন নূতন সংস্কারের প্রস্তাবসহ স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রেরণ করিলেন। ২৯শে মার্চ্চ তাহার প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইল। তিনি বৃটিশ মন্ত্রি-সভার পক্ষ হইতে ঘোষণা করেন যে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস-এর মর্য্যাদা ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে। ভারতব্যাপী নূতন রাষ্ট্র সম্মেলন (New India Union) প্রতিষ্ঠাই মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি ভারতের এই অংশবিশেষ এ সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকৃত হয় তবে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে দেওয়া হইবে। ইহাতে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বাভাস ছিল। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের চরম কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকিবে এবং যুদ্ধান্তে একটি রাষ্ট্র-সংগঠনী সংসদের আহ্বান করা হইবে এই আশ্বাসও ইহাতে ছিল।

"ক্রিপস প্রস্তাব"

ভারতের নেতৃবৃন্দ প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদানের পূর্ব্বে যুদ্ধকালীন 'জাতীয় গভর্ণমেণ্টের' দাবী জানাইলেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দাবী অনেকটা কমাইয়া প্রস্তাব করা হইল যে সামরিক বিভাগ একজন ভারতীয় সদস্যের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। ভারতের প্রধান সেনাপতি সামরিক নীতি পরিচালনা সম্বন্ধে স্বাধীন থাকিবেন ; কিন্তু আইনতঃ তাহাকে সমরবিভাগের মন্ত্রীর অধীন থাকিতে হইতে। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন প্রস্তাবেই সম্মত না হওয়ায় ভারতবর্ষ বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য অন্যরূপ বুঝিতে পারিয়া ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ (স্পষ্টতঃ পাকিস্তান সৃষ্টির উল্লেখ নাই বলিয়া) উভয়েই ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে করিল না। অতঃপর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ইংরেজদিগকে ভারত পরিত্যাগ করিতে বলিলে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হইলেন। মহাত্মাজীর 'কুইট ইণ্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়' আন্দোলন সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইল। ভারতের সর্ব্বত্র বৃটিশ শাসন বিরোধী কার্য্যক্রম

অনুসৃত হইতে লাগিল। বহুস্থানে বৃটিশ শাসনের পরিবর্ত্তে জাতীয় শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। ইহা 'আগষ্ট বিপ্লব' নামে খ্যাত এবং ইহাকে একপ্রকার স্বতঃস্ফূর্ত্ত গণ-বিপ্লব বলা যায়। বৃটিশ সামরিক শক্তির সাহায্যে এই আন্দোলন চূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করে এবং এই আন্দোলন দমনের জন্য বৃটিশ দেশবাসীর উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার করে তাহার তুলনা নাই। ফলে এই আন্দোলন দমিত হইলেও তাহারা দেশবাসীর সহানুভূতি ও বিশ্বাস হারাইল।

১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লব

ইতিমধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পূর্ব্ব-এশিয়ায় আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইল এবং আজাদ বাহিনী ভারতভূমি হইতে বৃটিশ ও তাহার মিত্রপক্ষকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশ ধরিয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইল। আজাদ বাহিনীর বীরত্ব ও সাহসের সম্মুখে বৃটিশের সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাৎপদ হইতে হইল। মনিপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আজাদ বাহিনীকে দৈবদুর্য্যোগের জন্য পশ্চাদপসরণ করিতে হইল। কিন্তু ইহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল না। আজাদ বাহিনী যে স্বদেশপ্রেমিকতা ও শৌর্য্যের পরিচয় দিল তাহাতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিল যে তাহাদের ভারত ত্যাগের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। আগষ্টের গণ-বিপ্লব ও আজাদ হিন্দ ফৌজের 'দিল্লী চলো' অভিযান ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ প্রতিষ্ঠাটুকু চূর্ণ করিল।

নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ

যুদ্ধান্তে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের জন্য কোন সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইল না। ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ জিন্নার মধ্যে তিন সপ্তাহব্যাপী আলোচনা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও হিন্দু মুসলমান সমস্যার কোন

ওয়াভেল প্রস্তাব

সমাধান হইতে পারে নাই। লর্ড ওয়াভেলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে নূতন নির্ব্বাচনের ফলে বিলাতে মিঃ এটলীর নেতৃত্বে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে এটলী মন্ত্রিসভা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতীয় সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিবর্গ ও সৈনিকদের বিচার দিল্লীর লাল-কেল্লায় চলিতেছিল। কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ সমর্থন করিলে সমগ্র ভারতময় কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম দিকে ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস বাংলা ও সিন্ধু ব্যতীত অপর সমস্ত প্রদেশে জয়লাভ করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠন করিল।

ক্যাবিনেট মিশন

১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ সরকার ভারতে নব শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য এবং তৎসম্পর্কে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে এক বৃটিশ মন্ত্রী-মিশন (Cabinet Misson) প্রেরণ করে। মন্ত্রী মিশনের তিনজন সদস্য পেথিক লরেন্স, ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ও এ, ভি, আলেকজাণ্ডার, ভারতবর্ষে আসেন এবং অতঃপর কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও মন্ত্রী মিশনের মধ্যে ত্রিদলীয় সম্মেলন আরম্ভ হয়। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এতৎ সত্ত্বেও মন্ত্রী মিশন তাহার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন এবং ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনা-কারী একটি গণ-পরিষদের প্রস্তাব করে। যে পর্য্যন্ত না ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া কার্য্যকরী হয় ততদিনের জন্য ভারতবাসীদের লইয়া একটি অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠনের প্রস্তাবও মন্ত্রী মিশন করেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে গণ-পরিষদের নির্ব্বাচন হয়। গণ-পরিষদের ২৯৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২১১টি অধিকার করিল—মুসলিম লীগ মাত্র ৭৩টি আসন দখল করিল। গণ-পরিষদে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখিয়া ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে মুসলীম লীগ ঘোষণা করিল, মুসলীম লীগ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত নহে। এতদ্ব্যতীত

মুসলীম লীগ অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত করিয়া প্রস্তাব ঘোষণা করিল। কিন্তু কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সমস্ত সর্ত্তগুলির অনুমোদন না করিলেও অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। মুসলীম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাহায্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদিগকে নির্দ্দেশ দিল। এই নির্দ্দেশের ফলে কলিকাতা, পূর্ব্ব বাংলা ও পাঞ্জাবে ভ্রাতৃ-মেধযজ্ঞ আরম্ভ হইল। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে শত শত ব্যক্তি নিহত হইল ও কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইল।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রে অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। অক্টোবর মাসে মুসলীম লীগ অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করে। লীগের সদস্যেরা অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে সতর্ক প্রহরী-রূপে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মিঃ জিন্না ঘোষণা করিলেন এবং গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য দাবী জানাইলেন। যখন লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সকল আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা নিস্ফল হইল, তখন নব নিযুক্ত বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বৃটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভারত বিভাগের পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন (৩রা জুন, ১৯৪৭)। এই পরিকল্পনানুযায়ী স্থির হইল যে, পশ্চিমে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের এবং পূর্ব্বে বাংলা ও আসামের ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের অধিকাংশের মত হইলে এই প্রদেশগুলি ভারতীয় ইউনিয়নে থাকিবে। অন্যথা এই কয়েকটি প্রদেশ লইয়া পাকিস্তান ডোমিনিয়ান গঠিত হইবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের উপর এই বিষয়ের মীমাংসার ভার প্রদত্ত হয় নাই। বলা বাহুল্য এই প্রদেশ মুসলিম গরিষ্ঠ হইলেও ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এই স্থানে গণ-ভোটের দ্বারা বিষয়টির মীমাংসার ভার প্রদত্ত হইল। এই সময় আরও স্থির হয় যে, পাঞ্জাব ও বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য পাকিস্তানের অনুকূলে মত দিলে পঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু প্রধান অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ ইচ্ছা করিলে অধিকাংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানে যোগদান না

করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নে থাকিতে পারিবেন। আসাম ভারতীয় ইউনিয়নে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মুসলমানবহুল শ্রীহট্ট জেলা গণভোটের দ্বারা পাকিস্তান বা ভারতে যোগদান করিতে পারিবে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন গৃহীত হইল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষ দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইল। উপরোক্ত নীতি অনুসারে বঙ্গ ও পাঞ্জাব বিভক্ত হইল—শ্রীহট্ট জেলা পূর্ব্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারত এক সার্ব্বভৌম গণ-শাসিত সাধারতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টের এক আইন দ্বারা ভারতের নূতন মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

(২) ভারত বিভাগের কাহিনী

মুসলিম সম্প্রদায়ের অনগ্রসরতা ঃ—ঔরংজীবের মৃত্যুর পরে পরবর্ত্তী কয়েকজন অপদার্থ সম্রাটের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে মারাঠা ও শিখদের হাতে চলিয়া যায়। বৃটিশ শক্তিকে শেষ বোঝাপড়া করিতে হয় ইহাদের সঙ্গেই। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ সাল এই এক শতাব্দীর মধ্যে কোন দুর্দ্ধর্ষ মুসলিম শক্তি ইংরেজের ভারত অধিকারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে নাই। বৃটিশ শক্তিকে ভারতবর্ষ হইতে উৎখাত করার জন্য উল্লেখযোগ্য আন্দোলন—১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান বৃহত্তর অংশ গ্রহণ করে নাই, শুধু যে-ব্যক্তিকে সম্রাট ঘোষণা করিয়া 'বিদ্রোহী'-রা কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় তিনি মুসলমান এবং মুঘল বাদশাহের বংশধর ছিলেন। তথাপি যে কারণেই হোক—সিপাহী বিদ্রোহের জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষের আক্রোশটা পড়িয়াছিল নাকি মুসলমানদের উপরই। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বেশীর ভাগ সময়ই রাজ-শক্তি মুসলিম রাজনৈতিক স্বার্থের বশেষ অনুকূল ছিল না। এদিকে মুসলিম

সম্প্রদায়ের মনেও অপর পক্ষ সম্বন্ধে বিদ্বেষ কোন প্রকারেই মুছিয়া যায় নাই। মুসলিম সম্প্রদায় যতই হীনবীর্য্য হইয়া পড়ুক না কেন, কিছুদিন আগেও রাজশক্তি যে তাহাদের হাতে ছিল এ সম্বন্ধে তাহারা সচেতন ছিল। ইংরেজও সে কথা ভুলিতে পারে নাই।

ইংরেজ-অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান-সম্প্রদায় ইতিপূর্ব্বে যে উচ্চপদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাহা হারাইতে লাগিলেন। ১৮৩৫ সাল হইতে শিক্ষা দীক্ষা, আইন-আদালতের কাজকর্ম্ম ইত্যাদি ফারসী ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজীভাষা দখল করিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলও মুসলমানদের অনুকূল হইল না। হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিলেন কিন্তু মুসলমানগণ তাহা বর্জ্জন করিলেন; নূতন ভাষা, নূতন শিক্ষা, নূতন ব্যবস্থা অস্বীকার করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকাই মুসলনমান সমাজ স্থির করিলেন। ফলে মুসলমানগণ অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ হইয়া রহিলেন।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ ও বৃটিশ-প্রীতি অর্জ্জনের প্রচেষ্টা :— আনুমানিক ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে বৃটিশশক্তি মুসলিম-বিদ্বেষের নীতির পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। হাণ্টার প্রমুখ ইংরেজ গ্রন্থকার এবং রাজপুরুষগণ মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি আরম্ভ করিলেন এবং মুসলমানদের মন হইতে বৃটিশ বিরোধিতা দূর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বৃটিশ শাসনের অনুকূলে তাহাদিগকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। ইহাদের চেষ্টা তিনটি কারণে অচিরেই ফলবতী হইল। প্রথমতঃ এই রাজপুরুষদের আনুকূল্য; দ্বিতীয়তঃ, স্যার সৈয়দ আহম্মদের উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম; এবং তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্য-শিক্ষায় অগ্রসর হিন্দুদের স্বাজাত্যবোধ এবং স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন জনিত বিদেশী শাসকের হিন্দু-বিদ্বেষ এবং মুসলমান প্রীতির ফলে।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ মুসলমান সমাজের বৃটিশ বিরোধিতা ও পাশ্চাত্য-শিক্ষায় বিমুখিতা দূর করার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি একখানি

গ্রন্থ রচনা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যে ধর্ম্মসম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানগণ বৃটিশ বিরোধী নয়। মুসলমানদের শিক্ষার জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে আলিগড়ে 'মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ' নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। মিণ্টার বেক নামে একজন ইংরেজ ইহার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং এই বেক সাহেবই মুসলিম-ভেদবাদের বীজ সৈয়দ আহম্মদের মনে প্রবেশ করাইয়া দেন। প্রথম দিকে স্যার সৈয়দ প্রচার করিয়াছেন যে হিন্দু-মুসলমান এক জাতি—ভারতমাতার দুইটি চোখ। কিন্তু শেষ দিকে অনেকটা বেক সাহেবের প্ররোচনায় মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলেন এবং বৃটিশ বিরোধী হিন্দুদের সঙ্গে মিশিতে নিষেধ করেন। ১৮৮৫ সালে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলে কিছু সংখ্যক মুসলমান ইহার বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্রমবর্দ্ধমান কংগ্রেস প্রীতি স্যার সৈয়দ প্রীতির চোখে দেখিলেন না—তিনি মুসলমানদিগকে এই বলিয়া সাবধান করিতে লাগিলেন যে—বৃটিশ বিরোধী কংগ্রেসে যোগদান করিয়া মুসলমানেরা ইংরেজের অনুগ্রহরূপ শ্যাম এবং শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতিরূপ কূল দুইই হারাইবে। স্যার সৈয়দের ভেদনীতি একেবারে ব্যর্থ হয় নাই—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য থাকায় মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য বোধ জাগানো অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহম্মদ মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদ হইতে দূরে থাকিতে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা আংশিকভাবে মাত্র সফল হইয়াছিল। কংগ্রেসে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মুসলমান নেতার অভাব ছিল না। মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে প্রথম দিকে স্যার সৈয়দ আহম্মদ এবং শেষ দিকে মহম্মদ আলি জিন্না মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেস বর্জ্জন করে তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রথম দিকে বদরুদ্দিন তায়েবজী, রহমতুল্লা সায়ানি, মীর হুমায়ুন জা, আলি মহম্মদ ভীমজী এবং শেষ দিকে হাকিম

আজমল খাঁ, ডাক্তার আনসারি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ খ্যাতনামা মুসলমানগণ কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিয়াছেন।

বৃটিশের মুসলিম তোষণ-নীতি ঃ—কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার পর হইতে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ দ্রুত প্রসার পাইতে লাগিল। ইহার ফলে ইংরেজ রাজপুরুষগণ নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিল। তাহারা জাতীয়তাবাদের প্রভাব খর্ব্ব করার জন্য চিন্তা করিতে লাগিল। তখন ভারতের জাতীয়তা-বাদের নেতৃত্ব ছিল বাঙ্গালী হিন্দুর হাতে। বাঙ্গালী হিন্দুকে পঙ্গু করিয়া জাতীয়তা-আন্দোলনকে ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জ্জন শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যবিধানের অজুহাত দেখাইয়া বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পন্ন করিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিহারের সহিত যুক্ত হইলে বাংলাভাষীরা (অধিকাংশই হিন্দু) সংখ্যায় হীন হইবে এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম একত্রিত হইলে সেই প্রদেশেও বাঙ্গালী হিন্দু সংখ্যালঘু হইবে। লর্ড কার্জ্জন পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেন যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম লইয়া যে নূতন প্রদেশ গঠিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য একটি মুসলমান-প্রধান প্রদেশ গঠিত করা এবং এই নূতন প্রদেশে মুসলমানদের বিশেষ সুখ সুবিধা দেওয়াই হইবে সরকারের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। মুসলমান সম্প্রদায়ের এক শ্রেণী বৃটিশের এই মুসলিম-তোষণ নীতির সুযোগ গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিল না। তাঁহারা অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে বুঝাইতে লাগিল যে, হিন্দুরা তাহাদের স্বার্থ নষ্ট করিতেছে এবং তাহারা হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র। এই প্রচারের ফল অচিরেই ফলিল। দীর্ঘকাল হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করার ফলে উভয়ের মধ্যে যে হৃদয়ের এবং সংস্কৃতির যোগা-যোগ হইয়াছিল তাহা নষ্ট হইতে চলিল। ইংরেজরা রাজনৈতিক প্রয়োজনে অনেক ক্ষীয়মান প্রথা ও ধর্ম্মগত অনৈক্যবোধকে পুনর্জ্জীবিত করিল। ইতি-পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা খুব অল্পই বাধিয়াছে—সিয়া-সুন্নী দাঙ্গা সংখ্যায় এবং তীব্রতায় তাহার চেয়ে অনেক বেশী হইয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং তদপেক্ষা বেশী বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হইতে হিন্দু-

মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতের রাজনৈতিক জীবনের প্রায় অঙ্গ হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মগত বিভিন্নতাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে দাঙ্গার আকার দেওয়ার দায়িত্ব আজ অনেকাংশে ইংরেজকে স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দু এবং মুসলমান যে পৃথক জাতি, এই কথাটি প্রথম ইংরেজই রচনা এবং প্রয়োগ করিয়াছে। তাহার কূটনীতি সার্থক হইয়াছে যখন মুসলমান নেতারাও ইংরেজের কথা স্বীকার করিয়া পৃথক জাতির ধ্বজা উড়াইয়াছেন।

তখন পর্য্যন্ত বৃটিশের অনুগত কোন মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। কংগ্রেস ক্রমশঃ যেরূপ বৃটিশ বিরোধী হইয়া উঠিতেছিল তাহাতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দাঁড় করাইবার প্রয়োজন হইল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট মিণ্টোর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইঙ্গিতে আগা খাঁ-র নেতৃত্বে মুসলমান প্রতিনিধি দল মিণ্টোর নিকট ভবিষ্যৎ শাসনসংস্কারে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনের দাবি করিল। বলা বাহুল্য তাহাদের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দাবি স্বীকৃত হইল। ভারতের জাতীয়তা আন্দোলনকে ব্যাহত করিবার জন্য এই ভাবে জাতীয়তা এবং কংগ্রেস বিরোধী মুসলমান দলের গোড়াপত্তন করা হইল। এই বৎসরই বৃটিশের অনুরক্ত মুসলিম লীগ নামে একটি মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। এই বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা ভারতে বৃটিশ আধিপত্য বজায় রাখার কায়েমী ব্যবস্থা হইল। ভারতে বৃটিশ শাসনের একটা পদ্ধতি ছিল এই যে, শাসন কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য যে ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ কাম্য মনে করিতেন সেই ব্যবস্থার দাবি ভারতেরই কোন এক সম্প্রদায়ের লোক দিয়া করাইতেন। ভাবটা এই যে, এই দাবি ভারতবাসীদের দাবি, তাহাদের নিকট হইতেই আসিয়াছে—বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ বিচারক মাত্র। এই দাবি যত অল্পসংখ্যক ভারতবাসীই উত্থাপন করুন না এবং তাহাদের কণ্ঠ যতই ক্ষীণ হোক না কেন রব উঠামাত্রই তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষ তাহাকে স্বীকার করিয়া

লইতেন। স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রস্তাব, হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতার সুবিধা লইয়া 'তপশীলি' হিন্দু সৃষ্টি, এমন কি পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনেও অদৃশ্য বৃটিশের হস্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।

কংগ্রেসের মনোভাব ও আচরণ :—এই স্বতন্ত্রনির্ব্বাচন প্রথা ভবিষ্যৎ বিষবৃক্ষের বীজ রোপন করিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শাসনসংস্কারের ব্যবস্থা হইতে এই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের সূত্রপাত হয় কিন্তু ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ তথা কংগ্রেস ইহার বিরুদ্ধে তেমন দৃঢ় প্রতিবাদ করে নাই—সম্ভবতঃ মুসলমান সমাজ ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হয় এই ভয়ে তাহারা ইহার বিরুদ্ধে তীব্র-ভাবে আন্দোলন চালাইতে পারে নাই। ১৯১১ সালে যখন বিভক্ত বঙ্গদেশ পুনরায় জোড়া দেওয়া হইল তখন এমনভাবেই নূতন বঙ্গ সৃষ্টি করা হইল যাহাতে বাংলার মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়। জাতীয় আন্দোলনের প্রথমাবধি বঙ্গদেশ জাতীয়তার ব্যাপারে নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছিল এবং হিন্দুরাই বঙ্গদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। বর্ত্তমান নূতন ব্যবস্থায় ইংরেজ কূটনীতিকগণ এমনভাবেই বাংলাদেশ গঠন করিলেন যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের বীজ তাহাতে থাকিয়া যায়। কংগ্রেস ইংরেজের এই চাল ধরিতে পারিল না। কূটনীতিতে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতারা প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বৃটিশ রাজনীতিক-গণের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন।

ভারতের জাতীয়তা আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বৃহৎ অংশ ও উক্ত সমাজের বহু শীর্ষস্থানীয় নেতা প্রথমাবধিই বৃটিশের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং বৃটিশ প্রবর্ত্তিত স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করিয়াছে। বলা বাহুল্য মহম্মদ আলি জিন্না এই সময়ে কংগ্রেসে ছিলেন এবং স্বতন্ত্রনির্ব্বাচন-প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯১২ সালের পর হইতে স্বতন্ত্রবাদীরাও নানা কারণে বৃটিশ বিরোধী হইয়া পড়ে এবং মুসলমানদের এই বিরোধিতা ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত তীব্রভাবে চলে। এই বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবের পশ্চাতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের জন্য

আগ্রহ অপেক্ষা বৃটিশের তুরস্কনীতিই অধিক দায়ী ছিল। তুরস্কের স্থলতান ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের অতিমান্য 'খলিফা' বা ধর্ম্মগুরু। ১৯১২ সালে 'বল্কান যুদ্ধে' ইটালীর হাতে তুরস্কের সমূহ ক্ষতি হয়, তুরস্ক ত্রিপোলী হারায় এবং তুরস্ক সাম্রাজ্য যাহাতে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায় সে উদ্দেশ্যে বৃটিশের বহু দুষ্কার্য্যের কথা ভারতীয়দের কর্ণগোচর হয়। অতঃপর প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তুরস্ক ইংরেজদের শত্রুপক্ষে যাওয়ার ফলে মুসলমানদের ইংরেজদের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া গেল। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমান ও কংগ্রেসের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাইল এবং অবশেষে উভয়ের চেষ্টায় ভারতের শাসনসংস্কার সম্বন্ধে একটা সম্মিলিত দাবি খাড়া করা হইল। সাম্প্রদায়িক যে চুক্তির ভিত্তিতে এই দাবি পেশ করা হইয়াছিল তাহা ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে নিষ্পন্ন হইয়াছিল এবং ইহা লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তিদ্বারা মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা স্বীকৃত হইল। জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানদের সহযোগিতা লাভ করার জন্যই উক্ত প্যাক্ট বা প্রশ্রয় দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। যুদ্ধান্তে যখন তুরস্কের খলিফা ও স্থলতান বৃটিশের দ্বারা গদিচ্যুত হয় তখন ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তাহাদের ধর্ম্মগুরুর অবমাননায় তীব্রভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং সম্প্রদায়গতভাবে ইংরেজ বিরোধী হইয়া উঠে। ভারতীয় মুসলমানগণ খলিফা-কে তুরস্কের গদিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে যে দলবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ করে তাহা 'খিলাফত-আন্দোলন' নামে খ্যাত। কংগ্রেস মুসলমান-দের এই ইংরেজ বিদ্বেষের স্থযোগে তাহাদিগকে জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করিল এবং বিনিময়ে তাঁহাদের খিলাফত-আন্দোলনকে সমর্থন করার প্রস্তাব করিল। বলা বাহুল্য জাতীয়তাবাদী এবং খিলাফত-আন্দোলনকারীদের শত্রু বিভিন্ন না হইলেও উভয়ের প্রেরণা জোগাইয়াছে বিভিন্ন বস্তু—খিলাফতদের নিকট ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল মুখ্য এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছিল গৌণ। এই সময়ে মুসলমানদের মনে ইংরেজবিদ্বেষ যেমন তীব্র ছিল

এমন আর কাহারও মনে ছিল না। কংগ্রেস গান্ধীজির পরামর্শে ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিল এবং গান্ধীজির পরামর্শেই খিলাফত আন্দোলনকারিগণও অসহযোগ নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু খাস তুরস্কের জনসাধারণই সুলতান-খলিফাকে চাহিল না—১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কবাসীরা খলিফা পদই উঠাইয়া দিল—অর্থাৎ ধর্ম্মগুরু এবং রাষ্ট্রপতি, খলিফা এবং সুলতান এই যুক্তপদ চিরতরে উঠিয়া গেল। ইহার পরে খিলাফত আন্দোলনের প্রশ্ন অর্থহীন হইয়া গেল এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে আবহাওয়া দেশে বহিতেছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়া গেল। অতঃপর ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন থামিয়া যাওয়াতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ আরম্ভ হইল এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

কংগ্রেস প্রথমাবধি বৃটিশের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে দলে টানিবার জন্য মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদীদের অসঙ্গত দাবির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্যবাদীদের দলের মধ্যে একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল মুসলিম লীগ। এই প্রতিষ্ঠান যে জাতীয় আন্দোলন হইতে মুসলমানদিগকে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের ইঙ্গিতে সৃষ্ট এবং ইংরেজদের প্রশ্রয়পুষ্ট তাহা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস বা মুসলমানদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে নবাব-খাঁ বাহাদুর-জমিদার শ্রেণী ব্যতীত মুসলিম জনসাধারণের কোন সংযোগ ছিল না। প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক এবং জাতীয়তাবাদী' মুসলিম 'প্রতিষ্ঠান বলিতে 'সিয়া রাজনৈতিক সম্মেলন,' সীমান্তের 'খুদাই খিদমৎগার' পাঞ্জাবের অহ্‌র পার্টি', বাংলার 'কৃষক প্রজা দল', মোমিন দল প্রভৃতিকে বোঝায়। ভারতবর্ষে যখনই কোন জাতীয়তার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তখনই মুসলিম লীগ ব্যতীত অন্য সকল মুসলিম প্রতিষ্ঠান হিন্দুদের পার্শ্বে আসিয়া যোগদান করিয়াছে। পাকিস্তান স্রষ্টা মহম্মদ আলি জিন্নাও ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি নিজে কোন বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন নাই।

১৯২০ সালে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে জিন্না কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন। ভারতের জাতীয়তাবাদীদের শ্লেষ করিয়া বলা হইত যে ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারায় বৃটিশের পক্ষে কোন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করার অসুবিধা হইতেছে। এই সাম্প্রদায়িক ঐক্য আনয়ন করার জন্য কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে 'তোষণ নীতি' আরম্ভ করিল। যদি মুসলমানগণ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করে তাহা হইলে তাহা-দিগকে চাকুরী ক্ষেত্রে ও ব্যবস্থা পরিষদে সংখ্যানুপাতের অধিক চাকুরী ও আসন দেওয়া হইবে। এই তোষণনীতি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট হইতে সূত্রপাত হয় এবং পরিশেষে পাকিস্তান সৃষ্টিতে পরিসমাপ্ত হয়। মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ অধিকার লাভের সুযোগ পাইয়া ক্রমশঃ তাহাদের দাবি চড়াইতে থাকে। যে জিন্না সাহেব ১৯৩০ সালে কেন্দ্রে মাত্র এক তৃতীয়াংশ আসন পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিবেন তিনিই ১৯৪০ সালে 'পাকিস্তান' বা স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি করিয়া বসিলেন। এই তোষণ নীতি কংগ্রেসের অন্যতম দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলিম লীগ প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল—১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে ইহা যথেষ্ট সক্রিয় হইয়া দাঁড়াইল। নূতন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকদ্বয়ে আলোচিত হওয়ার সময়ে বৃটিশের ইঙ্গিতে মুসলিম লীগ এমন সমস্ত অসঙ্গত দাবি উপস্থাপিত করিতে আরম্ভ করিল যে নূতন সংস্কার প্রস্তাব বানচাল হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে লীগের নেতা জিন্না সাহেবের 'চৌদ্দ দফা' দাবি উল্লেখযোগ্য। প্রদেশে ও কেন্দ্রে আসন বণ্টন লইয়া হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে অনৈক্য উপস্থিত হয় তাহার সমাধানের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত (Communal Award) ভারতের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয়। এই সিদ্ধান্তে মুসলমানদিগকে তাহাদের প্রাপ্যের অধিক আসন দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় বাংলাদেশই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা হয়। এই অসঙ্গত সিদ্ধান্ত

কংগ্রেস অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় ডাক্তার আনসারি প্রমুখ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাও সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে তাহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিবেন এই ভয় দেখাইলে কংগ্রেস ইহা বর্জ্জনও করিলেন না, গ্রহণও করিলেন না। কংগ্রেসের এই মৌন সম্মতির ফলে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের পথ প্রশস্ততর হইল এবং বঙ্গদেশকে সাম্প্রদায়িক সমস্যায় বলিদান করা হইল।

কংগ্রেসের এই রাজনৈতিক ত্রুটির বিষময় ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। দেশময় সাম্প্রদায়িক বিষ ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ১৯৩৭ সালে যখন নূতন শাসনতন্ত্রানুযায়ী নির্ব্বাচন হইল তখন কংগ্রেস বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আসাম ব্যতীত সর্ব্বত্র একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিল ও সর্ব্বত্র কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করিল। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লীগকে হারাইয়া জয়ী হয়। কিন্তু এই দলের পক্ষে একক মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া ইহার নেতা ফজলুল হক যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেসের সহযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস সহযোগিতা না করিলে তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বাধ্য হইবেন ইহাও স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস হক সাহেবকে কোন প্রকার সাহায্য বা সমর্থনের ভরসা দেয় নাই। ফলে লীগসভ্যদের লইয়াই হক সাহেব প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং বাংলাদেশ ক্রমে ক্রমে লীগের কবলে পতিত হয়। এই হক সাহেবই অবশেষে অনেকটা কংগ্রেসের আক্রমণ হইতে মন্ত্রিসভাকে রক্ষার জন্য লীগকে আকড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে শক্তিশালী করেন এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নির্ব্বাচনের পরেই কৃষক-প্রজাদলের সঙ্গে কংগ্রেস যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করিলে বাংলাদেশে লীগ প্রাধান্য হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই হইত। একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে পাকিস্তান সম্ভব হইয়াছে অনেকাংশে বাংলার জন্য। বাংলাদেশে লীগের প্রাধান্য ও সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

১৯৪৬ সালে নির্ব্বাচনের পরে বাংলাদেশেই লীগ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়াছিল এবং একমাত্র এই দেশেই দৃঢ়ভাবে লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনের উপর ভিত্তি করিয়াই বৃটিশের ক্ষমতা-হস্তান্তরের প্রকৃতি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

কৃষক প্রজাদলের সঙ্গে লীগের যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের কিছুকাল পরে কংগ্রেস নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছিল। লীগের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে কৃষক প্রজাদলের নেতা হক সাহেব আর সম্মত হইলেন না। পাঞ্জাবেও লীগের প্রাধান্য ছিল—সেখানে কংগ্রেসের পরাজয় হইলেও লীগ বিরোধী ইউনিয়নিষ্ট দল স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খানের নেতৃত্বে হিন্দু ও মুসলমানের যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে লীগ অনেকাংশে সাফল্যলাভ করিলেও লীগ-বিতাড়িত ইউনিয়নিষ্ট নেতা মালিক খিজির হায়াৎ খানের নেতৃত্বে কংগ্রেস, ইউনিয়নিষ্ট এবং শিখদলের যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের নির্ব্বাচনের পরেই যদি ছয়মাস অপেক্ষা না করিয়া অবিলম্বে রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করিবার চেষ্টায় যেখানে সেখানে সম্ভব অন্যান্য, এমন কি প্রয়োজন হইলে সাম্প্রদায়িক দলগুলির সহযোগে মন্ত্রিসভা গঠন করিত তাহা হইলে হয়তো পরিণামে ভারত বিভক্ত হইত না।

আজ মনে হয়, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতবর্ষীয় মিত্রপক্ষীয়েরা রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করিয়া জাতির ভবিষ্যৎ যাহাতে ব্যাহত বা ক্ষতিগ্রস্ত না করিতে পারে সেইজন্য রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করিয়া যতখানি সম্ভব নিজেদের অধিকারে রাখার নীতিগ্রহণ করাই কংগ্রেসের কর্ত্তব্য ছিল। লোকমান্য তিলকেরও এই মত ছিল। কিন্তু গান্ধীজি এই নীতি গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য দেশবন্ধু দাস ১৯২৩ সালে গান্ধীজির ব্যবস্থাপক পরিষদ বর্জ্জন নীতি পরিহার করিয়া স্বরাজ্য দল গঠন করেন এবং দ্বৈতশাসন সংস্কার অথবা

ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। এবারেও ১৯৩৭ সালের পূর্ব্বেই কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি গ্রহণ করেন। অথচ নির্ব্বাচনের পরে জয়লাভ করিয়াও খুঁটিনাটি ত্রুটির অজুহাতে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বিলম্ব করে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কংগ্রেস ১৯৩৯ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদে সর্ব্বত্র প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছে—অথচ কুইট ইণ্ডিয়া দাবি জানাইয়া সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে ১৯৪২ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে। এই তিন বৎসর কাল সর্ব্বত্র রাষ্ট্রশক্তি কংগ্রেস বিরোধীদের হাতে না ছাড়িয়া দিলেও চলিত। ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত অবশ্য কোন উপায় ছিল না, অন্ততপক্ষে আসামে এবং সীমান্ত প্রদেশে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা রাখা সঙ্গত ছিল বলিয়া মনে হয়। যে সমস্ত প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সভ্যগণ অধিকাংশ আসনের অধিকারী হইয়াছিলেন সে সমস্ত প্রদেশে তাহাদের ক্ষমতা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল সেই সমস্ত প্রদেশে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত মন্ত্রিসভা আকড়াইয়া না থাকায় কংগ্রেসের এবং দেশের ক্ষতিই হইয়াছে মনে হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে উপজাতি অঞ্চলে মুসলিম লীগের যেটকু প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে—সেটুকু সম্ভব হইয়াছে ১৯৩৯ সালের পর লীগ মন্ত্রিসভার সাহায্যে।

কংগ্রেস এইরূপ অতিরিক্ত আদর্শবাদী হওয়ায় মুসলিম লীগের স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সুবিধা হইয়াছে। ১৯০৬ হইতে ১৯০৭ সালের মধ্যে লীগ কখনও রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আন্তরিকতার সঙ্গে সংগ্রাম ঘোষণা করে নাই বা সংগ্রাম চালায় নাই। খিলাফত আন্দোলনের সময় লীগ মুসলমানগণ তাহাতে সর্ব্বতোভাবে যোগদান করে নাই। এই সময়ে লীগ প্রায় অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িয়াছিল বলিলেই চলে। সংগ্রামশীল মুসলমানগণ খিলাফত কনফারেন্সের অথবা জমিয়ৎ-উল-উলেমার সভ্য ছিলেন। লীগে বরাবরই উচ্চশ্রেণীর বিত্তশালী রাজভক্ত ব্যক্তিরা নেতৃত্ব করিয়াছেন।

অবশেষে যখন জিন্না সাহেব লীগের সর্ব্ববাদীসম্মত নেতা হইলেন তখন তাঁহার আর পূর্ব্বের ইংরেজবিরোধী জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী মনোবৃত্তি ছিল না। বৃটিশ স্বার্থের সঙ্গে মুসলিম স্বার্থের বহুল পরিমাণে ঐক্যবোধের উপর লীগ রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে পূর্ব্বতন রাজভক্ত লীগ-নেতাদের সগোত্র হিসাবেই জিন্না সাহেবকেই ধরিতে হইবে। যে অলিখিত মৈত্রীর বলে মুসলিম লীগ পূর্ব্বাপর যাহাই চাহিয়াছে তাহাই পাইয়াছে সেই মৈত্রী জিন্নার আমলে মোটেই শিথিল হয় নাই, বরং আরও দৃঢ় হইয়াছে। এই কারণেই মুসলিম লীগ এত সহজেই এত সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। ইংরেজরা বরাবরই মুসলিমদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে একমাত্র লীগকে স্বীকার করিয়াছে অবশেষে জিন্না সাহেবই সেই স্বীকারোক্তি কংগ্রেসের নিকট হইতেও বারবার দাবি করিয়াছে ; সেই জন্যই মুসলমানদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলি কংগ্রেস বা ইংরেজের দ্বারা অবহেলিত হইয়াছে। জিন্না সাহেবের নীতির অভাবনীয় সাফল্যের বিবিধ হেতুর মধ্যে একটি হইতেছে জিন্না সাহেবের কূটবুদ্ধি। দুঃখের বিষয়, তুলনায় কংগ্রেস পক্ষের রাজনৈতিক চতুরতা এবং দূরদৃষ্টির অভাবই লক্ষিত হইয়াছে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একদিকে মুসলিম লীগকে মন্ত্রিসভায় স্থান না দিয়া মুসলিম জনসংযোগ নীতি প্রচার করা হইয়াছে—অন্যদিকে জিন্নার সঙ্গে বারংবার আলাপ আলোচনা চালাইয়া তাঁহার সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের প্রতি পরোক্ষ মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। মুসলিম সমস্যা সম্বন্ধে দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতা দেখাইতে কংগ্রেস বারবার অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে। জাতীয়তাবাদী কয়েকজন মুসলমান কংগ্রেসের মধ্যে বরাবর থাকায় কংগ্রেস মুসলিম সমস্যাকে প্রথম দিকে উপেক্ষা করিয়াছে ; শেষের দিকে সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট লীগকে অতিরিক্ত মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। জিন্নার সঙ্গে বৃটিশশক্তির কূটনৈতিক মিলনকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পাল্টা কূটনীতি দ্বারা পরাস্ত করিতে পারে নাই বলিয়াই মুসলিম সমস্যা পাকিস্তানে পৌছিয়াছে।

শেষ পর্য্যায়ে ভারত বিভাগের প্রস্তাবে কংগ্রেস সম্মত হইয়া দ্বি-জাতি-তত্ত্বকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছে—অথচ পূর্ব্বাপর কংগ্রেস ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। একমাত্র বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে মুসলিম লীগের সর্ব্বময় প্রাধান্য ছিল না—পাঞ্জাব, সিন্ধু বা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভারতবিভাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমানের যুক্ত জাতীয়তাবাদী অথবা কংগ্রেসী মুসলমানদের মন্ত্রিসভাই ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কথা উল্লেখ করা যায়। পাঞ্জাবে কংগ্রেস-লীগ-ইউনিয়নিষ্ট যুক্ত মন্ত্রিসভার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও পাঞ্জাবের বৃটিশ গভর্ণরের পীড়াপীড়িতে প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয় এবং তৎস্থলে গভর্ণরের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। গভর্ণর কর্ত্তৃক ক্ষমতা হাতে লওয়ার উদ্দেশ্য মুসলিম লীগকে এই প্রদেশে প্রাধান্য লাভের সুযোগ করিয়া দেওয়া। বলা বাহুল্য বৃটিশ গভর্ণরের এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। গভর্ণরের শাসনাধীন পাঞ্জাব সাম্প্রদায়িক অশান্তির লীলা নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল। পরে যখন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত বিভাগের প্রস্তাব হয় তখন উক্ত প্রদেশ কয়টিতে লীগের প্রাধান্য থাকায় উহারা স্বতন্ত্র থাকায় বিশ্বাসী এই মত সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু বাস্তবপক্ষে এই সকল স্থানে স্বাতন্ত্র্যবাদীরা যে কৃত্রিম বা অবৈধ উপায়ে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা কংগ্রেসের অজ্ঞাত ছিল না। সিন্ধু বা পাঞ্জাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে এই কথা নিশ্চিত বলা চলে যে কংগ্রেস সজ্ঞানে দ্বি-জাতিবাদে সম্পূর্ণ বিরোধী এই প্রদেশটিকে স্বতন্ত্রবাদীদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই প্রদেশ পূর্ব্বাপর কংগ্রেসের সঙ্গে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া এবং কংগ্রেসী নেতা সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খাঁ-কে নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। মুসলিম লীগের প্রাধান্য বা সামান্য প্রতিপত্তিও এই প্রদেশে ছিল না। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্ব্বাচনে এই প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যা-

গরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সিন্ধু, পাঞ্জাব, আসাম বা বঙ্গদেশের পরিষদের অধিকাংশ সদস্যদের মতানুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নে বা পাকিস্তানে উক্ত প্রদেশ সমূহ থাকিবে কিনা তাহার প্রস্তাব হয়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা অর্থাৎ গণভোটের সিদ্ধান্ত হয়। বৃটিশ গভর্ণরের সাহায্যে মুসলীম লীগ এই গণভোট পাকিস্তান গ্রহণের অনুকূলে আনিতে পারিবে বলিয়াই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ না করিয়া মানিয়া লইলেন। এই তুষ্ণীভাবের দ্বারা একটি কংগ্রেসী প্রদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রসৃষ্টির অনুকূলে বলি দেওয়া হইল। এই কার্য্যের দ্বারা কংগ্রেস স্পষ্টতই দ্বি-জাতি-বাদের সমর্থন করিলেন। নূতন করিয়া সংগ্রাম করার পরিবর্ত্তে আপোষ আলোচনা দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যই কংগ্রেসকে সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিয়া ভারত-বিভাগে সম্মত হইতে হইয়াছিল। ইহার যৌক্তিকতার বিচার উত্তর-কালের ইতিহাস করিবে।*

(৩) সমাজনৈতিক সংস্কার প্রচেষ্টা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যেরূপ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তদ্রূপ সমাজ সংস্কার বিষয়েও ভারতের জাতীয় সচেতনতা নবরূপ ধারণ করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় স্বাধিকার অর্জ্জনের পূর্ব্বে মধ্যযুগীয় ধর্ম্মনীতির কুসংস্কার ও শিক্ষার অনগ্রসরতা প্রভৃতি দূর করা যে অত্যাবশ্যক তাহা বহু ভারতীয় মনীষির মনে উদয় হইয়াছিল এবং ইহার ফল স্বরূপ আমরা ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন, আর্য্য সমাজ প্রভৃতি সমাজ সেবী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব দেখিতে পাই। এই সকল প্রতিষ্ঠান মূলতঃ বিভিন্ন ধর্ম্মীয় মতবাদকে

*'ভারত-বিভাগের কাহিনী'র অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ তথ্য শ্রীবিনয়েন্দ্র মোহন চৌধুরীর 'বিভক্ত ভারত' গ্রন্থ (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ) হইতে গৃহীত।

কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত হইলেও ইহাদের কার্য্যক্রম ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক প্রচেষ্টায় নিবদ্ধ হইতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীতে ইহাদের কার্য্যবিধি ক্রমশঃ বহুমুখী হইয়া সমগ্র ভারতময় পরিব্যাপ্ত হইল।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ ব্যতীত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে গোখেল প্রতিষ্ঠিত ভারত ভৃত্য সমিতি (Servants of India Society)-র নাম উল্লেখ-যোগ্য। এই সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেশের মঙ্গলের জন্য সেবাকার্য্য করিয়া যাওয়া। এই সেবাকার্য্য রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি বা শিক্ষাবিস্তার বা সমাজ সংস্কার যে কোন প্রকারেই হোক কোনও পশ্চাৎ-অভিসন্ধি না লইয়া করিলেই হইল। গোখেলের মৃত্যুর পর (১৯১৫) শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ইহার ভার গ্রহণ করেন। স্বয়ং গোখেল এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রী রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন। ভারত ভৃত্য সমিতির অন্য তিনজন সভ্য নারায়ণ মলহার যোশী, হৃদয় নাথ কুঞ্জুরু ও শ্রীরাম বাজপায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশোন্নয়ন কার্য্যের দ্বারা দেশ-মাতৃকার সেবা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মিঃ যোশী শ্রমিকদের উন্নতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে সোস্যাল সার্ভিস লীগ ইহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মিঃ যোশী 'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' নামে শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন ও স্বয়ং সুদীর্ঘকাল ভারতীয় শ্রমিকদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন। হৃদয়নাথ কুঞ্জুরু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে সেবা সমিতি নামে এক সমাজ প্রতিষ্ঠান-এর প্রতিষ্ঠা করেন। সেবা সমিতি জনহিতকর বহু কার্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সার্থক নামা হইয়াছে। মিঃ কুঞ্জুরু রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ক বহু হিতকর কার্য্যের সমর্থন ও প্রসারের জন্য দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীরাম বাজপায়ী ভারতীয় বয়-স্কাউট আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। ভারত-ভৃত্য সমিতি বিভিন্ন সমাজোন্নয়ন কার্য্য ব্যতীত কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া ভারতীয় জনমত গঠনে সহায়তা করিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত ভারতীয় পার্শী সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য বেহ্রামজী মালাবারী ও শিখ সম্প্রদায়ের জন্য প্রধান খালসা দেওয়ানের কার্য্যকারিতা উল্লেখযোগ্য। অমৃতসরে খালসা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে শিখ সম্প্রদায়ের প্রভূত উন্নতি হয়।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ প্রতিষ্ঠিত আলিগড় কলেজ মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনের নবযুগের চেতনার সঞ্চার করিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে মৌলবী চিরাগ আলি, অধ্যাপক খোদাবক্স, সৈয়দ আমির আলি প্রভৃতি মুসলিম সুধীর প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজের নব জাগরণ আরম্ভ হয়। এই নব জাগরণের মূলে আলিগড় কলেজের (পরে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত) অবদান যথেষ্ট ছিল। মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য বহু 'আঞ্জুমান' বা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবের কাদিয়ান-এর গোলাম আহম্মদ প্রতিষ্ঠিত আহম্মদীয় আন্দোলন মুসলিম গণ-চেতনায় কম সাহায্য করে নাই। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম্মের অবিকৃত বাণী সমূহ প্রচার করা।

সমাজ সংস্কার বিষয়ে গভর্ণমেণ্টও বহুবিধ আইন লিপিবদ্ধ করিয়া জনমতকে স্বীকার করিয়াছেন। গাইকোয়াড় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বালাবিবাহ নিরোধ আইন পাশ করেন। বৃটিশ ভারতে সর্দ্দা আইন (১৯৩০) এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বিধবা-বিবাহ আইন বহুপূর্ব্বেই পাশ হইয়াছিল—তবে জনমত এ বিষয়ে তত আগ্রহশীল না হওয়ায় বিধবা-বিবাহ সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় সমাজে গৃহীত হইতে পারে নাই। হিন্দু বিধবাদের দুঃস্থ অবস্থার অবসান কল্পে বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট রহিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের যুগে ভারতীয় নারী-সমাজ কোন দিক দিয়া পশ্চাৎপদ থাকে নাই। একমাত্র মুসলমান সমাজের কিয়দংশ ব্যতীত মধ্যযুগীয় পর্দ্দাপ্রথা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সমাজ ও জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারী, পুরুষের সমকক্ষতা করিয়া আশ্চর্য্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। চিকিৎসা বিদ্যা, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি এমন কি উপজীবিকার ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের প্রতিদ্বন্দী হইয়াছে। ভারতীয় নারী-

সমাজ উইম্যান্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান প্রতিষ্ঠা করিয়া নারী সমাজের সর্ব্ববিধ অসুবিধা দূরীকরণে নিজেরাই অগ্রণী হইয়াছে। ইহাদের প্রচেষ্টার ফলে নারীর ভোটাধিকার এবং আইন পরিষদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষিত হইয়াছে। জাতীয় আন্দোলনে বহু ভারতীয় নারী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাহাদের অন্যতম। প্রয়োজন হইলে ভারতীয় নারীরা যে সামরিক কার্য্যেও উপযুক্ত পারদর্শিতা প্রদান করিতে পশ্চাৎপদ নহেন তাহা আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসি বাহিনীর কার্য্য-কারিতা হইতে প্রমাণিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজ চেতনার অন্যতম প্রকাশ অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে পরিবর্ত্তিত মনোভাব। ভারতের শিক্ষিত সমাজ অনুন্নত সমাজকে অজ্ঞানতা ও অশিক্ষার স্তর হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিভিন্ন সমাজ-সেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন চিন্তাবিদ, দেশ-নায়ক ইহাদের সম্বন্ধে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়, আর্য্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সকলেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই অবহেলিত শ্রেণীকে উন্নত করার জন্য প্রভূত প্রয়াস পাইতেছেন। গান্ধীজি স্বয়ং ইহাদের দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া ইহাদের 'হরিজন' নামকরণ করিয়াছেন এবং হরিজনদের সেবা করা তাহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। গান্ধীজির 'হরিজন' পত্রিকা ইহাদের সেবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য পুরাতন শাসন-সংস্কার সমূহে এবং স্বাধীন ভারতীয় শাসনতন্ত্রে 'স্বতন্ত্র ব্যবস্থা' রহিয়াছে।

(৪) *শিক্ষা ও সংস্কৃতি*

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষায়তন-সমূহের যথেষ্ঠ উন্নতি ও প্রসারের ফলে ভারতবর্ষের নব-জাগরণ সম্ভবপর হইয়াছিল এবং ভারতীয়

মনীষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধর্ম্ম, সমাজ, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছে তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে ভারতের চিন্তাশীল জননায়কদের শিক্ষা-বিস্তার ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য আন্তরিক আগ্রহ। সরকারী প্রচেষ্টা এই শিক্ষা-বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতের শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে বে-সরকারী প্রচেষ্টা ও বদান্যতাই সর্ব্বাধিক ছিল। বিংশ শতাব্দীতেই এই শিক্ষা বিস্তার সমধিক হয়।

লর্ড কার্জ্জন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উন্নতির জন্য ১৯০২ খৃষ্টাব্দে একটি "বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন" নিযুক্ত করেন। গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ও সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী এই দুইজন ভারতীয় এই কমিশনের অন্যতম সভ্য ছিলেন। এই কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের "বিশ্ববিদ্যালয় আইন" রচিত হয়। এই আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপর সরকারী আধিপত্য বিস্তৃত হইলেও ইহার বিধান সমুহ শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছিল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই আইনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষাদান প্রণালীর ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান স্মরণীয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগ সৃষ্ট হয় এবং একজন সদস্য ইহার ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারত গভর্ণমেণ্ট এক প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন; এই প্রস্তাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রদানকারী রেসিডেন্সিয়েল বা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের ফলে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা স্থগিত থাকে। কিন্তু অতঃপর স্বল্পকালের মধ্যে পাটনা, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, বেনারস, আগ্রা, দিল্লী, নাগপুর, ঢাকা, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, চিদাম্বরম, ত্রিবেন্দ্রাম, রেঙ্গুন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্বাধীনতার পরে মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে, বিহারে

ও আসামের গৌহাটিতে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পুনা-তে একটি ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গদেশের বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক 'শান্তি-নিকেতন' নামে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯২১)। সম্প্রতি ইহা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের শাসনকালে উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য মাইকেল স্যাডলারের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯২৯ খৃষ্টব্দে প্রকাশিত হার্টগ কমিটির, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে লিণ্ডসে কমিটির ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সাপ্রু কমিটির রিপোর্ট ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করা হয়। এই সকল কমিশন এবং কমিটির রিপোর্টের ব্যবস্থার ফলে ভারতের নানা প্রদেশ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের অধিনায়কত্বে আর একটি শিক্ষা-কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে তাহাদের মন্তব্য ভারত-সরকারের নিকট পেশ করেন।

১৯১৯ ও ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন সংস্কার অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র শিক্ষাবিভাগের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা বৃটিশ শাসনে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা অত্যন্ত নৈরাশ্য-জনক—হাজার করা একশত জনও 'শিক্ষিত' নহে। সরকারী ও বে-সরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টার ফলে উচ্চ-কোটির জন সমাজ যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু নিম্নস্তরের বিপুল জন-সমাজ অশিক্ষার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। আইনের দ্বারা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য মিঃ গোখেল ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় আইন-পরিষদে এক আইনের পাণ্ডুলিপি

উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য তাহাতে উল্লেখযোগ্য ফলোদয় হয় নাই। দারিদ্র্য ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত চেতনার অভাবেই এই সকল ব্যবস্থা অদ্যাপি অবহেলিত হইয়া আছে। সাম্প্রতিক কালে সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা ও গান্ধীজীর ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনা এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের শিক্ষার অনগ্রসরতা প্রসঙ্গে শিক্ষাদানের মাধ্যমরূপে কি ভাষা ব্যবহৃত হইবে তাহার প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। এযাবৎকাল ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রধান বাহন হওয়ার জন্য শিক্ষার উন্নতি যথেষ্ট ব্যাহত হইয়াছে। ক্রমশঃ সর্ব্বত্র মাতৃভাষাই প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রেই শিক্ষার বাহন হইবে বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং কোন কোন স্থানে ইংরেজীর পরিবর্ত্তে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখযোগ্য ; তথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পর্য্যন্ত উর্দ্দু ভাষার মাধ্যমে গৃহীত হইয়াছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ভারতের নব-জাগরণ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হওয়ার ফলে ভারতবর্ষ তাহার নিজস্ব গৌরবময় অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন মনে করিল এবং প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান-গরিমাকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল। ভারতবর্ষ যে বিশ্ব-সভ্যতার ক্ষেত্রে নবাগত নহে, তাহার সভ্যতার উন্মেষ যে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মের বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল এই ধারণা ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিল এবং ভারতের সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে তাহা প্রতি-ফলিত হইল। ভারতীয় সাহিত্য, প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্য অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে উন্নত হইল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইল। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা

সমূহও অনগ্রসর রহিল না—হিন্দী, গুজরাটী, উড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষাও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উন্নত সাহিত্য ভাণ্ডারের সৃষ্টি করিল। এই নব সংস্কৃতির মর্ম্মকথা হইল পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে প্রাচ্যের ধ্যান-ধারণার সমন্বয়। ভারতের নব সংস্কৃতির রূপায়নে ইহাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম্মজগতে স্বামী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসু, শিল্পক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজি ইহারা সকলেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিস্ময়কর কর্ম্মকৃতির পরিচয় দিয়া ভারতের শাশ্বত বাণীর স্বরূপকে নূতনভাবে পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরাধীনতার গ্লানি বহন করিতে হইলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের যথার্থ মূল্য বিশ্বের দরবারে স্বীকৃত হইয়াছে।

(৫) সাধারণতন্ত্রী ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতি

বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তর ও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ঃ—ভারতবাসীর আন্দোলনের ফলে বৃটিশকে পৌণে দুই শত বৎসরের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে অপসৃত হইয়া যাইতে হয়। ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে বৃটিশ প্রথমে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রাথমিক পর্ব্ব হিসাবে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার (Interim Government) গঠন করেন। এই সরকার গঠনের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্ব্বকে সহজ করিয়া তোলা। এই অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার সৃষ্টির মধ্যে পার্লামেণ্টারীয় শাসন-ব্যবস্থার একরূপ আভাস পাওয়া যায়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের (India Independence Act, 1947) দ্বারা ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের অবসান ঘটে এবং ভারতবর্ষে একরূপ পূর্ণ পার্লামেণ্টারীয় শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। অন্তর্ব্বর্ত্তী শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রাক্কালেই স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন-ই ভারতবর্ষের গণপরিষদকে সার্ব্বভৌম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। এই গণ-পরিষদ ভারতীয় জনগণের পক্ষ হইতে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে থাকে। নূতন সংবিধান রচিত হইলে ইহা ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় জনগণের পক্ষ হইতে গণ-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। ইহার দুইমাস পরে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী এই সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। এই সংবিধান অনুযায়ী (The Constitution of India) ভারতবর্ষকে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ভারতের জনসাধারণই যে সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্বের উৎস এবং স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বই যে ভারতের নব সংবিধানের লক্ষ্য তাহা এই নূতন শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ

(১) **বিশালতা ও জটিলত্ব**ঃ—পৃথিবীর অন্য কোন শাসনতন্ত্র ভারতের সংবিধানের ন্যায় এত বিপুল ও জটিল নহে। এই সংবিধানে প্রথমে ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ ও ৮টি তালিকা ছিল; পরে পুনরায় সংশোধিত ২টি অনুচ্ছেদের সহিত কিছু অংশ এবং ১টি তালিকা যুক্ত করা হইয়াছে। এই সংবিধান বিপুলায়তন ও জটিল হওয়ার যথেষ্ঠ কারণ আছে। প্রথমতঃ, ভারতীয় সংবিধানে কেবল ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থাই সন্নিবিষ্ট হয় নাই, অঙ্গ রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের মত বিরাট উপমহাদেশের কতকগুলি বিশিষ্ট সমস্যা আছে—সেই সকল সম্বন্ধেও সংবিধানে বিশেষ বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই সরকারী চাকুরী, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ, তপশীলভুক্ত জাতি, আদিবাসী, সরকারী ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থামূলক অনেকগুলি ধারা আছে। তৃতীয়তঃ, যে সকল বিষয় সাধারণ আইন রচনার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে গণ-পরিষদ সেই সমস্তগুলিই সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।

(২) **মৌলিক অধিকারসমূহ (Fundamental Rights) :—** সংবিধানের মুখবন্ধে (Preamble) কতকগুলি মৌলিক অধিকার ঘোষিত হইয়াছে। এই অধিকারগুলি হইল—(১) সাম্যের অধিকার (২) স্বাধীনতার অধিকার (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (৪) ধর্ম্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (৬) সম্পত্তির অধিকার (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার।

(৩) **নির্দ্দেশমূলক নীতি (Directive Principles) :—** মৌলিক অধিকার ব্যতীত ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি নির্দ্দেশমূলক নীতির উল্লেখ রহিয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির সহিত নির্দ্দেশমূলক নীতিসমূহের পার্থক্য এই যে মৌলিক অধিকারসমূহ আদালতের সাহায্যে বলবৎ করা যাইতে পারে কিন্তু নির্দ্দেশমূলক নীতিগুলিকে আদালত বলবৎ করিতে পারিবে না। অর্থনৈতিক মৌলিক স্বত্বসমূহই নির্দ্দেশমূলক নীতির প্রধান কথা—যথা, কর্ম্মের অধিকার, শ্রমিকদের জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত বেতন পাইবার অধিকার, বেকার, বার্দ্ধক্য, পীড়িত বা বিকলাঙ্গদের সরকারী সাহায্য পাইবার অধিকার ইত্যাদি।

(৪) **ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল :—** ভারতীয় সংবিধানে ভারতবর্ষকে একটি রাষ্ট্র-সংহতি বলা হইয়াছে। এই রাষ্ট্র-সংহতির প্রধান কথা হইল কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন—কতকগুলি বিষয়ে কেন্দ্রীয়াধিকার, কতকগুলি বিষয়ে অঙ্গ-রাজ্যের অধিকার এবং আর কতকগুলি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাষ্ট্রের যুগ্ম-অধিকার—এই তিন-শ্রেণীতে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৫) **দেশীয় রাজ্য সমূহের যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি :—** সংবিধানের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, পূর্ব্বতন দেশীয়-নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলি ভারতের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হইয়া ভারতীয় সংবিধান কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে সন্নিহিত অঙ্গরাজ্যগুলির

সহিত একীভুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে—আর, অবশিষ্টগুলি হয় একত্রিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে আর না হয় পূর্ব্বতন পৃথক সত্তা বজায় রাখিয়া 'খ' কিংবা গ' রাজ্য হিসাবে অঙ্গরাষ্ট্রের মর্য্যাদা ভোগ করিতেছে।

(৬) **ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা** :—ধর্ম্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বিশিষ্টরূপ। ভারতের কোন :প্রকার ষ্টেট রিলিজিয়ান বা রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম নাই—জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল ভারতীয়ের জন্য এক এবং অভিন্ন নাগরিকাধিকারের ব্যবস্থা করাও হইয়াছে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোন নাগরিক সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারে না। ধর্ম্মনিরপেক্ষতা বলিলে অবশ্য ইহা বুঝায় না যে ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা নাই। কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপক্ষে সকল ব্যক্তিরই বিবেকের স্বাধীনতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে ধর্ম্মস্বীকার, ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মপ্রচারের সমান অধিকার আছে।

(৭) **অনুন্নতশ্রেণীর উন্নতিকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা** :—যদিও সংবিধান সাম্প্রদায়িকতার দাবিকে প্রশ্রয় দেয় নাই তথাপি কতকগুলি অনুন্নতশ্রেণীর উন্নতিকল্পে সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তপশীলভুক্ত বর্ণ ও আদিবাসীদের জন্য আইন সভায় আসন সংরক্ষণের বা চাকুরীতে অগ্রাধিকারের বিধি গৃহীত হইয়াছে। তপশীলী জাতিদের এবং তাহাদের এলাকার উন্নতি সাধনের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ও মধ্যভারতে তপশীলী জাতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক একজন মন্ত্রী রাখার বিধি গৃহীত হইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন :—বৃটিশ আমলে শাসনব্যবস্থার দিক দিয়া ভারতবর্ষ বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় ভারত (দেশীয় রাজ্য) এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে বৃহত্তর ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। নানা কারণে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী না হইলেও ১৯৩৭ সালের ১লা

এপ্রিল হইতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য (Provincial Autonomy) প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপ ধারণ করে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট যখন ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিল তখন তৎকালীন ভারতে (পাকিস্তান বাদে) ৯টি গভর্ণর শাসিত প্রদেশ, ৫টি চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ এবং পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্য ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলি আবার তিন শতাধিক ছিল—একশতের অধিক বৃহৎ দেশীয় রাজ্য, উক্ত সংখ্যকই ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য এবং তিন শতাধিক ছিল জায়গীর জাতীয় অতি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। বৃটিশ শাসনের যুগে ভারত সরকারের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্ক ছিল বৃটিশের প্যারামাউণ্ট পাওয়ার বা সার্ব্বভৌম ক্ষমতা-র-মাধ্যমে। বৃটিশের ভারত ত্যাগ করার ফলে 'প্যারামাউণ্ট ক্ষমতা' লুপ্ত হওয়ায় দেশীয় রাজ্যগুলি আইনতঃ স্বাধীন হইল। কিন্তু ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক কারণে ইহাদের পক্ষে স্বাধীন অবস্থায় থাকা সম্ভবপর হইল না। ভারতের সন্নিহিত দেশীয় রাজ্যগুলি একে একে ভারতীয় ডোমিনিয়ানের সহিত সংযুক্ত হইতে বাধ্য হইল। ফলে পাকিস্তান নামে এক অংশ বিশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এই দেশে বহু শতাব্দী পরে রাষ্ট্রনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সূত্রে গ্রথিত এক মহা-ভারতের উদ্ভব হইল।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদানের পর ঐ সকল দেশীয় রাজ্য দুইটি প্রেরণার দ্বারা চালিত হইল—প্রথমটির দ্বারা তাহারা একীভূত হওয়ার কথা চিন্তা করিতে লাগিল—দ্বিতীয়টির দ্বারা তাহারা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রণয়নে উদ্যোগী হইল। এই উভয় প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে বহু দেশীয় রাজ্য সন্নিহিত প্রদেশের সহিত যুক্ত হইয়া আত্ম বিলোপ ঘটাইল; অনেক ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশীয় রাজ্য একত্রিত হইয়া সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতির ন্যায় রাষ্ট্র-সম্মিলন (States union) গঠন করিল। আর, হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মহীশুর, আজমীড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র রহিল। এইরূপ নূতন বিলি বন্দোবস্তের ফলে দেশীয় রাজ্য-

গুলির সংখ্যা পাঁচ শত হইতে ১৫তে নামিয়া আসিল। এই ১৫টি দেশীয় রাজ্য ও রাজ্যসম্মেলন এবং ডোমিনিয়ন-ভারতের গভর্ণর ও চীফ-কমিশনার শাসিত প্রদেশ সমূহ লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Union of States) গঠিত হইল। অঙ্গরাজ্যসমূহের মোট সংখ্যা হইল ২৭—পরে মান্দ্রাজ রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া মান্দ্রাজ ও অন্ধ্র—এই দুইটি রাজ্যগঠনের ফলে অঙ্গরাজ্যগুলির সংখ্যা ২৮-এ পরিণত হইল। ১৯৫৪ সালে বিলাসপুরকে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করায় অঙ্গরাজ্যসমূহের মোট সংখ্যা ২৭-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীন সারারণতন্ত্রী রাষ্ট্র-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত এক গণ-পরিষদ ভারত রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ শাসনকার্য্যের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে। এই গণ-পরিষদ ভারতকে 'সার্ব্বভৌম গণ-তান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' (Sovereign Democratic Republic) রূপে ঘোষণা করিয়া তদুপযুক্ত শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছে। ভারতের জনসাধারণই যে সার্ব্বভৌম কর্তৃত্বের উৎস এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বই যে ভারতের শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য তাহা এই নব শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধেই সুস্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। ভারতের শাসন ব্যবস্থার কর্ণধার কোন বংশানুক্রমিক সার্ব্বভৌম শাসক হইবেন না ; সেইজন্যই এই শাসনতন্ত্র সাধারণতন্ত্রধর্ম্মী।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, অন্তর্ভুক্ত দেশীয় রাজ্য, চীফ কমিশনারের দ্বারা শাসিত প্রদেশসমূহ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ লইয়া ভারতীয় রাষ্ট্র-সংহতি প্রস্তাবিত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে ৯টি প্রদেশ ও তিনটি চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ ছিল (মোট এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে)। উহা ভিন্ন অনেকগুলি দেশীয় রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া কয়েকটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই প্রথায় সকল দেশীয় রাষ্ট্রই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্তা হইলেন প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ নির্ব্বাচন রীতিতে নিযুক্ত হইবেন। ভারতীয় পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ ও প্রাদেশিক বা ষ্টেট আইন সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। রাষ্ট্রের সকল কাজকর্ম্ম রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হইবে। তিনি সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বোচ্চ অধিনায়ক ও পার্লামেণ্ট সভার আহ্বায়ক হইবেন। তিনি লোক-পরিষদ বাতিল করিয়া নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। তাহার অনুমোদন ব্যতীত পার্লামেণ্টে গৃহীত কোন আইন কার্য্যকরী হইবে না। পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত থাকার সময়ে দেশের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে রাষ্ট্রপতি সাময়িক কালের জন্য অর্ডিন্যান্স বা বিশেষ আইন জারি করিতে পারিবেন। শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে মন্ত্রিসভার উপদেশ গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীনে মন্ত্রিগণ তাহাদের পদে বহাল থাকিবেন, কিন্তু মন্ত্রিসভা যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবেন।

রাষ্ট্রপতি বা President

কেন্দ্রীয় আইন সভা দ্বি-কক্ষযুক্ত—লোক পরিষদ (House of the People) এবং রাষ্ট্র পরিষদ (Council of States)। রাষ্ট্র পরিষদ ২৫০ জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত; তন্মধ্যে ১৫ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন, অবশিষ্ট সদস্যগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে নির্ব্বাচিত হইবেন। লোক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫ শতের অধিক হইবে না। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইবেন। মোটামুটি ৫ লক্ষ লোকের একজন প্রতিনিধি থাকিবে। পার্লামেণ্টের রীতি অনুসারে প্রত্যেক অধিবেশনের আরম্ভে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত বৈঠকে ভাষণ দিবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভা

প্রদেশপাল বা প্রাদেশিক গভর্ণরসমূহ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন,

শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিক বিভাগের সমস্ত ব্যবস্থাই প্রদেশপালের নামে করিতে হইবে। তাহার চাকুরীর মেয়াদকাল পাঁচ বৎসর। ক্ষমতা পরিচালনার ব্যাপারে প্রদেশপাল প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে চলিবেন। প্রধান মন্ত্রী তাহার দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হইবেন। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকিবেন। গভর্ণর ইচ্ছা করিলে এক মন্ত্রিসভা বাতিল করিয়া অন্য মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিবেন।

প্রদেশপাল

জরুরী অবস্থায় শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকিলে দুই সপ্তাহের জন্য শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া নিজের হাতে পূর্ণ শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার বিশেষ ক্ষমতা প্রদেশপালের আছে ; এই সব ক্ষেত্রে প্রদেশপাল মন্ত্রীদের পরামর্শ না লইয়া কিংবা তাহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। অবশ্য তাহাকে এবিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে জানাইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে প্রদেশপালের আদেশ বাতিল করিতে পারেন এবং নিজে নূতন আদেশ জারি করিতেও পারেন। ইহার ফলে রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আসিবে এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের অধীনে আইন প্রণীত হইবে। রাষ্ট্রপতির হস্তে এই বিশেষ ক্ষমতা দেওয়ার কারণ রহিয়াছে। যদি কোন আঙ্গিক-রাষ্ট্র কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতা করিয়া 'স্বাধীন' হওয়ার চেষ্টা করে সেই বিরোধী অঙ্গরাষ্ট্রকে দমন করার জন্যই এই বিশেষ ক্ষমতার ধারা রচিত হইয়াছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারার শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে এই নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জরুরী অবস্থা

কয়েকটি প্রদেশে নিম্ন ও উচ্চ পরিষদ লইয়া দ্বি-কক্ষযুক্ত আইন সভার বন্দোবস্ত হইয়াছে। মোটামুটি এক লক্ষ লোক পিছু একজন সদস্য লওয়া হইবে। নিম্ন পরিষদের মেয়াদ ৫ বৎসর কিন্তু উচ্চ পরিষদ কোনদিন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে না এবং

প্রাদেশিক আইন সভা

প্রতি তিন বৎসর অন্তর এক তৃতীয়াংশ অংশ সদস্যের কার্য্যকাল শেষ হইবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন লোক লইয়া প্রদেশপাল মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিবেন। প্রদেশপাল ইচ্ছা করিলে এক মন্ত্রিসভা বাতিল করিয়া অন্য মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিবেন। জরুরী অবস্থা ব্যতীত সর্ব্ব অবস্থায়ই অঙ্গ রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন বিষয়ে মন্ত্রিসভার পূর্ণ অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব—অবশ্য যতদিন তাহারা আইন সভার আস্থাভাজন থাকিবেন।

নূতন শাসনতন্ত্রের স্বরূপ ঃ—স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রকে মুখ্যতঃ পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র বলা যাইতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাকে পরিষদের আস্থাভাজন হইতে হইবে নচেৎ তাহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে। একজন প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি থাকার ব্যবস্থা থাকিলেও সাধারণ অবস্থায় প্রধান মন্ত্রীই রাষ্ট্রের সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন। এই দিক দিয়া বৃটিশ শাসনতন্ত্রের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু অন্যদিক দিয়া এই শাসনতন্ত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। প্রথমতঃ বৃটিশ শাসনতন্ত্র ইউনিটারি বা এক রাষ্ট্রীয় শ্রেণীর, পক্ষান্তরে ভারতীয় শাসনতন্ত্র আমেরিকার মত যুক্তরাষ্ট্রীয়; আবার কাল এবং অবস্থা বুঝিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্র ইউনিটারী বা যুক্তরাষ্ট্রীয় উভয় ভাবেই পরিচালিত হইতে পারিবে। স্বাভাবিক সময়ে উহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথানুযায়ী চালু রাখিবার উপযোগী করিয়াই তৈয়ারী করা হইয়াছে। কিন্তু, যুদ্ধের কালে উহা যাহাতে ইউনিটারী প্রথানুযায়ী বলবৎ হইতে পারে, তদুপযোগী ব্যবস্থাও রাখা হইয়াছে। ভারতের প্রেসিডেণ্টকে ২৮৫ ধারা অনুযায়ী যে ঘোষণা প্রচারের ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা প্রযুক্ত হইলেই যুক্তরাষ্ট্র ইউনিটারী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিবে। কোন বিষয় প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইলেও কেন্দ্রের প্রয়োজন হইলে তৎসম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে, প্রদেশসমূহকে স্বীয় শাসনকার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতে পারিবে এবং কোনও বিষয়ে যে কোনও কর্ম্মচারীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক মর্যাদারও পার্থক্য রহিয়াছে। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ও সচিবগণ কংগ্রেসের সদস্যরূপে স্বীকৃত হন না অথচ ভারতীয় ইউনিয়নের মন্ত্রীরা পার্লামেণ্টের সদস্য এবং অন্যান্য সদস্যদের অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

গভর্ণর-জেনারেলগণের নাম

(১) বাংলার ফোর্ট-উইলিয়মের গভর্ণর জেনারেলগণ

(১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুযায়ী)

১৭৭৪ ওয়ারেণ হেষ্টিংস

১৭৮৫ স্যার জন ম্যাকফারসন (অস্থায়ী)

১৭৮৬ মার্কুইস কর্ণওয়ালিস

১৭৯৩ স্যার জন শোর

১৭৯৮ স্যার এ, ক্লার্ক (অস্থায়ী)

১৭৯৮ মার্কুইস ওয়েলসলী (আর্ল অফ মর্ণিংটন)

১৮০৫ মার্কুইস কর্ণওয়ালিস

১৮০৫ স্যার জর্জ্জ বার্লো (অস্থায়ী)

১৮০৭ আর্ল অফ্ মিণ্টো

১৮১৩ আর্ল অফ্ ময়রা (মার্কুইস অফ্ হেষ্টিংস)

১৮২৩ জন এ্যাডাম (অস্থায়ী)

১৮২৩ আমহার্ষ্ট

১৮২৮ উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেইলী (অস্থায়ী)

১৮২৮ লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেন্‌ডিস বেন্টিঙ্ক

(২) ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল

(১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদ অনুযায়ী)

১৮৩৩ লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেনডিস্ বেন্টিঙ্ক

১৮৩৫ স্যার চার্লাস মেটকাফ্ (অস্থায়ী)

১৮৩৬ অকল্যাণ্ড

১৮৪২ এলেনবরো

১৮৪৪ উইলিয়ম উইলবারফোর্স বার্ড (অস্থায়ী)

১৮৪৪ স্যার হেনরী হার্ডিঞ্জ

১৮৪৮ আর্ল অফ্ ডালহৌসী

১৮৫৬ ক্যানিং

(৩) গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়

১৮৫৮ ক্যানিং
১৮৬২ আর্ল অফ্ এলগিন
১৮৬৩ স্যার রবার্ট নেপিয়ার (অস্থায়ী)
১৮৬৩ স্যার উইলিয়ম ডেনিসর (অস্থায়ী)
১৮৬৪ স্যার জন লরেন্স
১৮৬৯ আর্ল অফ্ মেয়ো
১৮৭২ স্যার জন ষ্ট্রাচি (অস্থায়ী)
১৮৭৬ লিটন
১৮৮০ রিপণ
১৮৮৪ ডাফরিণ
১৮৮৮ ল্যান্সডাউন
১৮৯৪ এল্‌গিন
১৮৯৯ কার্জ্জন
১৯০৫ আর্ল অফ্ মিণ্টো 11
১৯১০ হার্ডিঞ্জ
১৯১৬ চেম্‌স্‌ফোর্ড
১৯২১ রিডিং
১৯২৬ আরউইন
১৯৩১ উইলিংডন
১৯৩৬ লিন্‌লিথ্‌গো
১৯৪৩ ওয়াভেল
১৯৪৭ মাউণ্টব্যাটেন (বৃটিশ)
(ভারতের শেষ বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল)
১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট—মাউণ্টব্যাটেন (ভাইসরয়)
১৯৪৮—চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারী
(ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল)
১৯৫০, ২৬শে জানুয়ারী হইতে স্বাধীন সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি—ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

পেশোয়াগণের বংশ তালিকা

- বিশ্বনাথ
  - (১) বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৪-'২০
    - (২) প্রথম বাজিরাও ১৭২০-'৪০
      - (৩) বালাজী বাজিরাও ১৭৪০-'৬১
        - (৪) প্রথম মাধব রাও ১৭৬১-'৭২
        - (৫) নারায়ণ রাও ১৭৭২-'৭৩
          - (৭) দ্বিতীয় মাধব রাও ১৭৭৪-'৯৬
      - (৬) রঘুনাথ রাও ১৭৭৩-'৭৪
        - (৮) দ্বিতীয় বাজিরাও ১৭৯৬—১৮১৮
          - নানাসাহেব (দত্তক পুত্র)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী

1946

1. Illustrate from the career of Clive and Bussy the methods of empire-building adopted by Western statesmen in india in the Eighteenth century A.D.

2. How did the British dislodge the Marathas from the dominant position they held in central India and the western part of the Deccan ? Explain in this connection the defects in the internal organisation of the Maratha confederacy.

3. In what respects can the period of British rule in India from 1829 to 1854 be regarded as an epoch of reforms ?

4 What success attended the efforts in India from 1883 of 1919 "to infuse into oriental despotism the spirit of British freedom."

5. Write critical are explanatory notes on any two of the following :—

(a) The reorganization of the courts of law by Cornwallis.

(b) "Tipu planted the tree of Liberty at Seringapatam."

(c) "Ranjit Singh is one of the great personalities of Indian history."

(d) "We have no right to seize Sind, Yet we shall do so."

(e) The princes according to canning served as "break-waters to the storm" (of mutiny)......To preserve them as bulwarks of the empire has been a main principel of British policy."

(f) "The old system of Indian Government had never been worked with a loftier purpose than by the genius of Lord Curzon."

4. Criticize the policy of the Afghan wars and the solution of the Afghan problem during the second half of the Nineteenth century.

5. In what manner did Lord Ripon help the growth of ideas about democracy and self-government in India ?

1951

1. Sketch the history of the Anglo-Maratha relations in the last quarter of the 18th century.

2. What were the principal defects of the Permanent Settlement ? How were they remedied by subsequent enactments ?

3. Critically review the measures adopted by Lord Dalhousie for the aggrandisement of the British power in India.

4. Discuss the foreign policy of Lord Curzon.

5. Write notes on any two of the following :—
   (a) Grant of the Dewani ;
   (b) Subsidiary Alliance ;
   (c) Suppression of the Pindaris ;
   (d) Annexation of Sind.

1952

1. Examine the judicial and revenue reforms of Warren Hastings.

2. What part did Lord Wellesley play in the establishment of British power in India ?

3. Give a short account of Anglo-Afghan relations during the Governor-Generalship of Lord Auckland and Lord Ellenborough.

4. Describe the causes of the failure of the first organised rising ('the Mutiny') against British rule in India. What were its immediate effects ?

5. Write notes on any *two* of the following :—
   (a) 'Annexation of the Punjab' ;
   (b) Bentinck's measures for social reform ;
   (c) Lord Ripon's measures for local self-government ;
   (d) Lord Curzon's 'north-eastern frontier policy' ;
   (e) 'Montagu-Chelmsford Reforms'.

1953

1. Give a brief but systematic account of the Anglo-French Struggle for Supremacy in the Deccan.

2. What measures were adopted by Lord Dalhousie for the aggrandisement of the British power in India ?

3. Give a brief account of Lord Curzon's administration in India.

4. Write notes on any *two* of the following :—
   (a) Revenue reforms of Lord Cornwallis ;
   (b) Anglo-Afghan relations during Lord Auckland's Governor-generalship ;
   (c) 'The Annexation of Sind' ;
   (d) The Government of India Act, 1935.

1954

1. Describe the plans of Dupleix. Why did they fail ?

2. Give an estimate of Warren Hastings as Governor-General.

3. Enumerate the achievements of Ranjit Singh.

4. Discuss the Afghan policy of Lord Lytton. Write a note on the Second Anglo-Afghan War.

1955

1. Explain the causes of the failure of the Marathas to establish a hindu empire in India after the fall of the Mughal power.

2. Write short notes on :—

(a) Parmanent Settlement, (b) Subsidiary Alliance. and (c) Doctrine of Lapse.

3. Give a brief account of the relations of the Sikhs with the English and explain the causes of the defeat of the Sikhs.

4. Write a short account of the National Movement in India between 1885 and 1910.
